কালিকেট থেকে পলাশী

কালিকট থেকে পলাশী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়



সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :

এপ্রিল ১৯৫৬

প্রকাশক :

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

মুদ্রক :

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ

৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

শিল্পী :

শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত

পরিবেশক :

ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং

৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯

অমলেন্দু, ভারতী ও রমাকে

—বাবা

ভূমিকা

মানুষ-প্রজাতি তার ভৌগোলিক জাতি বিভাগ করেছে ভূপৃষ্ঠকে পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিধা-বিভক্ত করে। এ বিভাগ-বিন্যাস মানুষেরই রচা দেশ-মহাদেশ-গত হলেও মূলত বর্ণভিত্তিক। পুবের মানুষ, হয় কৃষ্ণ নয় পীতবর্ণ, পশ্চিমের মানুষ শ্বেতকায়। শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক থেকে এ দু-দলের বৈষম্য মূলগত নয়, কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনের আদর্শের পার্থক্যে এদের দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতধর্মী। এ পার্থক্যের আদি কারণ পাশ্চাত্যের প্রাচ্য-বিজয়। পাশ্চাত্যের প্রাখর্য ও শ্রেষ্ঠতাবোধ এবং প্রাচ্যের নমনীয়তা ও হীনতাভাবের জন্মবীজ এরই মধ্যে নিহিত।

এ দু-দলের সংযোগের এবং পরিণামে সংঘর্ষের কাহিনী অতি পুরাতন নয়। এর শুরু মাত্র পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে—অর্থাৎ মোটামুটি পাঁচ শ বছর আগে। সেকালেই প্রথম প্রাচ্যের ঘাটে ঘাটে পাশ্চাত্য তার বেসাতি নিয়ে ফেরি করতে এসেছিল। ভূপৃষ্ঠের সে অংশের বাসিন্দা বিভিন্ন জাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এ অংশের নানা স্থানে; আফ্রিকায়, আরবে, পারস্যে, হিন্দুস্থানে, লঙ্কায়, দূরপ্রাচ্যের নানা দ্বীপপুঞ্জে, চীনে ও জাপানে। তারা এসেছিল যে যার পণ্য নিয়ে। হয়ত কারোরই প্রথমে কোথাও শিকড় গেড়ে বসবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু প্রাচ্যের অপার সমৃদ্ধি তাদের বিত্তলোভকে উদগ্র করে তুলল। শুধু মৌমাছির মত ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে তাদের সে লোভের দাহ শীতল হল না; নিঃশেষে সমস্ত রস নিংড়ে নেবার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে উঠল। ফলে এ সংযোগ সর্বত্রই পরিণত হল সংঘাতে আর তার ফল বিভিন্ন দেশে নানারূপে দেখা দিল। পাশ্চাত্যের গ্রাস কোথাও হল পূর্ণ, কোথাও অর্ধ বা কিছু কমবেশি; কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও-বা পরোক্ষ। এ সংঘাত চলল বহু বর্ষ ধরে এবং তাতে যে প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হল তারই অংশবিশেষ আমাদের কাহিনীর উপজীব্য।

আমাদের কথা হিন্দুস্থানের। বাণিজ্য-সূত্রজাত এ মিলনের শেষ হল হিন্দুস্থানের পূর্ণগ্রাসে বা চরম দাসত্বে। সে দাসত্ব কায়েম হল দু শ বছর; সে পরবর্তী ইতিহাসেরই অপরিহার্য ভূমিকা আমাদের বক্তব্য কাহিনী। এ পরবর্তী ও পূর্ববর্তী ইতিহাস একটি অন্যটির পরিপূরক। প্রসঙ্গত এতে বিভিন্ন প্রাচ্যদেশের সমসাময়িক কথারও অবতারণা করা হয়েছে; তাতে আমাদের বিস্তীর্ণ পটভূমিকার বক্ষ্যমাণ অংশবিশেষের রেখাচিত্র অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর হবে বলে আশা করি।

পাশ্চাত্য সহসা নিজের সহজ গণ্ডি ছেড়ে প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি দিল কেন? এর প্রধানতম কারণ তার মসলার সন্ধান। সেকালে মসলা ছিল পাশ্চাত্যের ঘরে ঘরে অপরিহার্য বস্তু; মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। কথাটা একালে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও পরম সত্য। এর কারণ আমরা এ উপাখ্যানে বিশদ করে বলেছি। কিন্তু পাশ্চাত্যের বণিকগোষ্ঠী শুধু মসলার লোভেই প্রাচ্যে এসেছিল একথা বললে অবিমিশ্র সত্য বলা হবে না। সে অভিযানে ছিল তাদের বীর্যবত্তার প্রকাশ। সে বীর্যের জন্ম পাশ্চাত্যের রেনেসাঁসে বা নবজাগরণের ভাবধারায় এবং তার পরবর্তীকালের প্রতিবেশে। সহজ গণ্ডির বাইরে আসার প্রেরণা অবশ্য দিয়েছিল মসলা খোঁজা।

পাশ্চাত্যের নানা জাতির শক্তি ও সামর্থ্যের বীজ অভিন্ন হলেও এদের প্রতিবেশ ছিল বিভিন্ন। কাজেই হিন্দুস্থানের সঙ্গে মিলনকথার এক দিকে রয়েছে এদের যার যার স্বদেশের প্রতিবেশের কাহিনী, অন্য দিকে হিন্দুস্থানের সেকালের ইতিহাস। এ দুয়ের সঙ্গতিতেই রচিত হয়েছে এ মিলনপর্ব। ভাগ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা নিছক ইতিহাসের দিক থেকে এ সংঘাত-ভিত্তিক মিলনপর্বে প্রত্যেকটি পাশ্চাত্যজাতির জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ পেশ করবার প্রয়াস পেয়েছি।

হিন্দুস্থানের প্রথম নাবিক অতিথির দল পদার্পণ করেছে পশ্চিম উপকূলের তোরণ কালিকটে। তারপর তারা উপকূল পরিক্রমা শুরু করে শেষ করেছে দ্বিতীয় তোরণে, পূর্ব উপকূলের কলকাতা-পলাশীতে। শুরু করেছে পোর্তুগীজ, শেষ করেছে ইংরেজ। সঙ্গে জুটেছিল আরো অনেকে। এ পথে তাদের সবারই পদচিহ্ন রয়েছে বটে, কিন্তু তীর্থ পরিক্রমার সুফল হাতে হাতে পেয়েছে শুধু ইংরেজ। বাণিজ্যসূত্রে এক বিশাল মহাঐশ্বর্যময় রাজ্যপ্রাপ্তি কল্পনাতীত অঘটন—অলভ্যলাভ। অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে ভাগ্যান্বেষক বাণিজ্যগোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজ অর্থে, সামর্থ্যে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেকের চেয়েই হীন ছিল। কি করে যে এমন একটা অঘটন ঘটল তার কারণ বলা হয়েছে আমাদের আখ্যায়িকায়।

হিন্দুস্থানের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সূত্রেই এ মিলনের ফল এদেশের পক্ষে হয়েছে পরম অশুভ। সে দুর্বলতার কারণ মূলত দুটি। এক, উত্তরাপথে আওরংজেব প্রমুখ মুসলমান শাসকদের মহা অকল্যাণকর শাসনরীতি; দুই, দক্ষিণাপথের ক্ষীণপ্রাণ রাজন্যবর্গের 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'-রূপ চাণক্যনীতির অন্ধপ্রয়োগ। প্রথমটি করেছে এ দেশবাসী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রবল ভেদবুদ্ধি ও বিরোধের সৃষ্টি; দ্বিতীয়টি এনেছে এদেশে খাল কেটে কুমির ডেকে। নইলে হাজার হাজার মাইল দূরের পাল্লায় কয়েকটা ভড়ে চড়ে এসে জনকয়েক মানুষ, তা তারা যতই জবরদস্ত হোক না কেন, এমন একটা মহা-

দেশের মধ্যে কতটা আর বিপ্লব ঘটাতে পারতো ? আজ দু শ আড়াই শ বছর পরে সমগ্র প্রাচ্যই আবার পাশ্চাত্যের কালগ্রাসমুক্ত হতে শুরু করেছে। কালচক্র পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরম যুগসন্ধিক্ষণে প্রাচ্যের, বিশেষ করে হিন্দুস্থানের, একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' নীতি দুর্বলের পক্ষে আত্মঘাতী বিধান মাত্র। দেশের ইতিহাসই তার জ্বলন্ত সাক্ষী। দুর্বলের একমাত্র সাধনা ও মুক্তিপন্থা তার আত্মশক্তি লাভ।

সেকালে এ আড়াই শ বছরের ঘটনা বা ঘটনাস্রোত, পাশ্চাত্যের সঙ্গে এ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক প্রভৃতি ব্যাপারে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছিল, পরিশেষে তারও একটা মোটামুটি খসড়া দেবার চেষ্টা করেছি। আর বিশেষ করে বলেছি বাঙলা দেশের কথা। কেমন করে এই মহা ঐশ্বর্যময় দেশটি সহসা যেন জাদুমন্ত্রে একটা ভিক্ষুকের আস্তানায় পরিণত হয়ে গেল! কেমন করে মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীভূত বাঙলার মহামূল্য রত্নরাজি একে একে সেকালের নিরাভরণা লণ্ডনের দেহে ঝলমল করে উঠল! আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী, বিশেষ করে আমাদের দেশের তরুণ-তরুণী কি আর সেকথা মনে রেখেছে? না, ইংল্যাণ্ডের বিত্তঐশ্বর্যের প্রতীক আধুনিক লণ্ডন দেখে তাদের সেকথা মনে পড়ে?

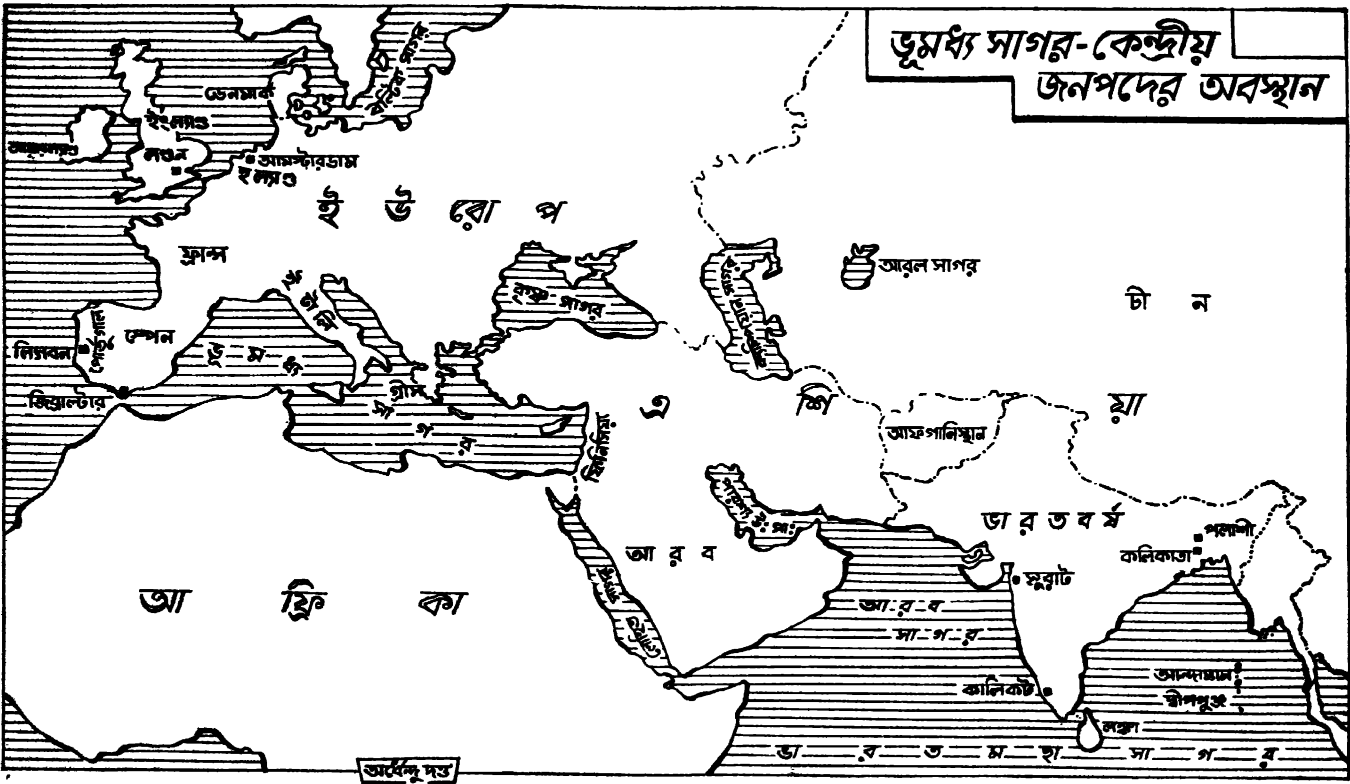
আমাদের পটভূমিকা বিস্তীর্ণ; কিন্তু কাহিনী রচনার পরিসর অল্প। বলা বাহুল্য, এ কাহিনী ইতিহাসের মোড়কে ইতিকথা নয়, এটি নির্ভেজাল ইতিবৃত্ত। হিন্দুস্থানে পাশ্চাত্যের এই যুগান্তরকারী অভিযানের কাহিনী একত্র গ্রথিত করার চেষ্টা বাঙলা ভাষায় এই প্রথম। এর মধ্যে যে নানা চ্যুতি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। সে সবই আমার অক্ষমতার নিদর্শন। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক সে অক্ষমতাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন। মূলগ্রন্থ-শেষে বোধসৌকর্যার্থে শব্দ ও বিষয়-পরিচয় প্রভৃতি সংযোজিত করা হয়েছে। আশা করি তা পাঠকের কাজে লাগবে।

এরূপ গ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ কাহিনীর অন্তর্গত দেশ ও দেশাংশগুলির রেখা-চিত্র। সে চিত্রগুলি সুনিপুণভাবে এঁকে কুশলী শিল্পী শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সাহিত্য সংসদের কর্ণধার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ গ্রন্থখানির সুষ্ঠু প্রকাশনের জন্য অশেষ যত্ন করেছেন। তাঁদের উভয়কেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

মানচিত্র-সূচী


ভূমধ্য সাগর-কেন্দ্রীয়
জনপদের অবস্থান
ডেনমার্ক
ইংল্যাণ্ড
লণ্ডন
আমস্টারডাম
হল্যাণ্ড
ইউরোপ
ফ্রান্স
স্পেন
লিস্‌বন
জিব্রাল্টার
ভূমধ্য সাগর
গ্রীস
কৃষ্ণ সাগর
আরল সাগর
চীন
এশিয়া
আফগানিস্থান
আরব
ভারতবর্ষ
পলাশী
কলিকাতা
সুরাট
আরব সাগর
কালিকট
আন্দামান
দ্বীপপুঞ্জ
লঙ্কা
ভারত মহাসাগর
আফ্রিকা
অর্দ্ধেন্দু দত্ত

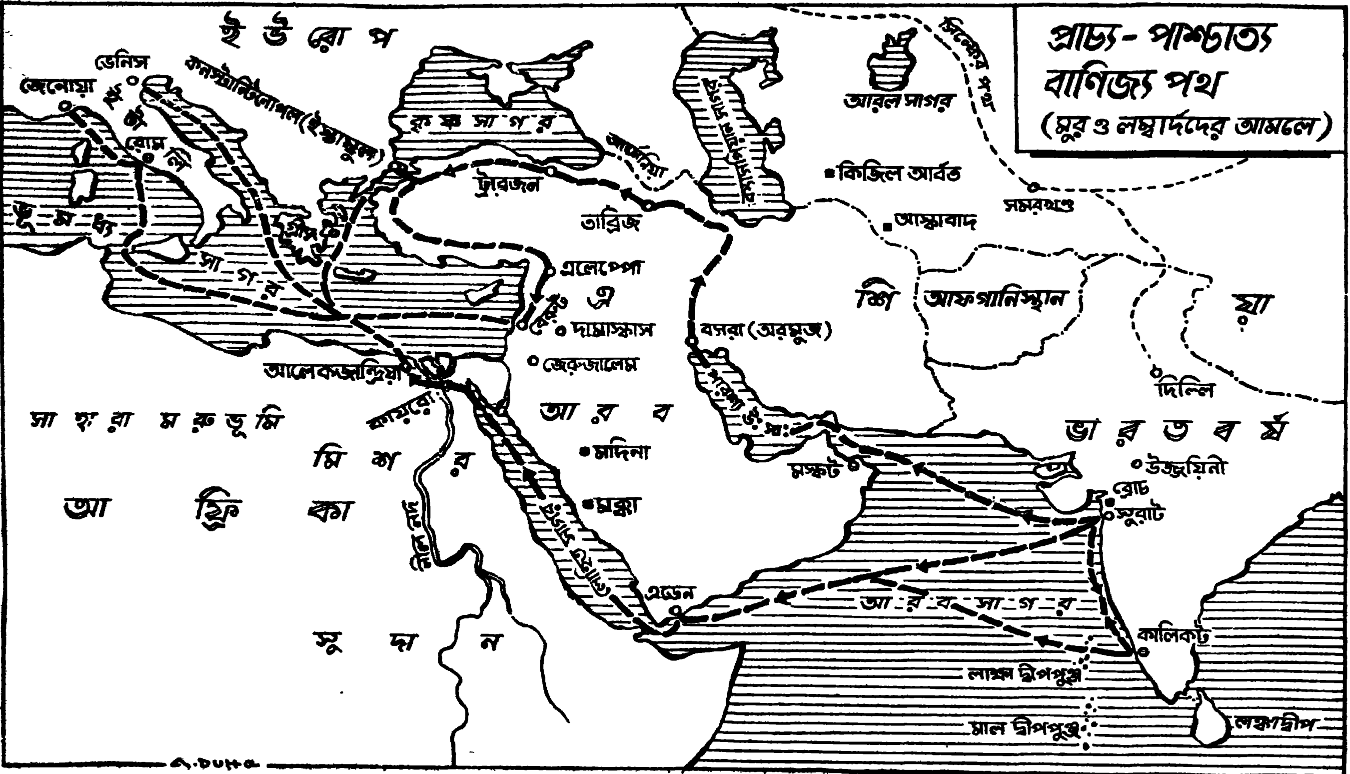
॥ এক ॥

পৃথিবীর একটি অবিচ্ছিন্ন, বিস্তীর্ণ ভূমিকে খণ্ড খণ্ড করে মানুষ আখ্যা দিয়েছে, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা। ভূগোলের এই তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থলে যে বহু-পরিসর সলিলরাশির অবস্থান তাকে বলা হয়, ভূমধ্যসাগর। মোটামুটিভাবে সে সাগরের পূর্বতীরে এশিয়া, উত্তরে ইউরোপ আর দক্ষিণে আফ্রিকা। এই মনুষ্যরচিত মহাদেশগুলির একটি থেকে অন্যটিতে সামান্য জলপথ পার হয়ে স্থলপথেও যাওয়া চলে।

সভ্য আদিম মানুষের যে ইতিহাস এ পর্যন্ত রচনা করা হয়েছে তাতে এই ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী মানুষদের স্থান প্রায় প্রথম পর্বে। বিভিন্ন তীরের নানা প্রকার মানবগোষ্ঠীর শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রূপে গড়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ ঘটেছিল বহুপূর্বে—স্থলপথে ও জলপথে। এই সংযোগসূত্র মূলত বাণিজ্য বা দ্রব্যবিনিময়। সে সূত্রের মূলতত্ত্বর মধ্যে ছিল স্বার্থের বীজ, তাই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সে সংযোগ প্রায়শই সংঘাতে পরিণত হয়েছে।

আমাদের কথা ইউরোপ বা পশ্চিমের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সংযোগের কথা, বিশেষ করে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের। প্রকৃতপক্ষে সে অধ্যায়ের শুরু ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মালাবারের কালিকটে, আর তার পরিসমাপ্তি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পলাশীতে। এই মোটামুটি আড়াই শ বছরের ঘটনাস্রোতের অভিনব ঘাত-প্রতিঘাত পরিশেষে হিন্দুস্থানের আকৃতি ও প্রকৃতিকে অসামান্যরূপে পরিবর্তিত করেছে। কাজেই সে অধ্যায় হিন্দুস্থানের ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট যুগ।

এই পরবর্তী কাহিনীকে স্পষ্টতর করবার জন্যই পূর্ববর্তী কথার অবতারণা। অর্থাৎ আমরা শুরু করেছি ভূমধ্যসাগরের তীরে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের স্বাভাবিক সংযোগের কাল থেকে। স্থলপথে এই সাগরের সঙ্গে হিন্দুস্থানের সংযোগের কথা অতি প্রাচীন ইতিহাস।


প্রাচ্য-পাশ্চাত্য
বাণিজ্য পথ
(মুর ও লম্বার্দদের আমলে)
ইউরোপ
ভেনিস
জেনোয়া
কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল)
ইটালী
রোম
কৃষ্ণ সাগর
আর্মেনিয়া
ট্রেবজন
তাব্রিজ
ভূমধ্য সাগর
গ্রীস
এলেপ্পো
এশিয়া
বেরুট
দামাস্কাস
জেরুজালেম
আলেকজান্দ্রিয়া
কায়রো
আরব
মদিনা
মক্কা
সাহারা মরুভূমি
মিশর
আফ্রিকা
নীল নদ
সুদান
এডেন
লোহিত সাগর
বসরা (অরমুজ)
পারস্য উপসাগর
মস্কট
কাস্পিয়ান সাগর
আরল সাগর
সিল্কের পথ
কিজিল আর্বত
আস্কাবাদ
সমরখন্দ
আফগানিস্থান
দিল্লি
ভারতবর্ষ
উজ্জয়িনী
ব্রোচ
সুরাট
আরব সাগর
কালিকট
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
মাল দ্বীপপুঞ্জ
লঙ্কাদ্বীপ

এই প্রাচীন কাহিনীকে দু ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতি সাধারণ পাঠকও জানেন যে গ্রীক সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্থলপথে এদেশে এসেছিলেন যিশুখ্রীষ্টের জন্মের তিন শ আটাশ বা উনত্রিশ বছর পূর্বে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় তেইশ শ বছর আগে। তিনি যে পথে এদেশে এসেছিলেন তা-ই ছিল মোটামুটিভাবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যপথ। বলা বাহুল্য তাঁর আগমনের ফলে সে পথের কদর বহুগুণ বেড়ে যায় আর তার দুর্গমতাও অনেকটা দূর হয়। কাজেই, আমাদের এই পূর্বতন কাহিনীর প্রথম অধ্যায় আলেক্‌-জান্দারের পূর্ববর্তী কাল ; দ্বিতীয় অধ্যায় তার পরবর্তী ইতিহাস।

আবার ভূমধ্যসাগরের কথায় ফিরে আসা যাক।

ভূমধ্যসাগরের একটি প্রধান দ্বীপের নাম ক্রীট। এখানে যে প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে, অর্থাৎ এ দ্বীপের রাজধানী নসাস্ (Cnossus) শহরে যে বিচিত্র রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান, তা এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তৈরি হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। তাঁরা এই সভ্যতার আখ্যা দিয়েছেন, ঈজিয়ান সভ্যতা। এই নামটি ধার করা হয়েছে ঈজিয়ান সাগর থেকে ; ঈজিয়ান সাগর ভূমধ্যসাগরেরই অংশবিশেষ।

এই ঈজিয়ানদের কালে ভূমধ্যসাগরের তীরে বহু জনপদে জলপথে যে তাদের আনাগোনা ছিল সে কথার প্রমাণ রয়েছে। মানুষের বাণিজ্যের ইতিহাসে তাদের নাম হয়ত প্রথম পৃষ্ঠায়, তবে এদের সঠিক ইতিহাস এখনো জানা যায় নি।

এদের ঠিক পরবর্তীকালেই, অর্থাৎ এখন থেকে হাজার চারেক বছর পূর্বে, যে বণিকজাতির সম্পর্কে আমাদের বিশদ জ্ঞান হয়েছে তাদের বলা হয় ফিনিসিয়ান। এদের বাসস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে, অর্থাৎ এশিয়ার সেই অংশে যাকে বলা হয় লেভাণ্ট বা আধুনিক রাজ্য সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি।

ফিনিসিয়ার, অর্থাৎ ফিনিসিয়ানদের বাসভূমির উত্তরে এশিয়া মাইনর, যার আধুনিক নাম তুরস্ক। এখানেও প্রায় একই সময়ে, একটি সভ্য জাতির বাস ছিল ; এদের নাম হিটাইট। হিটাইটেরাও

ছিল বণিকবৃত্তিতে পটু। কথিত আছে, এরা পূর্বে ও পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত নানা প্রকার দ্রব্য বিনিময় করে ঘুরত, বিশেষ করে স্থলপথে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, এরাই প্রথম লোহা দিয়ে হাতিয়ার তৈরির পন্থা আবিষ্কার করে ও তার ব্যবহার করে। এরা যে মিশরে অর্থাৎ আফ্রিকায় লোহা ও লোহার তৈরী হাতিয়ারের চালান দিত তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। লোহার পূর্বে সর্বত্রই যে ধাতুর বহু প্রচলন ছিল তা হল তামা ও পিতল।

ফিনিসিয়ার পূর্ব দিকে এসাইরিয়া রাজ্য, তারও পূর্বে ব্যাবিলন। তারও পূর্বে পারশ্য এবং তারই পূর্ব সীমায় আমাদের হিন্দুস্থান। কিন্তু পারশ্য থেকে হিন্দুস্থানে পৌঁছতে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিবর্ত্ম খাইবার পাস্ পার হয়ে যেতে হত। কাজেই আফগানিস্থান ছিল হিন্দুস্থানের পশ্চিম দরজার প্রহরী।

এই ফিনিসিয়ানরা কিন্তু ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরের আদিম অধিবাসী নয়; এরা এদেশে অভ্যাগত অতিথি। এদের পূর্বতন বাসস্থান যে কোথায় তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এরা পারশ্যের লোক, কারো মতে আরবের। গ্রীকদের আদি ঐতিহাসিক হিরোডেটাসের মতে, এরা ভারত মহাসাগরের উপকূলের লোক।

সে যাই হোক, এদের বাণিজ্যবৃত্তির কাহিনী জগৎবিখ্যাত। এ ব্যাপারে সেকালে জলে ও স্থলে এদের যে সমকক্ষ কেউ ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। এদের দেশ লেবাননের জঙ্গলে প্রচুর কাঠ পাওয়া যেত; এরা তা জলপথে চালান দিত মিশরে। এদের এক আদিম রাজার নাম ছিল হিরাম। তাঁর রাজধানী ছিল টায়ারে। তিনি রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। ওফির নামে কোনো এক বন্দর বা দেশ থেকে তিনি নিয়ে আসতেন প্রচুর সোনা, নানা প্রকার মণিমুক্তা ও প্রভূত পরিমাণ চন্দন কাঠ। এই চন্দন কাঠকে এরা বলত অ্যাল্‌মুগ। এই অ্যাল্‌মুগ-শব্দটিই ক্রমে 'অ্যালগামে' রূপান্তরিত হয়ে বাইবেলে স্থান পেয়েছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন 'অ্যালগাম'-শব্দটি সংস্কৃত 'বল্গুক' (যার অর্থ চন্দনকাঠ) শব্দের অপভ্রংশ; 'বল্গুক' থেকে অ্যাল্‌মুগ, অ্যাল্‌মুগ থেকে অ্যাল্‌গাম।

এই ওফির জায়গাটি যে কোথায় ছিল তা নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। কেউ বলেন এটি ছিল দক্ষিণ আরবে, কেউ বলেন হিন্দুস্থানে।

ঈজিয়ানদের কাল শেষ হবার পরে ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর যে অন্যতম সভ্যজাতির প্রতিষ্ঠা দেখা গেল সে গ্রীক। গ্রীকেরা শুধু যে গ্রীসেই বাস করত তা নয়, তাদের কোনো কোনো দল থাকত ইটালিতে, কেউ কেউ এশিয়া মাইনরে। যে ট্রয় শহরকে কেন্দ্র করে হোমারের ইলিয়াড্ ও অডিসি মহাকাব্য গড়ে উঠেছে তার অবস্থান এশিয়া মাইনরে। পণ্ডিতদের অনুমান, ইলিয়াড্ ও অডিসি লেখা হয়েছিল এখন থেকে প্রায় দু হাজার আট শ বছর আগে। এ দুটি মহাকাব্যে ফিনিসিয়ানদের কথার প্রভূত উল্লেখ রয়েছে। অডিসি মহাকাব্যের নায়ক অডিসিয়াসের এক বিরাট সংবর্ধনায় অভ্যাগতদের মনোরঞ্জনের জন্য ফিনিসিয়ান কলা-বিশারদদের ডাক পড়েছিল। এরা নৃত্য, গীত মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তলন, দৌড়ের রেস্ দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। গ্রীকদের চেয়ে এরা যে কলাশিল্পেও বেশী পারদর্শী ছিল, তা নিঃসন্দেহ।

ফিনিসিয়ান ও গ্রীকদের মধ্যে বাণিজ্য ব্যাপারে ছিল চরম প্রতিযোগিতা। কিন্তু গ্রীকেরা এদের সঙ্গে কোনোক্রমেই পেরে উঠত না। ফিনিসিয়ানদের ব্যবসাবুদ্ধি ছিল তীক্ষ্নতর, সাগরাভি-যানেও ছিল এরা অপেক্ষাকৃত দড়, আর এদের সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। হিরোডেটাস কিন্তু বলেছেন যে গ্রীক ও ফিনিসিয়ানদের এই চিরন্তন রেষারেষির প্রধানতম কারণ প্রণয়ঘটিত। গ্রীক মেয়েরা ছিল অসামান্যা সুন্দরী আর ফিনিসিয়ান পুরুষেরা ছিল প্রবল ভাবপ্রবণ। এদের মেলামেশায়ও বিশেষ বাধা ছিল না। কাজেই, অবস্থাটা ছিল অতনুর লীলাবিকাশের পক্ষে পরম অনুকূল। অথচ গ্রীকদের মনোভাব ও সামাজিক ব্যবস্থা যা ছিল তা এ-সব ক্ষেত্রের অনিবার্য ফলস্বরূপ বিবাহ-বন্ধনের চরম প্রতিকূল। কাজেই দ্বন্দ্ব ছিল পদে পদে।

এরা সাগর পাড়ি দেবার জন্য দু রকম জাহাজ তৈরি করত।

একরকম গোল জাহাজ যা চলত শুধু দাঁড়ের টানে, এতে কোনো পাল থাকত না। বিশেষ করে বাণিজ্যের জন্যই ছিল এর ব্যবহার। আর একরকম জাহাজ ছিল লম্বা ধরনের। এতে থাকত দু সারি দাঁড়, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঙ্গে থাকত পাল। এগুলি প্রধানত যুদ্ধ জাহাজ।

এ ছাড়া নদীতে চলাচলের জন্য ছিল নানা রকম ছোট-খাটো নৌকা।

ফিনিসিয়ানরা ভূমধ্যসাগরে মাছ ধরত আর তা ফেরি করতে আসত ব্যাবিলন পর্যন্ত। এসাইরিয়া ও ব্যাবিলনের বিখ্যাত নদী টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসে চলত তাদের নৌকা। কি করে যে তারা সে নৌকা ফিনিসিয়া থেকে এ দুটি নদীতে নিয়ে আসত তা বিস্ময়ের ব্যাপার।

এরা নানা দেশের অনেক রকম জিনিসপত্র এনে গ্রীসে, ইটালিতে, মিশরে, এশিয়া মাইনরে, প্যালেষ্টাইনে, এসাইরিয়ার ও ব্যাবিলনে বিক্রি করত। সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত, কাঠ, মাছ, নানা প্রকার শস্য ও সবজি, পোড়ামাটির বাসন ও মূর্তি এমনকি বাঁদর, ময়ূর প্রভৃতি সংগ্রহ করেও ব্যবসা করত। এরা যে একরকম কমলা রং তৈরি করত তার খ্যাতি ছিল অসাধারণ। ফিনিসিয়ান-শব্দটিও গ্রীক; এর অর্থও কমলা রং। এই রংএর বাহারই তাদের নামের মধ্যে ফুটে রয়েছে।

আফ্রিকার সঙ্গে এদের দ্রব্য বিনিময় হত যথেষ্ট। এরা যে অন্তত একবার জাহাজে করে সমগ্র আফ্রিকার উপকূল প্রদক্ষিণ করেছিল তার নিখুঁত প্রমাণ রয়েছে। তখনো সুয়েজ খালের সৃষ্টি হয় নি; সে তো হয়েছে মাত্র শ খানেক বছর আগে। তাই, ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে লোহিত সাগরের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না। ফিনিসিয়ানরা কি করে তাহলে তাদের জাহাজ লোহিত সাগরে এনে উপস্থিত করল? পণ্ডিতদের অভিমত, তখন হয়ত এমন ব্যবস্থা ছিল যে মিশরের আলেক্‌জান্দ্রিয়া থেকে নীলনদ বেয়ে লোহিত সাগরে এসে পড়া যেত। এটাও ফিনিসিয়ানদের কীর্তি; তারা নীল নদ থেকে লোহিত সাগরে আসবার জন্য একটা চলনসই রকমের খাল

তৈরি করে নিয়েছিল। আর এই খাল বেয়েই গ্রীসের, রোমের ও হিন্দুস্থানের বাণিজ্য জাহাজ বা বড় নৌকা, যাই বলি না কেন, যাতায়াত করত।

ব্যাবিলনে ফিনিসিয়ানদের গতিবিধি ছিল অবারিত; আবার ব্যাবিলনের সঙ্গে ভারতবর্ষেরও ছিল সহজ সংযোগ। তাই একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরও সংযোগ ছিল প্রত্যক্ষ। প্রথম শতকের ইটালিয়ান ঐতিহাসিক প্লিনি এ অনুমান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সমর্থন করেছেন।

ক্রমে ক্রমে ফিনিসিয়ার পূর্বদিকের রাজ্যগুলির রাজনীতিক পটভূমিকার পরিবর্তন ঘটল। নিনেভ ও ব্যাবিলন যথাক্রমে প্রবল হয়ে ফিনিসিয়া গ্রাস করল; ফিনিসিয়ানরা হল এসাইরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়ার তাঁবেদার। তারপর প্রবল হল পারশ্য। পারশ্যের রাজা জেরাক্সাস্ তাঁর রাজধানী পার্সিপোলিস হতে পশ্চিম জয়ে বের হলেন—এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। এশিয়া মাইনর পর্যন্ত সমস্ত পশ্চিম দেশ জয় করেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না; জলপথে মূল গ্রীস দেশও তিনি আক্রমণ করলেন। এ ব্যাপারে ফিনিসিয়ানদের সমুদ্রগামী জাহাজই হল তাঁর প্রধান সহায়। এঁর সৈন্যদলের মধ্যে যে গান্ধার ও ভারতবর্ষের লোক ছিল সে কথা লিখেছেন হিরোডেটাস। তিনি তাদের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণও দিয়েছেন।

গ্রীসের এই অবমাননারই প্রতিশোধ নিলেন মেসিডোনের রাজা আলেক্‌জান্দার, এর প্রায় দেড়শো বছর পরে।

গ্রীকদের শৌর্য, বীর্য, শিক্ষা ও বুদ্ধির অভাব ছিল না কিন্তু শুধু একতার অভাবেই তারা কোনো দিন এক পরাক্রান্ত অখণ্ড রাষ্ট্র হিসাবে পরিণত হতে পারে নি। আলেক্‌জান্দারের পিতা রাজা ফিলিপ এই একতার প্রচেষ্টায় আংশিক সফল হয়ে পারশ্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তাঁর মৃত্যুর পর তরুণ আলেক্‌জান্দার পিতার স্বপ্ন সফল করে তুললেন।

ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি পারশ্য জয়ে বের হলেন। সে জয়যাত্রা চলল তাঁর সাত-আট বছর ব্যাপী। প্রথম

দখল করলেন ট্রয়। তারপর ফিনিসিয়ায় প্রবেশ করে সিডন, টায়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বন্দরগুলি অধিকার করলেন। তারপর এলেন নিনেভএ। নিনেভএর পাশে আরবেলাতে তাঁর সঙ্গে পারশ্যের তখনকার রাজা তৃতীয় দরিয়াসের যে যুদ্ধ হল তাতে দরিয়াস হলেন পরাজিত। আলেক্জান্দার টাইগ্রিস নদী বেয়ে এসে দখল করলেন ব্যাবিলন।

তারপর অধিকার করলেন পারশ্যের রাজধানী পার্সিপোলিস ও সুসা। পারশ্য জয় হল বটে কিন্তু আলেক্জান্দারের যাত্রা এখানেই শেষ হল না। তখনকার আফগানিস্থানের শহর কান্দাহার ও কাবুল অতিক্রম করে, হিন্দুকুশ পাহাড়ের উপত্যকা পার হয়ে তিনি হিন্দুস্থানের পঞ্জাব প্রদেশের বিখ্যাত শহর এটক ও তক্ষশিলায় পৌঁছে গেলেন।

আলেক্জান্দারকে যে হিন্দুস্থানের পঞ্জাব প্রদেশ থেকেই দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল তার কারণ বহু। তাঁর নিজের সেনা তো ঘরমুখো হলই, আবার এদেশের লোকও হয়ে উঠল তাঁর প্রবল প্রতিরোধী। কিংবদন্তী এই যে, এই বিদ্রোহের আগুনে ইন্ধন যোগাল একদল অর্ধোলঙ্গ সন্ন্যাসী। এঁদের প্ররোচনায় এদেশের লোক বিষম তেতে উঠল।

গ্রীকেরা এঁদের বলেছে, 'জিম্নোসোফিষ্ট'; বাংলায় এর অর্থ অর্ধোলঙ্গ দার্শনিক। তর্কে ও প্রত্যুক্তিতে এঁদের ছিল অসাধারণ দক্ষতা।

এ দলের দশজন সন্ন্যাসী-নেতাকে বন্দী করে আলেক্জান্দার সঙ্গে নিয়ে যান। পথে এক বিচার-সভা বসিয়ে তিনি এঁদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বুঝতে চাইলেন। সভায় এঁদেরই দলের একজনকে সভাপতি করে বাকি নয় জনকে একে একে নয়টি প্রশ্ন করা হল। সে সব প্রশ্ন ও তার জবাব আধুনিক quiz বা প্রশ্নোত্তরের আদি পুরুষ। প্রথম প্রশ্নটি, পরে তার জবাব, উদ্ধৃত করছি।

প্রথম প্রশ্ন: 'দলে ভারী কারা? যারা মরেছে, না যারা বেঁচে আছে?'

'জীবিতের দলই ভারী, কারণ যারা মৃত তাদের অস্তিত্ব নেই।'

[সন্ন্যাসীরা হয়ত চার্বাক-ধর্মী ছিলেন। চার্বাকের মতে দেহের সঙ্গেই প্রাণীর অস্তিত্ব লোপ পায়। তাই চার্বাক-ধর্মীরা বলতেন, ঋণ করেও ঘি খাও, কারণ এর পরে তো আর তোমার অস্তিত্ব থাকবে না।]

দ্বিতীয় প্রশ্ন : 'সব চেয়ে বড় জন্তু জন্মে কোথায়? স্থলে না জলে?'

'স্থলে, কারণ জলের নীচেও তো মাটি; নদীই বল, সাগরই বল, সবই তো স্থলেরই অংশবিশেষ।'

তৃতীয় প্রশ্ন : 'জন্তুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধূর্ত কোনটি?'

'মানুষ তা আজও বের করতে পারে নি।'

চতুর্থ প্রশ্ন : 'গ্রীকদের বিরুদ্ধে দেশের লোককে তাতিয়ে তুলতে আপনারা কি যুক্তি দিয়েছিলেন?'

'সে এমন কিছুই নয়; আমরা শুধু বলেছিলাম, হয় সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচবে, নয় সম্ভ্রম নিয়ে মরবে।'

পঞ্চম প্রশ্ন : 'দিন ও রাত্রির মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে?'

'দিনই জন্মেছে প্রথম, রাত্রির একদিন পূর্বে।'

[মনে রাখতে হবে, সূর্যই দিন রাত্রি ও পৃথিবীর স্রষ্টা।]

ষষ্ঠ প্রশ্ন : 'কোন মানুষ সবচেয়ে জনপ্রিয়?'

'যাঁর ক্ষমতা অসাধারণ, কিন্তু লোকের কাছে যিনি ভীতিপ্রদ নন।'

সপ্তম প্রশ্ন : 'মানুষ ভগবানে রূপান্তরিত হয় কি করে?'

'মানুষের অসাধ্য কর্ম সাধন করে।'

[আলেক্জান্দার নিজেকে শুধু গ্রীকদের পৌরাণিক গল্পের মহাশক্তিধর নায়ক 'হারকিউলিসের' বংশধর বলেই মনে করতেন না, দেবাধিপতি 'জিয়াসের' পুত্র বলে বিশ্বাস করতেন। সর্পরূপী জিয়াসের ঔরসে মানবী মাতার গর্ভেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। দেবাধিপতি জিয়াসের অবশ্য বহু মানবী প্রেয়সী ছিল।]

অষ্টম প্রশ্ন : 'জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী?'

'বেশী শক্তিশালী জীবনই, কারণ জীবনকেই বহু দুঃখ সহ্য করতে হয়।'

নবম প্রশ্ন : 'কতদিন পর্যন্ত মানুষের জীবিত থাকা উচিত ?'

'ততদিনই, যতদিন না মৃত্যুকে অক্ষেপাকৃত কাম্য বলে মনে হয়।'

এবার আবার পথের কথায় আসা যাক।

হয়ত আলেক্‌জান্দার যে পথে হিন্দুস্থানে এসেছিলেন তা দিয়েই গ্রীস ও হিন্দুস্থানের মধ্যে বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ধারা বয়ে চলেছিল। গ্রীস দেশে কিংবদন্তী এই যে সে দেশের থেলস, এম্পেডোকলস, এনাক্সাগোরাস ও ডেমোক্রিটাস প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এঁরা সবাই খ্রীষ্টপূর্ব যুগের লোক। এ জনশ্রুতি সত্য কিনা তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তবে গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস যে এদেশে এসেছিলেন তা প্রায় নিঃসন্দেহ বলে মনে হয়। তিনিও এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের মানুষ। পিথাগোরাসের আগমনের কথা বলেছেন ফরাসী দার্শনিক ভলটেয়ার। আরও স্পষ্ট করে বলেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ম্যক্‌ডোনেল।

মহারাজ অশোক এই পথেই তাঁর 'ধম্মবিজয়' যাত্রায় অনুচর পাঠিয়েছিলেন পারশ্যে, এশিয়া মাইনরে ও মিশরের আলেক্‌জান্দ্রিয়ায়। সে কথা এখন থেকে প্রায় সাড়ে বাইশ শ বছর আগের। মিশর জয় করে আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরটির পত্তনই করেন আলেক্‌জান্দার।

এই আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সঙ্গে জলপথে ভারতবর্ষে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এরও পূর্বে এ এলাকার সঙ্গে হিন্দুস্থানের যেসব কাজ-কারবার চলত তার সঠিক খবর এখনও ইতিহাসের পাতায় লেখা হয় নি। অনুমান, এ বাণিজ্য চলত স্থল-পথে ও জলপথে—উভয় পথেই ; আর এ ব্যাপারে প্রধান কর্মকর্তা ছিল ফিনিসিয়ানরা। খ্রীষ্টের জন্মের পরে প্রথম চার শ বছর অর্থাৎ এখন থেকে পনেরো-ষোলো শ বছর আগে, হিন্দুস্থানের বণিকের দল যেত আলেক্‌জান্দ্রিয়া, পালমিরা প্রভৃতি বন্দরে ; আবার গ্রীস ও রোমের জাহাজ আসত গুজরাটের ব্রোচ বন্দরে। ব্রোচ থকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত ছিল দেশের বাণিজ্যের রাজপথ। উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের গুপ্তরাজ্যের অন্যতম রাজধানী। পশ্চিম ভারতে

আধিপত্য বিস্তারের জন্যই এই দ্বিতীয় রাজধানীর সৃষ্টি হয়েছিল। মূল রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে বা আধুনিক পাটনায়। এই গুপ্ত বংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই দেশের বহু আখ্যায়িকায় বর্ণিত অদ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিত্য। উজ্জয়িনীতে তাঁর নবরত্নের সভার কথা সর্বজনবিদিত। তাঁরই কালে চীনের প্রসিদ্ধ পর্যটক ফা-হিয়েন এদেশে আসেন।

গ্রীস, রোম ও হিন্দুস্থান সকল দেশের জাহাজই তখন চলত পালে। তাই জলপথে আসতে যেতে সময় লাগত অনেক। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে যাতায়াতের সময় ক্রমে সংক্ষেপ হয়ে এল। তারপর আরো সুবিধা হল গ্রীক নাবিক হিপ্পেলাসের তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে। যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পঁয়তাল্লিশ বছর পরে তিনি মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই ঋতুগত বায়ুর ভরে পাল খাটিয়ে আরব সাগর পারাপার হওয়া হল অনায়াসসাধ্য। কথিত আছে, এর ফলে রোম থেকে হিন্দুস্থানে পৌঁছতে মাত্র চার মাস সময় লাগত।

এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ আলেক্‌জান্দারের পরবর্তী কালের কথায় আসা যাক।

গ্রীকের পরে প্রবল হল রোমান। এদের রাজ্য কিন্তু টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে আরও পূর্ব দিকে প্রসারিত হল না। তবে এদের আমলে রাস্তাঘাট আরও ভালো হল; এরাই প্রথম এদেশে সেতু তৈরি করল।

ফিনিসিয়ায় বাণিজ্য ও শিল্প দুয়েরই হল প্রভূত উন্নতি। সিডনে কাঁচের ফাঁপা জিনিসপত্র তৈরি হল, আর তার ফলে দেশের অর্থাগমও হল প্রচুর।

তখন হিন্দুস্থানে গুপ্তসাম্রাজ্যের কাল; পঞ্জাব প্রদেশে সে রাজ্যের সীমানা থেকে রোমান রাজ্য ছয়-সাত শ মাইলের বেশি দূরে ছিল না। তারপর গুপ্ত রাজাদের সঙ্গে রোমান রাজাদের ছিল সৌহার্দ্য। কাজেই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে তখন বাণিজ্যসূত্র দৃঢ় হয়ে উঠেছিল একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। একালে হিন্দুস্থান থেকে রোমান সম্রাটের দরবারে অন্ততঃ

বার তিনেক যে রাজদূত প্রেরণ করা হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে। প্রথম ৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় ৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে ও শেষে ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম ছুটি নিশ্চয়ই সমুদ্রগুপ্তের আমলে, তৃতীয়টি হয় তৃতীয় কুমারগুপ্তের কালে, নয় তাঁর পুত্র বিষ্ণুগুপ্তের আমলে।

তারপর রোমান বাজ্য ধ্বংস হল। তার সঙ্গে সঙ্গে এদিককার রাস্তাঘাট হয়ে পড়ল যেমন ছুর্গম তেমনি বিপদ-সঙ্কুল। ফলে হয়ত স্থলপথে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংযোগের ধারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে উঠল।

এর মধ্যে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ছু হাজার বছর আগে, প্যালেষ্টাইনে হল খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব, আর তারও ছয় শ বছর পরে আরব দেশে হল ইস্‌লামের জন্ম। জন্মের কিছু পরেই খ্রীষ্টধর্ম ও ইস্‌লাম বের হল দিগ্বিজয়ে। তার ফলে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা স্থানে রাজনীতিক পটপরিবর্তন হতে শুরু করল। সে কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই।

এদিকে মহারাজ অশোকের পরেও মৌর্যবংশেরই জনকয়েক ক্ষীণজীবী নৃপতি কিছুদিন হিন্দুস্থানেব পশ্চিম দরজার প্রহরী হয়ে ছিলেন। তাঁদের পরে সেখানে স্থাপিত হল গ্রীক রাজ্য। তাও স্থায়ী হল প্রায় ছু শ বছর। তারপর বাব বার ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হয়ে ইস্‌লাম হিন্দুস্থানের দরজায় হানা দিল দশম শতকে অর্থাৎ এখন থেকে হাজার খানেক বছর আগে। গ্রীকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ শেষ হবার পর পশ্চিমের দরজা দিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের তথা ইউরোপের স্থলপথের যোগাযোগ ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হয়ে এল। ব্যবসা-বাণিজ্য চলল অন্য পথে।

আমাদের মূল কথা শুরু হল ষোড়শ শতকে। ঠিক সেকালে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের কারবার কি করে চলত তারই একটা নকসা দিয়ে কাহিনী শুরু করা যাক।

হিন্দুস্থানে তখন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রাজ-বংশের প্রথম পুরুষ বাবর, দ্বিতীয় হুমায়ুন, তৃতীয় আকবর, চতুর্থ জাহাঙ্গীর, পঞ্চম সাজাহান ও ষষ্ঠ আওরংজেব। কাল মোটামুটি ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ পৌনে ছু শ বছর।

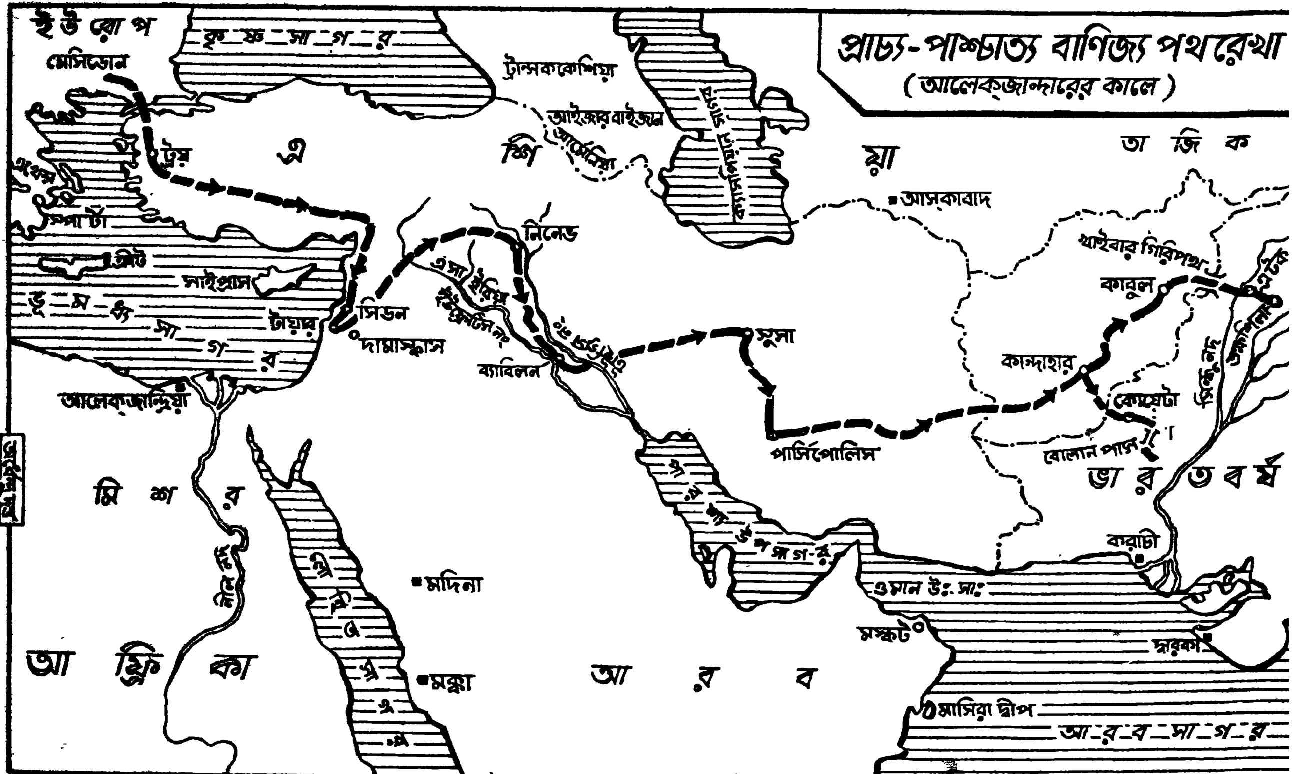
আওরংজেব বংশের শেষ বীর্যবান পুরুষ, কিন্তু বংশের বালখিল্যের দল তাঁর পরেও কিছুদিন সিংহাসনে কায়েম রইলেন। আওরংজেবের দেহান্তের প্রায় বছর পঞ্চাশেকের মধ্যেই এল ইংরেজ, কিন্তু তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এল আরো কয়েকটি পাশ্চাত্য জাতি। আমরা যে কালের কথা বলছি তা শেষ হয়েছে এই বালখিল্যদলের সপ্তম পুরুষ দ্বিতীয় আলমগীরের সময়ে।

এবার হিন্দুস্থানের সেকালের বাণিজ্য পটভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

বহির্বাণিজ্যের দিক থেকে তখন দেশকে মূলত চারিটি ভাগে বিভক্ত করা চলত। এর দুভাগ পশ্চিম উপকূলে, দুভাগ পূর্ব উপকূলে। পশ্চিম উপকূলে গুজরাট প্রদেশ; তার পয়লা নম্বর বন্দর সুরাট। তার পাশে মালাবার প্রদেশ—গোয়া থেকে কেপ্ কমোরিন পর্যন্ত বিস্তৃত। তার প্রধান বন্দর কালিকট; এ বন্দরের কথা পরে বলা যাবে। পূর্ব উপকূলে এক, করোমণ্ডল অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রদেশ; দুই, বাংলাদেশ।

পশ্চিম উপকূলের সুরাটই ছিল হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় বন্দর। এখানে চারদিক থেকে নানা রকম পণ্য এসে জড় হত। গুজরাটের কার্পাস, মালাবারের গোলমরিচ, আগ্রার নীল, পাটনার কস্তুরী, সিংহলের দারুচিনি, মল্‌ডাইভ দ্বীপের কড়ি আর বাংলার সিল্ক তো আসতই, এমনকি দূরপ্রাচ্যের দ্বীপ সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি থেকে আসত নানারূপ মসলা। কাজেই এ বন্দরের চালানী কারবার ছিল জমজমাট। এর ফলে সমস্ত বিদেশী বণিকের দলই ক্রমে ক্রমে এখানে আস্তানা গেড়ে বসেছিল।

মোগল বাদশাহের একজন গভর্ণর এখানে স্থায়িভাবে বাস করে এ সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের তদারকি করতেন। এ বন্দর থেকে বাদশার বার্ষিক আয় হত বার লক্ষ টাকা। মোগল সম্রাটের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা শিবাজী তাই দু দুবার এ বন্দর আক্রমণ করে লুটতরাজ করেন। প্রথম বার করেন ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় বার কয়েক বছর পরে। তবে বিদেশী বণিকদের কুঠির তিনি কোনো অনিষ্ট করেন নি। এর পূর্বে সুরাটের নগরপ্রাচীর ছিল মৃত্তিকায়


প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্য পথরেখা
(আলেকজান্দারের কালে)
ইউরোপ
মেসিডন
কৃষ্ণসাগর
ট্রাস্‌কককেশিয়া
আইজারবাইজান
আর্মেনিয়া
এশিয়া
তাজিক
ট্রয়
স্পার্টা
ক্রীট
সাইপ্রাস
ভূমধ্যসাগর
টায়ার
সিডন
দামাস্কাস
নিনেভ
ব্যাবিলন
সুসা
আসকাবাদ
খাইবার গিরিপথ
কাবুল
কান্দাহার
কোয়েটা
বোলান পাস
পার্সিপোলিস
ভারতবর্ষ
করাচী
আলেকজান্দ্রিয়া
মিশর
মদিনা
মক্কা
আফ্রিকা
আরব
মস্কট
ওমান উঃ সাঃ
দ্বারকা
মাসিরা দ্বীপ
আরব সাগর

তৈরি, আক্রমণের পরে সে প্রাচীর তৈরি করা হল ইষ্টকে। নগরের পরিধিও ছোট করা হল।

মালাবারের প্রধান সম্বল ছিল গোলমরিচ। কিন্তু মালাবার ছিল মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে। উপকূল জুড়ে ছিলেন ছোট ছোট রাজারাজড়া; তাদের মধ্যে কালিকটের রাজাই প্রবল।

মাদ্রাজে কার্পাস বস্ত্র কিছু পাওয়া যেত বটে, কিন্তু এর জন্য সে দেশের নাম-ডাক ছিল না। আশপাশ থেকে নানা রূপ মাল সংগ্রহ করে গুদামে মজুত রাখাই ছিল এ প্রদেশের বন্দরগুলির প্রধান কাজ।

বাংলার গৌরব ছিল সিল্ক ও কার্পাস বস্ত্র আর অপর্যাপ্ত খাদ্য শস্য।

হিন্দুস্থানের বহির্বাণিজ্য ছিল বিদেশীর হাতে। এরা প্রধানত আরব ও মিশরের মুসলমান; এদের সাধারণ সংজ্ঞা ছিল মুর। মুরেরা মুখ্যত হিন্দুস্থানের সারা পশ্চিম উপকূল থেকেই নানা পণ্য সংগ্রহ করত, আর এ দেশে বাসও করত সে বাণিজ্যসূত্রেই। কেউ কেউ দূর প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জ—অর্থাৎ সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি জায়গা থেকে মসলা নিয়ে আসত। সে মসলা চালান হত পশ্চিমে, সুরাট ও কালিকট থেকে।

কিন্তু হিন্দুস্থানে তখন কি এমন কোনো বণিকগোষ্ঠী ছিল না, যারা এ জাহাজী কারবার করতে পারত? ছিল বৈকি। মোগল বাদশার কালের প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক অর্মি বলেছেন, এ দেশের বণিকদের মধ্যেও সে কালে এমন সব মহাজন ছিল যাদের কারো কারো পাঁচ শ টনের জাহাজও ছিল পনেরো-বিশটি। কিন্তু মোগল সম্রাট্দের কারোই দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রতি কিছুমাত্র দরদ ছিল না। কাজেই এদের স্বার্থরক্ষার জন্য না ছিল তাঁদের কোনো চেষ্টা, না ছিল যাতায়াতের পথে এদের রক্ষা করবার জন্য দায়িত্ব বা নৌসৈন্য। তারপর মুরেরা ছিল দক্ষ, উদ্যোগী ব্যবসায়ী; এরাই হিন্দুস্থানের মালের প্রচলন করেছিল ইউরোপে। ফলে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশী বণিকের দল হটে যেতে লাগল।

এরা ইউরোপে মাল পাঠাত তিনটি প্রধান পথে। সমগ্র ব্যাপারটা

ছিল এমনি যাকে আমরা বলে থাকি 'রিলে রেস্' (Relay Race)। অর্থাৎ এ কাজে ধাপে ধাপে বিভিন্ন কর্মীর দল নিয়োজিত থাকত: তাদের লক্ষ্য থাকত এক এবং পথও থাকত ধরাবাঁধা। এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে মাল নিয়ে যেত বিভিন্ন দল।

আরবের ব্যাপারীরা হিন্দুস্থান থেকে মাল নিয়ে যেত তাদের ছোট ছোট জাহাজে। সে সকল জাহাজ যেত সুরাট বা কালিকট থেকে পারশ্য উপসাগরের কোলে 'অরমুজ' ওরফে বাসোরা বা বসরা পর্যন্ত। সেখানে মাল উঠত উটের পিঠে। সে মাল ফেরি হত দেশে দেশে। ক্যাসপিয়ান সাগরের কোলে আর্মেনিয়া ও শহর তাব্রিজ কৃষ্ণ সাগরের তীরে ট্রাবজন, সাইরিয়ার এলেপ্পো, দামস্কাস প্রভৃতি নানা বাজারে ফেরি হবার পরে যে মাল বাঁচত তা আসত ভূমধ্যসাগরের বেরুট বন্দরে। সে বন্দর থেকে জাহাজ ভরে মাল নিয়ে যেত ইটালির ভেনিস ও জেনোয়ার ব্যবসায়ীরা। তারপর ইটালির বণিকেরাই তা ছড়িয়ে দিত সারা ইউরোপে।

অনেক মাল আবার সোজা চলে যেত কন্স্টান্টিনোপলে ওরফে ইস্তাম্বুলে। ইস্তাম্বুল ইউরোপে, কৃষ্ণসাগরের তীরে। এশিয়া মাইনর যেখানে কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে মিশেছে তারই অপর পারে। কৃষ্ণসাগরের এক তীরে ইউরোপ, অন্য তীরে এশিয়া।

কন্স্টান্টিনোপল শহরটির পত্তন করেন রোমান রাজা কন্স্টেন্টাইন্ ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে। এখান থেকে পূব দিকে ব্যাবিলনের সীমানা পর্যন্ত, অর্থাৎ রোমান রাজ্যের শেষ পর্যন্ত ছিল প্রশস্ত রাজবর্ত্ম রোম থেকে রাজধানী কন্স্টান্টিনোপলে চলে আসার ফলে রোমানদের সাথে তাদের পূব দিকের প্রতিবেশী পারশ্য ও হিন্দুস্থান, দক্ষিণ দিকের প্রতিবেশী মিশর, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের লোকের জানাশুনা আরো অনেক বেড়ে যায়। সে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের চিহ্ন রয়েছে 'বাইজেনটাইন' শিল্পকলার মধ্যে। রোমান রাজ্যের এই পূর্ব অংশকে বাইজেনটাইন বলা হত।

এ বন্দরটি সেকালে ছিল পশ্চিমের সিংহদ্বার। ইউরোপের নানা দেশ থেকে বণিকদের দল এখানে এসে মাল নিয়ে যেত। তারা যে সবাই ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আসত তা নয়। উত্তর দেশ থেকে,

অর্থাৎ দিনেমারদের দেশ ডেনমার্ক থেকে, জার্মানী থেকে, সুইডেন ও বল্‌টিক সাগরের কোলের নানা বন্দর থেকে, সওদাগরী জাহাজ রাশিয়ার নদী বেয়ে এসে পড়ত কৃষ্ণসাগরের তীরের এই বন্দরে।

আবার এদিকে মিশরের ব্যাপারীরা হিন্দুস্থান থেকে প্রথম জাহাজে আসত এডেন বন্দরে। তারপর লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যেত সুয়েজে। সুয়েজ থেকে উটের পিঠে মাল বোঝাই করে চলে যেত কাইরো। কাইরো থেকে নীলনদ বেয়ে নৌকায় আসত আলেক্‌জান্দ্রিয়া। ইউরোপের ব্যবসায়ীর দল সে বন্দরে এসে জাহাজ ভরে মাল নিয়ে যেত ; বেশির ভাগই নিত ভেনিস ও জেনোয়ার ব্যবসায়ীরা।

তাই, যে কালের কথা আমরা বলছি সেকালে এশিয়া থেকে ইউরোপে মাল যেত প্রধানত তিনটি দ্বার দিয়ে। প্রথম কন্‌স্টান্টিনোপল ওরফে ইস্তাম্বুল, দ্বিতীয় ভেনিস ও তৃতীয় জেনোয়া। তিনটিই ইটালির শহর। এ ব্যবসার কর্ণধারও ছিল সে দেশের ব্যবসায়ীরাই—যাদের সাধারণ সংজ্ঞা ছিল লম্বার্দ। এশিয়ার মাল ইউরোপে বিক্রি করা ছিল এদের একচেটিয়া কারবার। সে এক-চেটিয়া ব্যবসায়ের পুরা সুযোগ নিত এরা। ফলে, এশিয়া ও আফ্রিকার নানা প্রয়োজনীয় মালের জন্য অসম্ভব চড়া দাম দিতে হত ইউরোপের প্রায় সকল দেশেরই।

এ সকল মালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় ছিল মসলা। মসলার ব্যবহার ছিল ইউরোপের ঘরে ঘরে। কথাটা একালে অবশ্য বিস্ময়ের বিষয়, তাই এর একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ইউরোপের সর্বত্র এই প্রবল মসলা-প্রীতির কারণ ছিল দুটি। একটি খাদ্য-সংরক্ষণ, অন্যটি ভৈষজ্য-প্রয়োগ। সেকালে ইউরোপে সর্বসাধারণের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস। সেখানে শাকসবজির চাষ, এমনকি আলুর চাষও শুরু হয় অনেক পরে। যেসব ফল একালে ইউরোপে সাধারণভাবেই জন্মে, তারও কোন চিহ্ন তখন ছিল না। তাই, এখন থেকে চার-পাঁচ শ বছর আগেও, শুধু সাধারণ কেন প্রচুর অর্থবান্ লোকেরও, এমনকি রাজা-রাজড়ারও, আহার্য দ্রব্য না ছিল রকমারি না ছিল রুচিকর। শুধু মাংস আর মাংস। পূর্বেই

বলা হয়েছে, রোমান রাজাদের কালে হিন্দুস্থানের সঙ্গে রোমান রাজ্যের ছিল সহজ সংযোগ। ফলে, বোধহয় হিন্দুস্থান থেকে আহৃত মসলা দিয়েই রোমানরা মাংসকে স্বাদু করে নিত। হয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে সারা ইউরোপের ঘরে ঘরে ক্রমে সে ব্যবস্থা কায়েম হল।

এখনকারের মত তখন মাংস সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ বিশেষ করে শীত ঋতুতে তাজা মাংস ছিল অত্যন্ত আয়াসলভ্য। কাজেই মাংস সংরক্ষণ ছিল মাংস সংগ্রহের মতই অপরিহার্য ব্যাপার। এ কাজ করা হত মসলা দিয়ে। মসলা শুধু মাংস সংরক্ষণই করত না, বাসি মাংসের দুর্গন্ধ দূর করে তাকে খাদ্যোপযোগী করেও তুলত। এ কার্যে প্রধান সহায় ছিল গোলমরিচ।

তারপর ভেষজের কথা।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, অর্থাৎ মোটামুটি চার শ বছর আগে, জগতের কোথাও আধুনিক ভেষজের সৃষ্টি হয় নি কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তার বয়স মাত্র চার শ বছর। গাছগাছড়া থেকে তৈরী নানা মুষ্টিযোগ বা টোট্‌কা ঔষধই ছিল রোগে মানুষের ভরসাস্থল। হিন্দুস্থানে তৈরী নানা প্রকার আয়ুর্বেদীয় ভেষজের সুনাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে পারশ্য ও আরবের দৌত্যে। তাছাড়া ইউরোপের নানা জাতের নাবিকের বিভিন্ন মসলা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেও। সে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশী। তাই হিন্দুস্থানের ভেষজ-বিদ্যার কথা বাদ দিয়ে সে অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। অবশ্য হিন্দুস্থানের ভৈষজ লতা-গুল্ম-কন্দ-মূল ও বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক তথ্যও সেকালে ক্রমে লেখা হয়েছিল; প্রথম লিখেছিলেন পোর্তুগীজ বিজ্ঞানী ডা. অর্টা ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রথম গোলমরিচ। আধুনিক কালে এর প্রয়োজন শুধু খাদ্যকে রুচিকর করে তোলার জন্য। কিন্তু সেকালে দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে, শোথ কমাতে, যকৃতের ব্যথার উপশমে এর ব্যবহার ছিল ব্যাপক।

দ্বিতীয় লবঙ্গ। কাঁচা লবঙ্গেরই কদর ছিল বেশি। চিনির রসে ফেলে এ দিয়ে তৈরি হত মোরব্বা, আবার নুন দিয়ে সিরকায় ফেলে তৈরি হত আচার। মালাক্কা ও হিন্দুস্থানে ছিল এ আচার

ও মোরব্বার বহু প্রচলন। উভয়ই সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও হজমী। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে এ মসলা অদ্বিতীয়।

তৃতীয় এলাচি। এলাচি মাংসের সঙ্গে ব্যবহার করলে মাংস হয় সুস্বাদু আর শুধু শুধু চিবিয়ে খেলে নিতান্ত ক্লেদাক্ত মুখও হয় পরিষ্কার।

চতুর্থ আদা। তেল, নুন ও সিরকায় মিশিয়ে নিলে মাছ ও মাংসের সঙ্গে খেতে হয় রুচিকর। আর, আদা হজমীও বটে।

পঞ্চম দারুচিনি। স্বাদু মসলা; ব্যবহারে দুর্বল হৃৎপিণ্ড সবল হয়, চোখের ছানি দূর হয়, শোথ কমে যায়, বুকের কার্য স্বাভাবিক হয়, আর যকৃৎ শক্তিশালী হয়।

ষষ্ঠ জায়ফল ও জয়ত্রী।—জায়ফলকে একটি জাদুকর ভেষজও বলা চলে। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে, পেটের পীড়া দূর করতে, মূত্র শোধন ও দেহগত বায়ুর সমতা আনয়ন করতে এর তুল্য ভেষজ নেই।

জায়ফলের ছাল বা জয়ত্রীরও অশেষ গুণ। এটি সর্দির মহৌষধ, পরিপাকের সহায়ক ও জায়ফলের মতই বায়ুর সমতা বর্ধক।

সপ্তম তেঁতুল। মুখরোচক চাটনি ও নানা প্রকার ব্যঞ্জন তৈরি করতে এর ব্যবহার ব্যাপক। এটি প্লেগেরও ঔষধ।*

অষ্টম চন্দন কাঠ। মনোরম ধূপ ও গন্ধ তেল তৈরি করতে এর প্রয়োজন ছাড়াও, এর ভৈষজ্য শক্তি অসাধারণ। পেটে বাটা-চন্দনের প্রলেপে নিদারুণ জ্বরও নিরাময় হয় এবং সরবতের সঙ্গে চন্দন-বাটা পান করলে হৃৎপিণ্ড সবল হয়।

ভাং ও আফিং মসলা নয়, মাদক দ্রব্য। তবে এদেরও নানা রোগনাশক গুণ রয়েছে।

মোট কথা, মসলার গুণেরও শেষ ছিল না তাই এর কদরও ছিল অসাধারণ। খাদ্য-সংরক্ষণ ও ভেষজ হিসাবে ইউরোপে এর ব্যবহার ছিল বহু ব্যাপক। পূর্বেই বলা হয়েছে, মসলার ব্যবসাটা ছিল ইটালিয়ান বা লম্বার্দদের একচেটিয়া, আর ভেনিসের ব্যবসায়ীরাই ছিল এ ব্যাপারে অগ্রণী। কাজেই ভেনিসেরই ছিল ইউরোপের

* সমগ্র ইউরোপেই সেকালে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ছিল প্রবল।

বাজারে একাধিপত্য। একদিকে ভেনিসের বণিকেরা তাদের জাহাজ বোঝাই করে জিব্রাল্‌টারের পথে অ্যাটলান্টিক সাগর বেয়ে ইউরোপের নানা বন্দরে মসলা নিয়ে আসত। আবার ভেনিসেও ইংরেজ বণিকের দল আসত তাদের পশম নিয়ে, ফরাসী আসত তাদের বিখ্যাত মদ নিয়ে, ওলন্দাজ আসত তাদের পনির ও হেরিং মাছ নিয়ে, সুইডিস ও দিনেমার আসত তাদের বনসম্পদ ও পশুলোম নিয়ে। কিন্তু তারা সবাই যার যার দেশে ফিরে যেত মসলা দিয়ে জাহাজ বোঝাই করে। এমনই ছিল এর চাহিদা।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই মসলার বেশির ভাগই আসত কন্‌স্টান্টি-নোপল বা ইস্তাম্বুলের পথে। সেখান থেকে অনেক মাল যেত ভেনিসে। দক্ষিণ ভারতের মালাবার গোলমরিচের রাজ্য আর লংকাদ্বীপ দারুচিনির। এ ছাড়া উভয় দেশেই অন্যান্য মসলাও কিছু কিছু জন্মে। দূর প্রাচ্যের সুমাত্রা দ্বীপের গোলমরিচ, মলুক্কা দ্বীপের লবঙ্গ, আম্‌বনিয়া ও বান্দা দ্বীপের জয়ত্রী ও জায়ফলের সমাবেশ হত মালাবারের বিখ্যাত বন্দর কালিকটে। কালিকট, সুরাট প্রভৃতি বন্দরের সঙ্গে দূর প্রাচ্যের এই দ্বীপগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশই করত মুরেরা। হিন্দুস্থানের হিন্দু বণিকেরাও কিছু কিছু এ কাজ করত বটে।

ইউরোপে এই মসলা ব্যবসায়ে লাভের অন্ত ছিল না। কন্‌স্টান্টিনোপল ও ভেনিসের প্রধান পণ্যই ছিল মসলা, বিশেষ করে গোলমরিচ। এতে লাভের অঙ্ক ছিল সাধারণ অনুমানের বাইরে; একটা মোটামুটি হিসাব না দিলে তা স্পষ্ট হবে না।

পোর্তুগীজ নাবিক সর্দার ভাস্কো-ডা-গামার কথা পরে আসবে। তিনিই প্রথম জাহাজে করে হিন্দুস্থানের বন্দর থেকে মসলা সোজা ইউরোপে নিয়ে যান। তাতে তাঁর লাভ হয়েছিল শতকরা ছ হাজার টাকা অর্থাৎ হিন্দুস্থানের প্রতি একশ টাকার মাল ইউরোপে বিক্রি হয়েছিল ছ হাজার টাকার উপর। একথা স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে অক্সফোর্ড ইকনমিক অ্যাট্‌লাসের অবতরণিকায়।

ভাস্কো-ডা-গামার কালিকট যাত্রার ষোলো-সতেরো বছর পরে, পোর্তুগীজ নাবিক ম্যাজিলনের নেতৃত্বে স্পেন থেকে এক নৌবহর

সারা বিশ্ব-পরিক্রমায় পাঠানো হয়। তাদেরও লক্ষ্য ছিল দূর প্রাচ্যের মসলা দ্বীপগুলির সহজ পথ বের করা। এই বহরের একটি অংশ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে, দূর প্রাচ্যের মলুক্কা দ্বীপে নোঙর করে; বছর-তিনেক পরে দেশে ফিরে আসে। বহরে ছিল চারখানা জাহাজ আর দু শ পঁয়ষট্টি জন নাবিক। এই পরিভ্রমণ সাঙ্গ করে দেশে ফিরে এল মাত্র একখানা জাহাজ আর জন-আঠারো মানুষ। কিন্তু তারা সঙ্গে নিয়ে এল মোটামুটি ছাব্বিশ টন নানা জাতের মসলা। এ-ত ক্ষয়ক্ষতি দিয়েও এই মসলা বিক্রি করে সে দৈববিড়ম্বিত সফরেও লাভ হল বহু লক্ষ টাকা। এর কারণ, সেকালে দারুচিনি, আদা প্রভৃতি বিক্রি হত শুধু ভিষকের দোকানে—বহুমূল্যে। এমনকি গোলমরিচের এক-একটি দানা তার সম ওজনের রূপার সঙ্গে বিনিময় হত বললেও অত্যুক্তি হয় না। একালে অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা সত্য।

ক্রমে বাইজেন্‌টাইন্ অর্থাৎ পূব দিকের রোমান রাজ্য ও এশিয়া মাইনরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হল। তুর্কীরা এসে কন্‌স্টান্টিনোপল্ দখল করল এখন থেকে প্রায় পাঁচ শ বছর আগে, ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে, সে জমজমাট বন্দরটির সঙ্গে ইউরোপের নানা জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেল। হিন্দুস্থান থেকে পারশ্যের মধ্য দিয়ে এ বন্দরে মাল পাঠানো হয়ে উঠল বিষম বিপদসঙ্কুল ও বিশেষ ব্যয়সাধ্য। আরবের মধ্য দিয়ে আলেক্‌জান্দ্রিয়া হয়ে ভেনিসে কিছু কিছু মাল যেত বটে, কিন্তু ইউরোপের প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অল্প। কাজেই ইউরোপের বাজারে এই পরম প্রয়োজনীয় মসলাগুলির দর ক্রমাগত বেড়ে সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে চলে যেতে লাগল।

এর পরে ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য-সংযোগ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়ে সে সংযোগের ধারা বইল আরো পশ্চিমে—অ্যাট্‌লান্টিক সাগরের মধ্য দিয়ে।

॥ দুই ॥

ইস্তাম্বুল বন্দরটি তুর্কীদের হাতে চলে যাবার কালে, অর্থাৎ এখন থেকে মোটামুটি পাঁচ শ বছর আগে, ইউরোপের যে অবস্থা ছিল এবার সে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক।

এখন থেকে প্রায় ছয় শ বছর আগে যে নূতন ভাবধারা ইউরোপের দেশগুলিকে একের পর এক প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল, ইতিহাসে তার নাম দেওয়া হয়েছে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ফলে সে দেশের মানুষের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এর পূর্বে সর্বসাধারণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ইহলোকে সর্বপুণ্যকর্মের ফল পরলোকে সুখ ও শান্তি। নবজাগরণের ফলে যে ধারণা কায়েম হল তার মূলতত্ত্ব, ইহলোকেই মানুষকে তার সর্বকামনা পরিতৃপ্ত করতে হবে; পরলোক আছে কি নেই তা নিয়ে তর্ক করা বৃথা।

ঐতিহাসিকরা রেনেসাঁসের বহু কারণ উল্লেখ করেছেন। সে কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে যে কারণ এখন প্রায় সর্ববাদিসম্মত তা হচ্ছে যে, সহসা সমাজের সর্বস্তরেই অভাবিত ঐশ্বর্যবৃদ্ধি এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর একমাত্র না হোক প্রধানতম কারণ।

কথাটা যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। রেনেসাঁসের প্রথম ঢেউ লাগে ইটালিতে। ইটালির বিখ্যাত শহর ভেনিস, জেনোয়া, মিলান ও ফ্লোরেন্স সেকালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বন্দর ও শহর; এদের মধ্যমণি ভেনিস। ভেনিসের প্রধান পণ্য পূর্বাঞ্চলের মসলা। আর সে মসলার কারবার লম্বার্দদের একচেটিয়া। সারা ইউরোপ মসলা-পাগল; কন্‌স্টান্টিনোপলের সমৃদ্ধির কারণও এই মসলার ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ে সারা ইউরোপকে শোষণ করে ইটালির ঐশ্বর্যভাণ্ডার পূর্ণ; তাই নবজাগরণের অভ্যুদয়ও হল এ দেশেই।

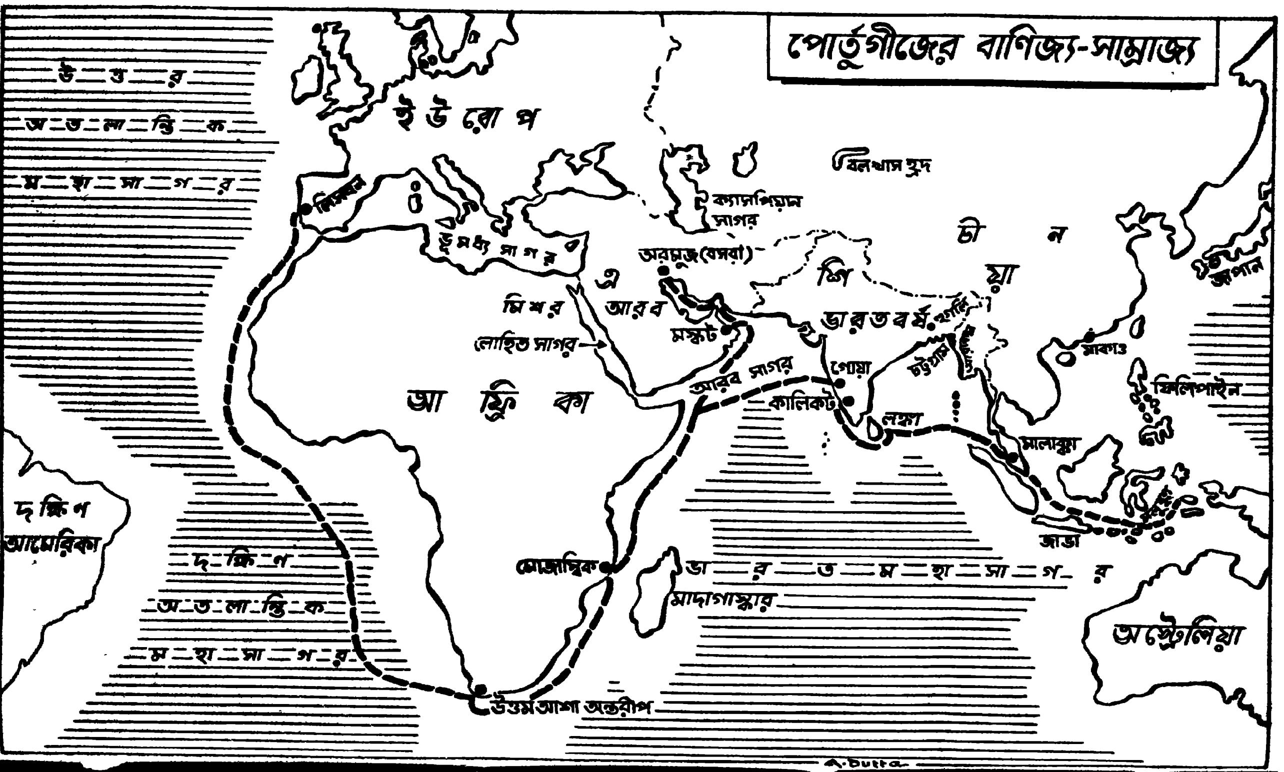
স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, জার্মানী, রাশিয়া—অর্থাৎ সারা ইউরোপই ইটালির খদ্দের। চড়া দরে মসলা কিনে কিনে এরা সবাই ছিল রুষ্ট। এবার

কন্‌স্টান্টিনোপল তুর্কীর হাতে চলে যাওয়ায় ইটালির বাজারের প্রতি ভরসা সবারই কমে গেল। আলেক্‌জান্দ্রিয়া হয়ে যেটুকু মাল আসত তার পরিমাণ যত কম, মহার্ঘতা তত বেশি। অথচ, মসলা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। জীবনধারণের জন্য মসলা অপরিহার্য বস্তু। কাজেই ইউরোপের সর্বদেশেরই ব্যবসায়ীর দল ও জনসাধারণ চিন্তিত হয়ে উঠল।

যে কয়টি দেশের কথা পূর্বে বলা হল তাদের মধ্যে পোর্তুগালই আকারে সবচেয়ে ছোট। কিন্তু ছোট হলে কি হবে, সেকালে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় পাঁচ শ বছর আগে, সে দেশে যুদ্ধবিগ্রহের হাঙ্গামা বেশি ছিল না। অন্যান্য দেশের ভাগ্য তখন এত সুপ্রসন্ন নয়; অনেক ক্ষেত্রেই তাদের আভ্যন্তরিণ অবস্থা ছিল নানা সমস্যা-জটিল; কোন কোন দেশ খণ্ডযুদ্ধেও ছিল বিব্রত। অ্যাট্‌লান্টিক সাগরের তীরে পোর্তুগাল; ভূমধ্যসাগর থেকে জিব্রাল্‌টার প্রণালী পার হলেই তার বিরাট বন্দর লিসবন।

লিসবন বন্দরে সেকালে ইউরোপের নানা দেশের চার-পাঁচ শ জাহাজ সর্বদা নোঙর করে থাকত। এখান থেকে চালান যেত চামড়া, শুষ্ক ফল, খাদ্যতেল, কর্ক ও মদ। পোর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা মোটামুটিঅর্থবান; নাবিকেরা দুর্ধর্ষ, বিশেষ করে নৌবাহ-বিদ্যায় বিশারদ। পোর্তুগালের রাজা বাণিজ্য ব্যাপারে উৎসাহী। রাজন্য হেনরি বিখ্যাত নৌবাহ-তত্ত্ববিদ্‌; তিনি ঘুরে ঘুরে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের নিখুঁত মানচিত্রও তৈরি করে ফেলেছিলেন। এ মানচিত্র সম্বল করে রাজকীয় সহায়তায় বার্থেলমিয়োডিয়াজ নামে একজন উৎসাহী পোর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের শেষ তটরেখা 'উত্তম+আশা' অন্তরীপ পর্যন্ত ঘুরেও এসেছিলেন, সম্ভবত ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর ফলে পোর্তুগালের নাবিকেরা ছিল অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরে জাহাজ চালনায় ইউরোপের মধ্যে সেকালে সর্বাপেক্ষা তৎপর। আর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানও ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। এমনকি কাছেপিঠের দু-চারটিতে তো তারা হামেশাই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেত।

নাবিকদের এই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি কাজে


পোর্তুগীজের বাণিজ্য-সাম্রাজ্য
উত্তর অতলান্তিক মহাসাগর
ইউরোপ
লিসবন
ভূমধ্য সাগর
ক্যাসপিয়ান সাগর
বলখাস হ্রদ
চীন
এশিয়া
জাপান
আরব
মিশর
লোহিত সাগর
অরমুজ (বসরা)
মস্কট
ভারতবর্ষ
চট্টগ্রাম
গোয়া
কালিকট
লঙ্কা
আরব সাগর
মাকাও
ফিলিপাইন
মালাক্কা
জাভা
আফ্রিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
দক্ষিণ অতলান্তিক মহাসাগর
মোজাম্বিক
মাদাগাস্কার
ভারত মহাসাগর
উত্তমআশা অন্তরীপ
অস্ট্রেলিয়া

লাগালেন পোর্তুগালের সেকালের রাজা ম্যানোয়েল। এ কার্যে তাঁর প্রধান সহায় হল দেশেরই একজন দুর্দান্ত ও দক্ষ নাবিক ; নাম তার ভাস্কো-ডা-গামা।

ইটালির, বিশেষ করে ভেনিস বন্দরের, পরম ঐশ্বর্যের কারণ যে পূর্বাঞ্চলের মসলা, একথা কারো অজ্ঞাত ছিল না। 'উত্তম+আশা' অন্তরীপ পার হয়ে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিলেই যে হিন্দুস্থানের মসলার বাজারের সন্ধান পাওয়া যাবে এ খবরও রাজা ম্যানোয়েল নানা সূত্রে আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর পাশের রাজ্য স্পেনের রাজা ও রানীর সহায়তায়, জেনোয়ার নাবিক কলম্বাসের নেতৃত্বে মাত্র বছর কয়েক আগেই ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে নূতন দেশ আমেরিকা। তার ফলে স্পেনের বরাত ফিরে গেছে, এ খবর ছিল রাজা ম্যানোয়েলের নখদর্পণে।

তাই রাজা ম্যানোয়েল হিন্দুস্থানের মসলার বাজারের সন্ধানে একজন দক্ষ লোক পাঠাবার জন্য পরম উৎসাহ বোধ করলেন। তাঁর মনে হল, যদি সত্যি সে বাজারের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে হয়ত অর্থাগমের সঙ্গে কিছু পুণ্যকর্মও হতে পারবে। পোর্তুগাল রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান রাজ্য ; তিনি নিজে গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। হিন্দুস্থানে নিশ্চয়ই আমেরিকা, আফ্রিকার মতই নানা সত্যধর্মহীন লোকের বাস। খ্রীষ্টধর্ম-নেতা পোপের আশীর্বাদে কি সেখানে এই সত্যধর্ম প্রচার করা যাবে না? হয়ত এ সূত্রে হিন্দুস্থানে পোর্তুগীজদের যে উপনিবেশ স্থাপিত হবে তা হবে বিশ্বে অদ্বিতীয়। তারপর হিন্দুস্থানের পরম ঐশ্বর্যের কথা তো বিশ্ববিশ্রুত ; ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হলে তার কিছু অংশ থেকে কি পোর্তুগাল বঞ্চিত হবে?

আরও একটা কথা। হিন্দুস্থানের বাজারে মসলার ব্যবসাটা নাকি সবই মুরদের অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে। মুরদের সঙ্গে স্পেন ও পোর্তুগালের চিরবিরোধ। তাই, মসলার বাজার হাতে করতে পারলে মুরদের গর্বও কিছু খর্ব হবে।

গামার তদারকে ও রাজার অর্থে তাই অচিরেই চারখানা জাহাজ তৈরি হল। 'সেণ্ট গ্যাব্রিয়েল', 'সেণ্ট র‍্যাফাল', 'বেরিয়ো' এ তিনখানা হল যাত্রি-জাহাজ। প্রথম দুখানায় মাল বোঝাই হতে পারে প্রায়

দু শ টন করে, তৃতীয় খানায় একশ টন। চতুর্থখানা অভিযাত্রিদলের ভাণ্ডারগৃহ—এতে প্রায় চার শ টন মাল ধরতে পারে।

দলবল নিয়ে রাজা ম্যানোয়েলের আশীর্বাদ শিরোধার্য করে গামা পোর্তুগাল থেকে রওনা হলেন ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, আর হিন্দুস্থানের কালিকট বন্দরে এসে নোঙর করলেন ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে—অর্থাৎ প্রায় এগারো মাস পরে। পথে বিশেষ কোনো বিপদ-আপদ ঘটল না।

এই এগারো মাসের কাহিনী মাত্র এক লাইনে শেষ করে দেয়া হল, কিন্তু গামার সে সমুদ্রযাত্রার চিত্র মানসপটে স্পষ্ট অঙ্কিত না করলে তাঁর কৃতিত্বের কথা বোঝা যাবে না। এর আগে পোর্তুগীজ ম্যাজিলনের অভিযানের কথা বলা হয়েছে। সে অভিযান থেকে ম্যাজিলন অবশ্য আর ফিরে আসতে পারেন নি; তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের প্রায় আড়াই শ-র মধ্যে মাত্র আঠারোজন প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল। কাজেই প্রাণের ভয় থাকতে কেউ আর এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় বের হতে পারত না। পালের জাহাজ; হাওয়াই এর মুখ্য ভরসা—টেনে কখন কোন্ দিকে নিয়ে যাবে কে জানে? জাহাজ না খোলামকুচি; অন্তহীন সাগরের বুকে পদ্মপত্রে নীরেব মত টলমল করছে। কখন নিঃশব্দে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার স্থিরতা নেই। খাদ্যের অভাব, পানীয় জলের অভাব, সমুদ্রে ও বন্দরে রাহাজানি, নানা প্রকার রোগ—কোন্‌টি কম? নাবিকেরা সবাই সৈন্য; তাদের সবারই লৌহবর্ম রয়েছে, রয়েছে তলোয়ার, বন্দুক ও বর্শা। জাহাজগুলির গতি সমান নয়; পালের জাহাজের গতি-নিয়ন্ত্রণ চলে না। যিনি নেতা তাঁর জাহাজের গতি বেশি। তিনি প্রতিদিনই সন্ধ্যায় অন্য জাহাজের জন্য কোথাও-না-কোথাও অপেক্ষা করেন। তাঁকে অনেক কথা চিন্তা করতে হয়; মাঝে মাঝে লোভের বশে বা অভাবের তাড়নায় নাবিক-যোদ্ধাদের মধ্যে প্রবল বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে বিদ্রোহের আগুনে হয়ত সমস্ত অভিযানই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এই দুরন্তপনার প্রেরণাকে শুধু লোভের আখ্যা দিলে তাকে নিতান্ত খর্ব করা হয়। মানুষের মধ্যে অজ্ঞাত রহস্য সন্ধানের যে

তীব্র আকাঙ্ক্ষা বর্তমান, যার সুষ্ঠ প্রকাশ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মধ্যে, অভিযাত্রীদের প্রেরণাও তারই সহোদর। সে আবেগ, তন্ময়তা ও উন্মাদনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন না জানালে মনুষ্যত্বের প্রকৃত সম্মান করা হয় না।

ইতিহাসের পাতায় গামাই আমাদের দেশের প্রথম নাবিক-অতিথি। তারপর এসেছে অনেকে; ওলন্দাজ, ইংরেজ, দিনেমার, ফরাসী, সুইডিস, প্রভৃতি। সূক্ষ্ম বিচারে তাদের মুখ্য বৃত্তি মোটামুটি ডেনমার্কের বিশ্ববিখ্যাত ভাইকিংদের জীবিকার্জনের মতই জলদস্যুতা; গৌণবৃত্তি বাণিজ্য। কিন্তু তাদের তিতিক্ষা বীর্যবত্তা ও সাহসের পরিমাপ হয় না। বসুন্ধরা যে বীরভোগ্যা একথা তারাই প্রমাণ করেছে; সারা পূর্বাঞ্চলে সে মহামূল্য বাণী কোনো সাড়া জাগাতে পারে নি।

এবার গামা ও কালিকটের কথায় ফিরে আসা যাক।

বন্দর হিসাবে কালিকটের নামডাক ছিল যথেষ্ট। অন্যান্য জিনিসের সাথে এখান থেকে গোলমরিচ, আদা আর 'ক্যালিকো' অর্থাৎ কালিকটের কার্পাস বস্ত্র নানা দেশে চালান যেত। পূর্বেই বলা হয়েছে, সমগ্র মালাবার প্রদেশটি ছিল মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে। বলা বাহুল্য, কালিকটের চালানী কারবার করত মুরেরাই। মুর বণিকের দল পণ্যব্যবসার সঙ্গে ধর্মব্যবসায়ও শুরু করেছিল। তাদের জাহাজ হিন্দুস্থান থেকে 'হজ'-যাত্রী নিয়ে আরব দেশের মক্কা যাতায়াত করত। মক্কা মুসলমানদের প্রধান তীর্থ; আর হিন্দুস্থানে তখন মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত; কাজেই সুরাট, কালিকট, ব্রোচ প্রভৃতি কোনো বন্দরেই 'হজ'-যাত্রীর অভাব ছিল না।

কালিকট বন্দরের পরিধি তখন ছিল আট মাইল। হিন্দু রাজার রাজত্ব। রাজা নায়ার শ্রেণীর; তাঁর পদবী 'জামোরিন'। সমগ্র মালাবার প্রদেশের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রবলতম; জনকয়েক সামন্তরাজ তাঁর তাঁবেদারি করত। কোচিনের রাজা ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম।

কালিকটের বাসিন্দাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি। মুসলমানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু মুসলমানেরা সবাই বিদেশী; বাণিজ্যে

লক্ষ্মীলাভের আশায় তারা বহুদূর দেশ থেকে এখানে এসে বসবাস করছে। কেউ এসেছে পারশ্যের অরমুজ থেকে, কেউ এসেছে মিশর থেকে, কেউ আফ্রিকার এবিসানিয়া এমনকি টিউনিস থেকেও। এরা হিন্দু রাজাকে যথোচিত কর দিত, তাঁর নৌসেনাবাহিনীকে প্রয়োজন-মত সাহায্য করত, আর নির্বিরোধী শান্তিপ্রিয় বিদেশীদের মত দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকত।

রাজাও তাদের ধর্মকর্মে বাধা দিতেন না। এক কালিকট বন্দরেই তারা দুটো মসজিদ তৈরি করেছিল। তারপর জনসাধারণের কাছেও তাদের বহু সম্মান ছিল, কারণ সবাই জানত যে বহির্বাণিজ্যের সমস্ত দায়িত্বই এদের হাতে। আর সে বাণিজ্যে দেশের বিত্তলাভ হয় প্রচুর।

এর পূর্বে এই চালানী কারবারে একাধিপত্য ছিল হিন্দু চেট্টিদের। সংঘবদ্ধভাবে এরা আরব, মিশর, দূর প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জ এমনকি চীনে গিয়েও বাণিজ্য করত। কিন্তু নানা কারণে মুর অর্থাৎ মুসলমান বণিকেরাই ক্রমে প্রাধান্য লাভ করে, এখন থেকে প্রায় এগার শ বছর আগে মালাবারের সমস্ত ব্যবসাই দখল করে বসে।

মুসলমান ছাড়া একদল খ্রীষ্টানও মালাবারের নানা স্থানে বাস করত। এরাও ছিল বিদেশী ; পূর্বে সিরিয়া, বাগদাদ ও পারশ্য উপ-সাগরের কোলে নানা প্রদেশে এদের বসবাস ছিল। হিন্দু রাজা এদের প্রতিও সদয় ব্যবহার করতেন। সংখ্যায় নগণ্য হলেও ইহুদীদের একটা দল ছিল মালাবারে। এরা রোমান রাজত্বের শুরুতেই অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে নিজেদের দেশ প্যালেষ্টাইন থেকে অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে এসেছিল। বাণিজ্যই ছিল এদের পেশা। হিন্দুরাজা এই শরণাগতদেরও প্রতিপালন করতেন।

কাজেই, কালিকটের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল মোটামুটি আন্তর্জাতিক। তাই, গামা এসে যখন কালিকটের বন্দরে নোঙর করলেন তখন তাঁকে বা তাঁর নৌবহর দেখে কালিকটের বাসিন্দারা আশ্চর্য হল না।

গামা জামোরিনকে এত্তেলা পাঠিয়ে, পোর্তুগালের রাজার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর উপঢৌকন নিয়ে, রাজদরবারে হাজির হলেন।

সে উপঢৌকনের মধ্যে ছিল ডোরা-কাটা সুতীর কাপড়, সিন্দুরবর্ণ শিরস্ত্রাণ, টুপি, প্রবালের মালা, কিছু চিনি, খাদ্যতেল ও মধু। উপঢৌকনে স্বর্ণই যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, হয় একথা তাঁর জানা ছিল না, নয় তাঁর কাছে সে ধাতুটির ছিল একান্ত অভাব।

যাই হোক, জামোরিন সে উপঢৌকন গ্রহণ করে গামাকে কৃতার্থ করলেন।

কালিকটে বাণিজ্য করবার অধিকার পেয়ে গামা সে বন্দরের আশপাশে ঘুরে বেড়ালেন প্রায় মাস-তিনেক ; তারপর লটবহর গুটিয়ে আগষ্ট মাসে ফিরে চললেন দেশে।

গামার দৌত্যকার্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথম, পূর্বাঞ্চলের মসলার বাজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কস্থাপন। দ্বিতীয়, নূতন দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা অর্থাৎ পোর্তুগালের রাজার অধীনে খ্রীষ্টান রাজ্যের প্রসার।

কালিকটে পৌঁছে তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। দ্বিতীয় ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। সে আশার মূল অবশ্য তাঁর এদেশবাসীদের ধর্মসম্পর্কে অগভীর জ্ঞান। মালাবারে প্রায় মাসতিনেক বাস করেও তিনি বুঝতে পারেন নি যে হিন্দু বলে একটা বিধর্মী জাতি এদেশে বাস করে। মুর বা মুসলমানকে তিনি ভালোভাবেই জানতেন। কিন্তু হিন্দু—সে আবার কি ? তাঁর ধারণা হয়েছিল হিন্দুধর্মটাও খ্রীষ্টানদের রোমান ক্যাথলিক পন্থারই রকমফের। হিন্দুর কালীমূর্তিকে তিনি যিশুমাতা মেরীর ভারতীয় রূপ বলে ধরে নিয়ে নিজেই কালীমন্দিরে উপাসনা করলেন। মতান্তরে, মন্দিরে দেবকীর ক্রোড়ে কৃষ্ণমূর্তি দেখে তাঁকে যিশুমাতা মেরীর ক্রোড়ে যিশুমূর্তি বলে বিভ্রান্ত হলেন। তা কালীই হোন বা দেবকীই হোন, গামা যে মেরী ভেবে তাঁকে পূজা করলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পূজার নিয়মকানুন ও আচারগত প্রভেদ দেখেও তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হল না যে এদেশের সঙ্গে তাঁর নিজের দেশের ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তিনি দেশে ফিরে গিয়ে বললেন যে জনকয়েক দক্ষ ও নিষ্ঠাবান পাদরী পাঠিয়ে দিলেই হিন্দুস্থানের বিকৃত রোমান ক্যাথলিক পন্থার পুনঃ সংস্কার সহজেই হতে পারবে।

এমন সুখবর পেয়ে পোর্তুগালের রাজা ম্যানোয়েল প্রতিবেশী স্পেনের রাজাকে জানালেন যে কালিকটের হিন্দুরা মূলত রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানই বটে, তবে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি তারা জানে না অথবা কালক্রমে বিস্মৃত হয়েছে।

বলা বাহুল্য দেশে গামাকে অভিনন্দন দেওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। রাজা নিজে তাঁকে যথেষ্ট নগদ পুরস্কার তো দিলেনই, আবার মহামান্য 'ডম্' উপাধিতেও ভূষিত করলেন। এ উপাধি দেওয়া হত সাধারণত রাজার বংশধরদের আর বহুসম্মানিত ধর্মযাজকদের। কালক্রমে গামা পোর্তুগালের বিশিষ্ট ধনপতিদের অন্যতম বলে গণ্য হলেন।

মসলার বাজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ যে কত বড় শুভঙ্কর আবিষ্কার তা প্রমাণ হল হাতে হাতে। যে সামান্য মসলা সঙ্গে নিয়ে গামা ফিরে গেলেন তাতে লাভ হল টাকায় ষাট টাকা!

এ খবর পেয়ে ইস্তাম্বুল, ভেনিস ও আলেক্জান্দ্রিয়ার ব্যবসায়ীর দল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ইস্তাম্বুলের তুর্কী সুলতানও মনে মনে প্রমাদ গণলেন। রাজকোষে পূর্বাঞ্চলের, বিশেষ করে মসলার, অপরিমিত বাণিজ্যকর প্রাপ্তির আশা আর রইল না।

গামার মুখে সবিস্তারে হিন্দুস্থানের কথা জেনে এবার রাজা পাঠালেন প্রায় পনের শ নাবিকসৈন্য বোঝাই তেত্রিশখানা জাহাজ। এদের নেতা ক্যাব্রাল্ কালিকটে এসে একেবারে রুদ্রমূর্তিতে দেখা দিলেন। এর কারণ ছিল।

গামা প্রথমবার কালিকটে এসে বুঝতে পেরেছিলেন যে মুরেরা অনেক আগেই এদেশে আসর জমিয়ে বসেছে। জলপথে হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে আরব ও পারস্যের মধ্য দিয়ে নানা দেশের বাণিজ্যটি বড় জমজমাট। মুরকে ঘায়েল করতে না পারলে এ বাণিজ্যের কিছুমাত্র অংশও অধিকার করা যাবে না। তারপর পোর্তুগাল তো এর অংশ মাত্র চায় না, চায় সমগ্রটাই। তাই মুরদের দলন করে একেবারে বিধ্বস্ত করাই ছিল ক্যাব্রালের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যের প্রেরণা নিহিত ছিল পোর্তুগালের রাজনীতির মধ্যেই। রাজা ম্যানোয়েল্ ও গামার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে সমগ্র হিন্দুস্থান ক্রমে ক্রমে করায়ত্ত করা ও সে দেশে রোমান ক্যাথলিক

পন্থার পুনঃ সংস্কার করা সহজসাধ্য ব্যাপার। শুধু কিছু বাধা সৃষ্টি করতে পারে মুরেরা।

ন্যায় বা অন্যায় যে কাজই লোকে করুক না কেন তার জন্য প্রত্যেকেই একটা যুক্তি খুঁজে নেয়। নিতান্ত অসংগত কাজের মূলেও একটা যুক্তি থাকে, তা যতই মনগড়া হোক না কেন। তাই হিন্দুস্থানের উপকূলে মুর-দলনের যুক্তিরও অসদ্ভাব হল না।

রাজা ম্যানোয়েল প্রচার করলেন যে, একথা অবশ্য পোর্তুগীজেরা মেনে নিয়েছে যে ইউরোপের মধ্যে সমুদ্রে অবাধে চলাফেরা করবার অধিকার ইউরোপের সমস্ত জাতিরই রয়েছে, কিন্তু ইউরোপের বাইরে সমুদ্রের রাজা পোর্তুগালই। সেখানে সে দেশের অনুমতি না নিয়ে যারা যাতায়াত করবে তাদের মাল বাজেয়াপ্ত করবার অধিকার রয়েছে পোর্তুগালের।

এই বিচিত্র সূত্রানুসারে ক্যাব্রাল কালিকটে পৌঁছে যাবার আগেই আরব-যাত্রী মুরের জাহাজে লুটতরাজ শুরু করে দিলেন। ফলে কালিকটের জামোরিন তাঁর উপর হলেন পরম রুষ্ট। তবু তাঁকে কালিকটে 'ফ্যাক্টরি' বা ব্যবসার আড়ত তৈরি করতে দিলেন, যদিও পরে সেটা তিনি নিজেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন ক্যাব্রালেরই • পুনঃপুনঃ অযথা মুর-উৎপীড়নের জন্য। পোর্তুগীজ মালাবারকে কেন্দ্র করেই তাদের বাণিজ্যপ্রসার ও ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করতে লাগল। ক্যাব্রালের পরে তাদের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন আল্‌বুকার্ক তারপরে আবার গামা। গামার পরে আবার আল্‌বুকার্ক।

সবারই কিন্তু লক্ষ্য হল এক—মুর-দলন ও মুর-বিতাড়ন। গামা দ্বিতীয়বার এসে তো পোর্তুগালের রাজার দোহাই দিয়ে জামোরিনের কাছে মুর-বিতাড়নের দাবীই করে বসলেন। কিন্তু জামোরিন মুরদের বন্ধুত্ব ছেড়ে কোনো ক্রমেই পোর্তুগীজের সঙ্গে হাত মিলাতে চাইলেন না। ফলে, পোর্তুগীজের সঙ্গে জামোরিনের সশস্ত্র বিবাদ শুরু হল। সে বিরোধ স্থায়ী হল শতবর্ষব্যাপী। এই বাদ-বিসম্বাদের সবিস্তার কাহিনীই মালাবারের, অর্থাৎ হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলের ষোড়শ শতকের ইতিহাস।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কোচিনের রাজা ছিলেন জামোরিনের

সামন্তরাজ। তিনি ভাবলেন, 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' অর্থাৎ পোর্তুগীজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যদি জামোরিনের তাঁবেদারি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তবে মন্দ কি? তাই তিনি তাদের সঙ্গে গলাগলি ভাব করে তাদের ব্যবসার সুব্যবস্থা করে দিতে তৎপর হলেন; এমনকি পোর্তুগালরাজের বশ্যতাও অবনতমস্তকে স্বীকার করলেন। কিন্তু এত নতিস্বীকার করেও তাঁর মতলব হাসিল হল না। পোর্তুগীজ এসে যে তাঁর কাঁধ জুড়ে বসল তাদের আর সেখান থেকে নামানো গেল না। লাভের মধ্যে কোচিনের রাজবংশ শ খানেক বছর পোর্তুগীজের তাঁবেদারি করে মরল।

এই সূত্রে কোচিন-রাজ ও জামোরিনে লাগল গৃহবিবাদ, আর সেই কলহের ছিদ্রপথে পোর্তগীজের দল হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূল জুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও লুটতরাজ করবার সুবিধা পেয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার গামা এলেন 'যুদ্ধং দেহি' বলে, কিন্তু জামোরিনের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। কোচিন বন্দরে ফ্যাক্টরি তৈরি করে তিনি দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু মুরদের উপর জুলুম জবরদস্তি, রাহাজানি ও দস্যুতা সমভাবেই চলল। এমনকি 'হজ'-যাত্রীর জাহাজ পর্যন্ত পুড়িয়ে ডুবিয়ে পোর্তুগীজ নিজেদের মনুষ্যত্বকে ভারত মহাসাগরে বিসর্জন দিল।

হিন্দুস্থানে পোর্তুগীজদের শত শত অমানুষিক ও বীভৎস অত্যাচাবের মধ্যে এটিই সর্বপ্রথম; এ কীর্তিটি বর্বর গামার-ই।

এ মর্মান্তিক ব্যাপারটি ঘটেছিল মালাবার উপকূলের সন্নিকটে। চার শ 'হজ'-যাত্রী নিয়ে একটি বড় জাহাজ কালিকট থেকে আরবের দিকে রওনা হল। যাত্রীর মধ্যে বহু স্ত্রীলোক ও শিশু। জাহাজের মালিক কালিকটের শ্রেষ্ঠী-শ্রেষ্ঠ; তিনি নিজেও ছিলেন যাত্রিদলে। মতান্তরে, জাহাজটি ছিল মিশবের সুলতানের। সে যা-ই হোক জাহাজে শুধু যাত্রীই নয় বহুমূল্য মালও ছিল, অবশ্য তার বেশির ভাগই মসলা।

দুর্ধর্ষ গামা নিজে তখন সুবিধা পেলেই মুরদের জাহাজে লুটতরাজ করে বেড়াচ্ছেন। এ জাহাজ যে পরম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার একথা বুঝতে তাঁর দেরি হল না; তিনি অবিলম্বে এটি ঘেরাও করলেন।

জাহাজে ধন প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না, বিশেষত জাহাজভর্তি ধর্মকামী বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশু নিয়ে। কাজেই পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই দেখে জাহাজের কাপ্তান সকল ঐশ্বর্যের বিনিময়ে শুধু যাত্রীদের প্রাণ ভিক্ষা করলেন।

গামা রাজী হলেন না; বললেন, আমার হাতে মুরের রক্ষা নেই, একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না। ধন, রত্ন তো লুট হবেই।

তারপর চলল পোর্তুগীজের গুলিবর্ষণ। হাতিয়ার যা ছিল তা নিয়ে মুরেরা জাহাজ রক্ষা করতে চেষ্টা করল। স্ত্রীলোকেরা তাদের মহামূল্য অলঙ্কারের অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়ে স্বামী ও পুত্রকন্যার প্রাণভিক্ষা করতে লাগল, শিশুদের করুণ ক্রন্দনধ্বনি সাগর-বাতাহত হয়ে মালাবার উপকূলে গিয়ে ধ্বনিত হতে লাগল। যুক্ত করে, উর্ধ্বমুখে সবাই আল্লার দোয়া যাচনা করতে লাগল, কিন্তু এ দৃশ্যে গামার মন ভিজল না, এ ক্রন্দনে তিনি কর্ণপাতও করলেন না।

পোর্তুগীজের আক্রমণ ও তা প্রতিহত করার চেষ্টা চলল আট দিন, আট রাত্রি। কিন্তু পরিশেষে গামার প্রলোভনে যাত্রিদলের মধ্যেই সৃষ্টি হল এক বিশ্বাসঘাতকের। ফলে, জাহাজে আগুন জ্বলে উঠতে দেরি হল না। অসহায় বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রীলোক ও শিশুর দল কেউ বা দগ্ধ কেউ বা অর্ধদগ্ধ হয়ে সলিল সমাধি লাভ করল; জাহাজের একটি প্রাণীও রক্ষা পেল না। বর্বরতার ইতিহাসে গামার কীর্তিও অক্ষয় হয়ে রইল।

আল্‌বুকার্ক এলেন কালিকট আবিষ্কারের প্রায় এগার বছর পরে। তিনিও জামোরিনের সঙ্গে পেরে উঠলেন না বটে, তবে পোর্তুগীজের ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁর কাল থেকে আরো ফুলেফেঁপে উঠল। যুদ্ধ করে গোয়া বন্দরের পত্তন করলেন তিনি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। গোয়া ছিল মুসলমান নবাবের হাতে; নিজেদের মধ্যে রেষারেষির ফলে বিজয়নগরের হিন্দু রাজা আল্‌বুকার্কের সহায় হলেন।

তারপর পোর্তুগীজেরা ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। দূর প্রাচ্যের দ্বীপ মালাক্কা ও মলুক্কায়, এমন কি চীনের মাকাও-এ ও জাপানে। এদিকে পারস্য উপসাগরের কোলে আরবের মস্কট ও পারস্যের

অরমুজ আল্‌বুকার্ক শুধু দস্যুতার দাপটেই দখল করে বসলেন। আর দখল করলেন আফ্রিকার মোজাম্বিক। ফলে, আরব, পারশ্য ও হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রায় সকল ব্যবসাই পোর্তুগীজের করায়ত্ত হল।

এ কয়টি বাণিজ্যঘাঁটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি নামডাক ছিল অরমুজের। অরমুজ বা হরমুজ পারশ্যের প্রধান বন্দর—ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রীস নদী মিলিত হয়ে যেখানে পারশ্য উপসাগরে পড়েছে তারই মোহনায়। পারশ্যে প্রবাদ রয়েছে যে, যদি সমস্ত পৃথিবীটিকে একটি অঙ্গুরীয়কের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে অরমুজ সে অঙ্গুরীয়কের মধ্যমণি। অরমুজ বা হরমুজের আধুনিক নাম বাসোরা বা বসরা। বাসোরার গোলাপের রূপ ও গন্ধ কবিপ্রসিদ্ধি-বিজড়িত, তবে এর বাণিজ্যের সওগাত গোলাপজল।

এর পরে আল্‌বুকার্ক নজর দিলেন লংকাদ্বীপের দিকে। লংকায় দারুচিনির আস্তানা; দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোল জুড়ে দারুচিনির নিবিড় বন। কাণ্ডির রাজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আল্‌বুকার্ক ঘাঁটি করলেন কলম্বো, নেগম্বো ও গ্যালেতে আর, ক্রমে লংকাদ্বীপের প্রধান পণ্য দারুচিনির সর্বগ্রাহক হয়ে উঠলেন। সমগ্র পূর্বাঞ্চলের মধ্যে পোর্তুগীজের সর্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠল এটি।

আল্‌বুকার্কের বাণিজ্য-সাম্রাজ্যকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা চলে। আফ্রিকার মোজাম্বিক, আরবের মস্কট, পারশ্যের অরমুজ, লংকাদ্বীপ ও দূরপ্রাচ্যের মালাক্কা ও মলুক্কা দ্বীপ। হিন্দুস্থানের গোয়া বন্দর থেকে এ কয়টি ঘাঁটিরই তদারক করা হত; অর্থাৎ গোয়া ছিল পোর্তুগীজ বাণিজ্য-সাম্রাজ্যের রাজধানী।

আমেরিকা আবিষ্কার করে স্পেন যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, প্রাচ্যের মসলার বাজার আবিষ্কার করে পোর্তুগাল তার চেয়ে কম ঐশ্বর্য লাভ করল না; বোধহয় বেশিই। পরম উৎফুল্ল হয়ে রাজা ম্যানোয়েল তাঁর নিজের নামের পেছনে একটা বিরাট পদবী জুড়ে দিয়ে সবিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। সে পদবী—ইথিয়োপিয়া (আফ্রিকা), আরব, পারশ্য ও হিন্দুস্থানের নৌবাহ, বাণিজ্যবিজয়ী অধিরাজ; অর্থাৎ প্রায় অর্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর!

আল্‌বুকার্কের কথা শেষ করবার আগে আবার গামার কথা একটু বলা যাক।

জামোরিনের সঙ্গে পোর্তুগীজ যখন কিছুতেই পেরে উঠছিল না, তখন গামা আবার এ দেশে এলেন তৃতীয় বার। এবার এসে স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন যে জলপথে পোর্তুগীজের পক্ষে জামোরিনকে বিপর্যস্ত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। এর প্রধান কারণ, জামোরিনের জাহাজগুলি পোর্তুগীজের জাহাজের চেয়ে অনেক হালকা, আর সেগুলি চলেও দ্রুততর। অবশ্য পোর্তুগীজের বন্দুকের সংখ্যা বেশি, আর সেগুলি কার্যক্ষমতায় হিন্দুস্থানের বন্দুকের চেয়ে দড়। তবুও জলপথে তাদের মূল্য কম।

গামা সবই বুঝলেন বটে, কিন্তু সমস্যাটার কোন সমাধান করবার পূর্বেই তাঁর অন্তিম ডাক এসে গেল। কোচিনে তিনি দেহরক্ষা করলেন ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর। তাঁকে সেখানেই কবর দেওয়া হল; অবশ্য প্রায় চৌদ্দ বছর পরে তাঁর দেহাবশিষ্ট নিয়ে যাওয়া হল পোর্তুগালে। সেখানে যে বিরাট গির্জার পাশে তা সমাহিত করা হল সেটিও তৈরি হয়েছিল এই হিন্দুস্থানের বাণিজ্যের অর্থেই।

এখন আবার আল্‌বুকার্কের কথায় ফিরে আসা যাক।

পোর্তুগীজেরা হিন্দুস্থান সম্পর্কে যে দুটি কথা বিশেষ করে বুঝেছিল তা এই যে, এ দেশে ছোটখাটো রাজা-রাজড়াদের মধ্যে দলাদলি ও রেষারেষির অন্ত নেই। তাই, একজনের কাঁধে চেপে অন্যজনের বাড়ি চড়াও করা সহজসাধ্য। তারপর এ দেশে সিপাহী গড়বার মত মানুষের অভাব নেই। বিদেশী কারিগরের হাতে পড়লে এ দেশের কাঁচা মালে যে মূর্তি তৈরি হয় তার জুড়ি মেলা ভার। সে মূর্তির শক্তি থাকে অশেষ, কিন্তু মগজ থাকে কমজোর। কাজেই হুকুম তামিল করতে গিয়ে সে নিজের মাতৃহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। উপরন্তু দেশের প্রতি দরদ তার এতই শিথিল যে অর্থের লোভে দেশকে বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়া তো তার পক্ষে নিতান্তই সহজ ব্যাপার।

পোর্তুগীজদের এই বহুকালের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানটুকু তাদের

কাছ থেকে ধার করেছিল ইংরেজ ও ফরাসী। শুধু ধার করা নয়, এই অমূল্য অভিজ্ঞতাকে তারা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিল। তারা দেশের দাঁত ভেঙ্গেছিল দেশেরই শিলনোড়ার আঘাতে; নইলে, সহস্র সহস্র মাইল দূর থেকে জন কয়েক প্রাণী, তা তারা যতই জবরদস্ত হোক না কেন, কয়েকটা ভড়ে ভেসে এসে দেশটার কি এমন-একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে?

এই অভিজ্ঞতার ফলেই আল্‌বুকার্ক কোচিন রাজের সহায়তায় দেশী পদাতিক সৈন্যদলের সৃষ্টি করলেন।

পোর্তুগীজেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লুটতরাজ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করত মুরদের আস্তানায়। গোয়া থেকে নির্বিচারে সকল মুর উৎখাত করা হল। তারপর নিহত মুরদের বিধবা-স্ত্রী ধরে ধরে তাদের সাথে আল্‌বুকার্ক তাঁর সাদা পোর্তুগীজ সৈন্যদের বিয়ে দিতে শুরু করলেন। সাধারণভাবে হিন্দু মেয়ের সাথেও সাদা পোর্তুগীজের কিছু কিছু বিয়ে হল। আল্‌বুকার্কের ধারণা হয়েছিল যে এসব পরিণয়ের ফলে যেসব সন্তান হবে তারা পোর্তুগীজ সাম্রাজ্য ও খ্রীষ্টধর্মকে হিন্দুস্থানে কায়েম করবে। পোর্তুগালের রাজাও অবশ্য সে স্বপ্নই দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে স্বপ্ন সফল হল না।

রাজকোষ থেকে নবদম্পতিকে যথাযোগ্য যৌতুক দেবার ব্যবস্থা হত। জমি, বাড়ি ও চাষবাসের সরঞ্জাম দিয়ে তাদের হিন্দুস্থানের মাটিতে পাকাপোক্তভাবে বসাবারও চেষ্টা করা হত। কিন্তু এসবই হল ভস্মে ঘি ঢালা। এদের বংশধরেরা না হল পোর্তুগীজ, না হল হিন্দুস্থানী। তারা খ্রীষ্টান হল বটে, তবে 'জাত' দিল না; অর্থাৎ প্রাচ্যের আচার, আচরণ ও ধ্যান-ধারণা রইল তাদের মজ্জাগত।

সম্মুখ সমরে অজেয় জামোরিনকে আল্‌বুকার্ক কূটনীতিতে পরাস্ত করতেও চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। তাঁর সঙ্গে চক্রান্তের ফলে কালিকটের যুবরাজ জামোরিনকে বিষ খাইয়ে হত্যা করলেন বটে, তবু আল্‌বুকার্কের আশা সফল হল না। যুবরাজ রাজা হয়ে কিন্তু পুরাতন জামোরিনের সুরই ধরলেন। পোর্তুগীজের সঙ্গে জামোরিনের সুহৃতা আর কোনক্রমেই স্থাপিত হল না।

পোর্তুগীজের ইতিবৃত্তে আমরা এবার হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলের কথা ছেড়ে দিয়ে পূর্ব উপকূলের কাহিনীর অনুসরণ করব।

১৫৩৭ বা ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ গামার কালিকটে প্রথম পদার্পণের প্রায় চল্লিশ বছর পরে, পোর্তুগীজেরা বাংলা দেশে তাদের ঘাঁটি তৈরি করবার চেষ্টা করল। বাংলার রাজধানী তখন গৌড়ে; মসনদে বসে মামুদ শাহ্। আফ্গান-প্রধান শের শাহ্ তখন বিহারের সাসারাম থেকে ছোঁ মেরে বাংলার গদি দখল করবার চেষ্টা করছেন; মামুদ শাহ্ দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনের সাহায্যপ্রার্থী। দেশে দাঙ্গাহাঙ্গামার অন্ত নেই। এমন সময় একদল পোর্তুগীজ মামুদ শাহ্কে দাঙ্গাহাঙ্গামায় সাহায্য করে বাংলার বন্দর চট্টগ্রামে আড়ত খোলবার ফরমান আদায় করল।

এরও অনেক পরে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজদের ঘাঁটি তৈরি হল আরাকানে। তারপর আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ জমজমাট হয়ে পরে তা ছড়িয়ে পড়ল নিম্ন বাংলার সর্বত্র; বরিশালে (বাকলা), যশোহরে (চণ্ডিকা), ঢাকায় (শ্রীপুর), ময়মনসিংহে (কত্রাবু) ও নোয়াখালিতে (ভুলুয়া)।

সেকালে বাংলায় ছিল বারোটি পরগনা; পরগনার ভূস্বামীদের বলা হত ভুঁইয়া। বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত বারো ভুঁইয়া এঁরাই। এঁদের মধ্যে তিন জনের রাজধানী ছিল যথাক্রমে চণ্ডিকায় বা চণ্ডিক্যানে, শ্রীপুরে ও বাকলায়। বারো ভুঁইয়ার দল মোগলের শাসনাধীন ছিলেন বটে, তবে বোধহয় নামেমাত্র। ঐতিহাসিকেরা এঁদের মধ্যে তিনজনকে প্রায় স্বাধীন বলেই উল্লেখ করেছেন; এক, ঢাকা-ময়মনসিংহের ঈশা খাঁ; দুই, বিক্রমপুরের (ঢাকা) কেদার রায়; তিন, যশোহরের প্রতাপাদিত্য।

বারো ভুঁইয়ার দলে বঙ্গজ কায়স্থ প্রতাপাদিত্য ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী। বাংলায় দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে এঁর নামোচ্চারণ করা হয়। বেভারিজের মতে চণ্ডিকা বা চণ্ডিক্যান-ই ছিল প্রতাপাদিত্যের রাজধানী। এর পরবর্তী নাম হয়েছিল ধূমঘাট— বর্তমান কালিগঞ্জের কাছাকাছি।

প্রবাদ এরূপ যে, প্রতাপাদিত্যের এই বীর্য ও ঐশ্বর্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত চণ্ডিকা বা যশোরেশ্বরী কালীর প্রসাদেই ঘটেছিল। দেবী প্রসন্না হয়ে বলেছিলেন 'আমাকে না তাড়ালে আর তোকে ছেড়ে যাব না।'

ফলে, প্রতাপাদিত্যের ঔদ্ধত্য এত বেড়ে গেল যে, তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার আর সীমা রইল না। একদিন রাজপ্রাসাদে এক ঝাড়ুদারনী তাঁর সাক্ষাতেই অঙ্গন ঝাঁট দিল। এতে হল তাঁর পরম অপমান বোধ; ক্রোধে বিচারের নামে তিনি তার স্তনচ্ছেদের আদেশ দিলেন। দেবী যশোরেশ্বরী তাঁর কন্যার রূপ ধরে এসে বিচারসভায় উপস্থিত হলেন। দুহিতার শালীনতার অভাব দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে দূর হয়ে যেতে বললেন। দেবীও প্রতিজ্ঞামুক্ত হয়ে চিরতরে অন্তর্হিত হলেন।

জনশ্রুতি যাই হোক, প্রতাপাদিত্য যে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন তা সত্য। ফলে, আকবর এ বিদ্রোহ দমন করতে অম্বরাধিপতি মানসিংহকে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় পাঠান। মানসিংহ এদেশে ছিলেন পনেরো বছর—১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করে জাগ্রত দেবী যশোরেশ্বরীকে রাজস্থানে নিয়ে যান। এ কালীমূর্তি আজও জয়পুরের অম্বরপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন; তাঁর পূজক হিসাবে সঙ্গে তখন যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এসেছিলেন, তাঁর বংশধরেরাই এখনো সে দেবীর পূজা করেন।

প্রতাপাদিত্য পোর্তুগীজ জেস্যুয়িট পাদরীদের তাঁর রাজ্যে গির্জা স্থাপন করতে অনুমতি দেন; বাংলার প্রথম রোমান ক্যাথলিক গির্জা স্থাপিত হয় চণ্ডিক্যানে, বোধহয় ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে। পরে অবশ্য পোর্তুগীজেরা এখান থেকে বিতাড়িত হয়।

পূর্ব বাংলায় যে পোর্তুগীজ দস্যুসর্দার অতিশয় কুখ্যাত হয়ে রয়েছে তার নাম সেবস্টিয়াও গঞ্জালেস।

গঞ্জালেসের বাড়ি পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন বন্দর থেকে বেশি দূরে নয়। দরিদ্র ঘরের ছেলে। সাধারণ মাঝি-মাল্লা হয়েই সে আসে হিন্দুস্থানে। এসেই সোজা চলে যায় চট্টগ্রামে। কিছুদিন

পোর্তুগীজের দলে লাঠিয়ালি করে পরে নিজেই সে নুনের ব্যবসা ফেঁদে বসে। তার সম্বল ছিল একখানি মাঝারি গোছের জেলে-ডিঙি। তার মধ্যে নুন বোঝাই করে চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের ডিয়াঙ্গায় মাল বিক্রি করে গঞ্জালেস বেশ দুপয়সা উপার্জন করছিল। কিন্তু বাদ সাধল মুরেরা। তারা এ বাজারে এসে পোর্তুগীজদের পেছনে লাগল। গঞ্জালেস খানকয়েক ডিঙি নিয়ে পালিয়ে এসে অর্থোপার্জনের সহজ পন্থায়, অর্থাৎ দস্যুতায়, মন দিল। ভাগ্য এবার সুপ্রসন্ন; অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একদল দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার হিসাবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল আরাকানে ও বাংলায়।

পোর্তুগীজেরা ব্যবসার চেয়ে খুনখারাপি, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও লুটতরাজটা বেশি বুঝত। তারপর এদেশেও সেকালে ডাকাতিকে পেশা বলে গ্রহণ করবার লোকের অভাব ছিল না। ফলে, কিছু-দিনের মধ্যেই গঞ্জালেসের দল বেশ ভারি হয়ে পড়ল। হাজারখানেক পোর্তুগীজ, হাজার-দুই দেশী পদাতিক আর শ-দুই অশ্বারোহী ডাকাতের সর্দার হয়ে ও নিম্ন বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর চট্টগ্রামের কোলঘেঁষা দ্বীপ সন্দীপে ঘাঁটি তৈরি করে, গঞ্জালেস আরাকান ও বাংলার নানা স্থানে ও জলপথে অমানুষিক অত্যাচার করে অরাজকতার সৃষ্টি করল।

আরাকানের জাতি বিশেষকে বলা হয় মগ। পোর্তুগীজকে বলা হত ফিরিঙ্গি। গঞ্জালেস এ দু দলেরই সর্দার।

মগ ও ফিরিঙ্গি আরাকান থেকে নিম্ন বাংলায় অনবরত লুটতরাজ করত। কি হিন্দু কি মুসলমান যাদেরই তারা সামনে'পেত সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে, তাদের হাতের পাতা ছেঁদা করে পাতলা বেতের সুতা দিয়ে গেঁথে, জাহাজের নীচের তলায় পশুপাখীর মত ফেলে রেখে দিত। তারপর দক্ষিণ ভারতের বন্দরে বন্দরে এদের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের কাছে বিক্রি করত; এরা সবাই ছিল এদের ভাল খদ্দের। বাংলার তমলুক ও উড়িষ্যার বালাসোরেও সেকালে মানুষ কেনা-বেচা হত ওই সব বিদেশী বণিকের কাছে। মানুষ নিয়ে ব্যবসা করত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফিরিঙ্গিরাই; মগেরা লোক ধরে নিয়ে গিয়ে সাধারণত খেতের কাজে লাগাত।

এদের দৌরাত্ম্যে বাংলাদেশ, বিশেষ করে পূর্ব ও নিম্ন বাংলা, বসবাসের একান্ত অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তাই দিল্লীর বাদশা এই মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের শায়েস্তা করবার ভার দিয়েছিলেন বাংলার শাসক শায়েস্তা খাঁর উপর। সে অন্যকথা।

বাংলার প্রবাদ বাক্য 'মগের মুল্লুক' এদের লক্ষ্য করেই, আর ফিরিঙ্গি কথাটার উদ্ভবই হল পোর্তুগীজ ভাষার *Francez* শব্দ থেকে। এরপরে অবশ্য ইউরোপীয় সব জাতিকেই ওই নামে ডাকা হত—বিশেষ করে বর্ণসংকর ইউরেশীয়কে। ফিরিঙ্গি কথাটার মধ্যে যে কতখানি বিষাক্ত জ্বালা ও ঘৃণা লুকিয়ে আছে তা অনুভব করলেই বোঝা যাবে পোর্তুগীজের স্মৃতি এদেশে কতখানি মর্মদাহী।

পোর্তুগীজের কোনো কোনো দল পশ্চিম বাংলার হুগলি প্রভৃতি বন্দরে কাপড়ের ব্যবসা করত। ঐতিহাসিক ক্যাম্পোস বলেছেন, এখান থেকে কাপড় কিনে নিয়ে তারা বিক্রি করত কালিকটের বাজারে যা দেশের বাইরে যেত 'ক্যালিকো' নাম নিয়ে। এতে চার গুণ লাভ হত। এদের কেউ কেউ এদেশে পাকাপাকিভাবে বাস করতে শুরু করেছিল। পরিব্রাজক বার্নিয়ার বলেছেন যে অনেক পোর্তুগীজ বাঙালীর সঙ্গে জুটে নানারূপ মিষ্টান্ন তৈরির কারবার করত; তারা ছিল এ ব্যাপারে দক্ষ।

বাংলার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ে পোর্তুগীজের কি কি দান তার সম্যক ইতিহাস আবিষ্কৃত হয় নি। তবে তাদের ধর্মযাজক ফাদার সোসাকে বাংলা গদ্যের প্রবর্তক বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর বই প্রকাশিত হয় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। আর, বাংলার প্রথম অভিধান ও ব্যাকরণও প্রণয়ন করেন পোর্তুগীজ পণ্ডিত রোজারিও; অবশ্য তিনি পূর্ববাংলার সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের ছেলে ছিলেন বলে কথিত; পোর্তুগীজ ছেলেধরার কবলে পড়ে তাঁর এই নবসংজ্ঞা লাভ ঘটে।

প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের কালে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা যোড়শ লুইএর দরবারে জামর নামে যে কৃষ্ণকায় লোকটি ভাঁড়ামি করত তাকে কেউ কেউ সপ্তগ্রামের এক বাঙালি ব্রাহ্মণের ছেলে বলে সন্দেহ করেন। জনশ্রুতি, পোর্তুগীজেরা একে বাংলা থেকে

ধরে নিয়ে যায়। প্রামাণিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে বলে জানা যায় নি।

কবিয়াল অ্যাণ্টনীও ছিলেন পোর্তুগীজ; তিনি ছিলেন আরো অনেক কাল পরের, উনবিংশ শতকের লোক। হরু ঠাকুরের শিষ্য শ্যামবাজারের কবিয়াল ভোলা ময়রা এর সমসাময়িক। বাঙালিত্বে পুরোপুরি কায়েম হবার জন্য ইনি এক বাঙালি-বিধবার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

ঐতিহাসিকেরা বলেন মালাবারে পোর্তুগীজেরাই কেশু-বাদাম ও তামাকের চাষের বহুল প্রচলন করেছিল, আর নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরির কৌশলও তাদের কাছেই শেখা। এজন্য তাদের সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য।

এই পোর্তুগীজ বণিকদের জাহাজে চড়েই হিন্দুস্থানে এসেছিলেন একদল 'জেস্যুয়িট' পাদরী। বলা বাহুল্য রাজা ম্যানোয়েলের অনুরোধেই রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বাধ্যক্ষ পোপ হিন্দুস্থানে ধর্মসংস্কারের জন্য এই বিশিষ্ট দলকে নিয়োজিত করেছিলেন।

জেস্যুয়িট বা যিশুসংঘের সৃষ্টি হল ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে; এর স্রষ্টা ধর্মযাজক ইগ্নেটিয়স লয়লা। শুধু বিদ্বজ্জনই এ সংঘের সভ্য হতে পারত; নির্ধারিত কতকগুলি বিষয় প্রত্যেক সভ্যের ছিল অবশ্যপাঠ্য। এঁদের প্রত্যেকটি সভ্যকে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করতে হত আর রক্ষা করতে হত অক্ষুণ্ণ পবিত্রতা। বলা বাহুল্য এঁদের সবাই ছিলেন পোপের পরম বিশ্বস্ত ও অনুগত। শুধু খ্রীষ্টধর্ম-জগতে নয়, রাজনীতি ক্ষেত্রেও, এই যিশুসংঘের দান অনন্যসাধারণ।

মোগল সম্রাট আকবর তখন দিল্লীর মসনদে। সে কাল ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। ফতেপুর সিক্রির ইবাদৎখানায় 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মের ভিতপত্তন চলছে। মুসলমান, হিন্দু, জৈন, পার্শী, খ্রীষ্টান সকল ধর্মের শাস্ত্রবিদেরা যাঁর যাঁর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আকবরের সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধ করছেন। খ্রীষ্টান জগতের মুখপাত্র হলেন এই জেস্যুয়িট বা যিশু-সম্প্রদায়ের পাদরীর দল। তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যা করলেন বহুকাল ধরে। ভরসা ছিল শেষ পর্যন্ত মোগল সম্রাট তাঁদের মত মেনে নেবেন, কিন্তু তাঁদের সে আশা সফল হল না।

তা না হলেও তাঁরা এদেশে ধর্মপ্রচারের বাসনা ত্যাগ করলেন না, বরং বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন।

এই জেস্যুয়িট-সম্প্রদায়ের মধ্যমণি ছিলেন পুণ্যশ্লোক ফ্রান্সিস জেভিয়ার বা পরবর্তীকালের সেণ্ট জেভিয়ার। যে ছয় জন পাদরীকে নিয়ে যিশুগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। জেভিয়ার স্পেনের লোক; তাঁর জন্ম ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্যারিস ইউনিভারসিটিতে পাঠ সাঙ্গ করে তিনি সেখানেই এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার অধ্যাপনা করেন। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করে, পোপের আশীর্বাদ নিয়ে, ১৫৪১ বা ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য গোয়ায় এসে পদার্পণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানে তিনিই প্রথম খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক। এর আগেও পোর্তুগীজেরা জাহাজভর্তি করে পাদরী নিয়ে এসেছে সত্য, কিন্তু তাঁদের ধর্মপ্রচার অপেক্ষা অর্থসংগ্রহের দিকেই দৃষ্টি ছিল বেশি। তারপর পোপের সাক্ষাৎ আশীর্বাদ নিয়ে এর আগে এদেশে কেউ আসে নি। একখানা মাত্র ধর্মগ্রন্থ সম্বল করে এলেন জেভিয়ার, আর প্রকৃত সাধুর মতই জীবন যাপন শুরু করলেন। ফলে এদেশের কিছু লোক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ল।

জেভিয়ারের প্রচারকার্য চলল গরীবদের স্তরে, বিশেষ করে মালাবারের সমুদ্রের কোলে জেলেদের ঘরে ঘরে। ভক্তও কিছু জুটল বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানে তিনি বেশি দিন রইলেন না। তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই যারা তাঁর প্রেরণায় ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই পূর্বধর্মে ফিরে এল।

প্রবাদ এই যে সেণ্ট জেভিয়ার হিন্দুস্থানে পোর্তুগীজদের অসংযত জীবনযাত্রা ও রীতিনীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রথমে চলে যান লংকায়, পরে জাপানে। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিরোধান হলে তাঁর দেহাবশিষ্ট এনে প্রোথিত করা হয় পুরানো গোয়ার 'বম জেসাস কন্‌ভেণ্টে'।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে পোর্তুগালের রাজা মনে করতেন যে ধর্মপ্রচারের একটু সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করতে পারলেই হিন্দুস্থানে খ্রীষ্টধর্মের প্রসার অবশ্যম্ভাবী। তাই পাদরীদের জন্য তিনি সকল রকম

বন্দোবস্ত করতেন দরাজ হাতে। মাঝি-মাল্লা বা সিপাহী-সান্ত্রীরা হয়ত সময়মত তাদের মাসহারা পেত না, কিন্তু পাদরীদের অর্থকষ্ট বা আরামের অভাব কোনো কালেই হত না। এর ফলে, পোর্তুগীজ মাঝিমাল্লা বা সিপাহী-সান্ত্রী সুযোগ পেলেই পাদরী হয়ে ধর্মপ্রচারে মেতে যেত। একদা ব্যাপারটা এমন হল যে গোয়ায় পোর্তুগীজদের দলে সাধারণ লোকের চেয়ে পাদরীর সংখ্যা বেশি হয়ে পড়ল! এর ফলও ফলল। গোয়ায় নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে গেল।

কিন্তু এ ধর্মান্তর গ্রহণ স্বাভাবিকভাবে ঘটে নি। ধর্মান্তরের কারণ দুটি। একটিকে বলা হয়, The rice-pot and the rupee policy অর্থাৎ ক্ষুধার অন্ন ও আরামের লালসা দেখিয়ে পরধর্মে দীক্ষা। অন্যটি, Fire and steel, the dungeon and the rack অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে, নবধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা। এসব অবশ্য ঐতিহাসিকের কথা; জেসুয়িট-সম্প্রদায়ের লোকেরা যথারীতি এ অনুযোগের প্রতিবাদ করেছেন। তবে সে প্রতিবাদ যে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিসংগত হয় নি তাতে সন্দেহ নেই।

ধর্মপ্রচারে অত্যাচার যে চরমে উঠেছিল তার সাক্ষ্যপ্রমাণ অজস্র। পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলায়, পোর্তুগীজের দল গ্রামে গ্রামে উৎসবে বা হাটের ভিড়ে হানা দিয়ে লোক ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করত। এই অদ্ভুত ধর্মপ্রচারের দিকে লক্ষ্য করে পরিব্রাজক বার্নিয়ার বলেছেন যে পোর্তুগীজ পাদরীরা যে কাজ দশ বছরেও করতে পারতেন না, পোর্তুগীজ দস্যুরা করেছে তা দশ মাসে!

আল্‌বুকার্কের কালে নিহত মুরদের বিধবারা যে স্বামী-ঘাতক পোর্তুগীজ সৈন্যদের স্বেচ্ছায় বিবাহ করে নি, সে কথা সহজবোধ্য। তারপর আল্‌বুকার্কের গোয়া ছিল আদর্শ খ্রীষ্টান রাজ্য; সেখানে বিধর্মীদের কোন স্থান ছিল না। গোয়ায় 'সান্তা কেথেরিনা' নামে একটি বড় গির্জা তৈরি করে তিনি সেখানকার সমস্ত মসজিদ ও মন্দিরের দেবত্র-সম্পত্তি এই গির্জার সম্পত্তিভুক্ত করেন।

মার্টিন-ডা-সোসা গোয়ার সর্বাধ্যক্ষ হয়ে আসেন সেণ্ট জেভিয়ারের কিছু আগে বা পরে। তিনিই বোধহয় অত্যাচারী পোর্তুগীজ-

প্রধানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর। গোয়ার সবগুলি মসজিদ তো তিনি ধ্বংস করে দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর মন্দিরগুলিও। কিন্তু এতেও তাঁর তৃপ্তি হল না। তিনি আশপাশের নানা হিন্দু মন্দিরে লুটতরাজ শুরু করলেন। দস্যুবৃত্তিতে তাঁর অর্থাগমও মন্দ হল না। তারপর কাছেপিঠের পুণ্যতীর্থগুলিকে করতে লাগলেন অপবিত্র। এমনকি তাঁবেদার কোচিনের রাজার এলাকাও তাঁর অত্যাচার থেকে রেহাই পেল না। কোচিনের সন্নিকটে পল্লুরিথীর মন্দির ছিল রাজার পরম পবিত্র আরাধনার স্থান। সৌসা সেটিতে হাত দেবেন না বলে বহুবার আশ্বাসও দিয়েছিলেন, কিন্তু সেকথা তিনি রক্ষা করেন নি। তাঁর অপকর্মের লেখাজোখা নেই।

কিন্তু এসকল অপচার ও অত্যাচার তাঁর নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। এর মূলে রয়েছে পোর্তুগালের রাজা তৃতীয় জনের আদেশ। সে আদেশের সীমা তিনি সুযোগ পেলেই লঙ্ঘন করে গিয়েছেন মাত্র। রাজার ঢালাও হুকুম ছিল যে গোয়ায় হিন্দুদের মন্দিরগুলি ভেঙেচুরে, পুড়িয়ে তাদের মূলোচ্ছেদ করে ফেলতে হবে। তারপর যে-কোন রকম দেবমূর্তি যাতে আর গোয়ার এলাকায় প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; সে মূর্তি বা তার প্রতীক, পাথর, ধাতু কাঠ বা অন্য যা কিছু দিয়েই তৈরি হোক না কেন।

তাই গোয়া, কোচিন্ ও তার আশপাশের সর্বত্র ধর্মের নামে পোর্তুগীজের তাণ্ডবলীলা চলেছিল বহুকাল ধরে। এতে মুসলমানদের তো বটেই, হিন্দুদেরও ক্ষোভ ও অন্তর্দাহের সীমা ছিল না।

এই কোচিনেই তৈরি হয়েছিল হিন্দুস্থানের প্রথম রোমান ক্যাথলিক গির্জা। এটা পোর্তুগীজদেরই তৈরী, হয়ত ফ্র্যানসিসকান সন্ন্যাসী সংঘের। পরে কোচিন দখল করে ওলন্দাজেরা সে গির্জাটিকে প্রোটেষ্টাণ্ট গির্জায় রূপান্তরিত করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, জেস্যুয়িট সংঘের সভ্যেরা ছিলেন উচ্চ-শিক্ষিত লোক। এঁরা কোচিনে একটা বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপিত করেছিলেন। ফরাসী জহুরী টেভার্নিয়ার গোয়া ও কোচিনে

এসেছিলেন ১৬৪১ থেকে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি এই গ্রন্থাগারটি সম্পর্কে লিখেছেন যে পুস্তক সংখ্যা ও বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এটির গৌরব ছিল অসাধারণ। এখানে ইউরোপ থেকে সংগৃহীত পুস্তকের তো অন্তই ছিল না, তার উপর ছিল হিব্রু, কলডিক, আরবী, পার্শী, চীনা ও নানা ভারতীয় ভাষায় লেখা অসংখ্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপি। ওলন্দাজেরা পরবর্তীকালে এ মহামূল্য গ্রন্থাগারটিকে নিশ্চিহ্ন করে জাতির ইতিহাস কলঙ্কিত করেছে।

এই জেস্যুয়িট পাদরীর দল যে অসামান্য কর্মক্ষম ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রোমান চার্চের কল্যাণের জন্য তাঁরা কোনো কার্যেই বিমুখ ছিলেন না। শুধু ধর্ম নিয়েই যে তাঁরা ব্যাপৃত থাকতেন না, সেকথা আগেও বলা হয়েছে। রাজনীতি ও বাণিজ্যনীতি চর্চায়ও ছিল এঁদের পরম নিষ্ঠা। মোগল বাদ্শাহের দরবারে বসে তাঁরা পোর্তুগীজের পক্ষে রাজদূতের কার্য করতেন। সে কাজে এঁরা এমন দক্ষ ছিলেন যে এঁদের কার্যক্ষমতার ফলেই অনেক দিন পর্যন্ত ওলন্দাজ ও ইংরেজ কেউই মোগলরাজ্যে বাণিজ্য করবার সুযোগ পায় নি। খ্রীষ্টান হলেও ইংরেজ বা ওলন্দাজ কেউই রোমান ক্যাথলিক ছিল না—তারা উভয়েই প্রোটেষ্টাণ্ট।

আকবরের দেহান্ত হল ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরে দিল্লীর মস্‌নদে বসলেন জাহাঙ্গীর বাদ্শা। ইংরেজ ও ওলন্দাজ তখন সবেমাত্র হিন্দুস্থানে বাণিজ্যের লোভে নানা বন্দরে আনাগোনা করতে শুরু করেছে। প্রথম প্রথম এদের দৃষ্টি ছিল দূর-প্রাচ্যের সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি নানা দ্বীপের দিকে। নানা কারণে হিন্দুস্থানের দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ল ইংরেজের, পরে ওলন্দাজের। কিন্তু দৃষ্টি পড়লে কি হবে? সেখানে মোগল বাদশাহের দরবারে আকবরের আমল থেকেই জেস্যুয়িটদের প্রাধান্য। তাঁরা রোমান ক্যাথলিকের স্বপক্ষে আর প্রোটেষ্টাণ্ট-এর বিপক্ষে।

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই জেস্যুয়িটদের চেষ্টায়ই পোর্তুগীজের সঙ্গে জাহাঙ্গীর বাদশার যে চুক্তি হয় তা অসাধারণ। এর মোটামুটি মর্ম এই যে ইংরেজ ও ওলন্দাজ হিন্দুস্থানে বণিকের ছদ্মবেশে এসেছে

দেশ জয় করতে। তাদের যদি বাদ্‌শার মুলুকে বাস করতে দেওয় হয় তবে তা সবার পক্ষেই অশুভ হবে। তাই একথা স্থির হল যে বাদ্‌শা জাহাঙ্গীর ও হিন্দুস্থানে পোর্তুগালের রাজপ্রতিনিধি কেউ-ই এ দুটি জাতির সঙ্গে কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখবে না তাদের জাহাজগুলিকে দেশের কোনো বন্দরে আশ্রয় দেওয় হবে না—কেউ খাদ্য সরবরাহও করবে না। মোগল রাজে ইংরেজের যে ঘাঁটি রয়েছে তা গুটিয়ে নিয়ে তাদের মাদ্রাজের মসলিপট্টমে অর্থাৎ মোগল রাজত্বের বাইরে চলে যেতে হবে।

মোগল বাদ্‌শাহের দরবারে জেসুয়িটদের প্রতিপত্তি যে কত দৃঢ় ছিল, এই অনন্যসাধারণ চুক্তিই তার পরিচয়। অবশ্য এ চুক্তি বেশি দিন টেকেনি ; তার কারণ ভিন্ন।

এবার আমরা পোর্তুগীজ পর্বের সালতামামি লিখছি।

ইউরোপের নানা জাতির মধ্যে পোর্তুগীজই প্রথম হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, শ-খানেক বছরের মধ্যে এদেশে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ এসে জোটে নি। সাহসে, দুর্ধর্ষতায় ও পরাক্রমে অন্যান্য জাতির চেয়ে তারা খাটো ছিল না। তাদের বাণিজ্যের কর্ণধার ছিলেন স্বয়ং পোর্তুগালের রাজা, আর সে বাণিজ্যে যে বিপুল লক্ষ্মীলাভ হত তা লক্ষ করে ফরাসী জহুরী টেভার্নিয়ার বলেছিলেন যে ওলন্দাজরা এসে পোর্তুগীজদের হটিয়ে না দিলে গোয়ার বেশির ভাগ পোর্তুগীজের বাড়িতে আর একখণ্ড লোহাও অবশিষ্ট থাকত না—এতদিনে সবই সোনা ও রূপায় পরিণত হয়ে যেত!

তারপর জেসুয়িটদের সহায়তায় মোগল দরবারে তাদের প্রতিপত্তিও ছিল বিপুল এবং পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ হিন্দুস্থানের সকল বড় বড় বন্দরেই ছিল তাদের কাজ-কারবার। তবু তারা শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানের মাটি ও ব্যবসা দখল করে থাকতে পারল না। এর কারণ কি?

এর কারণ একাধিক।

প্রথম, পোর্তুগীজ প্রধানদের 'যুদ্ধং দেহি' ভাব—যা কোনক্রমেই বণিকোচিত নয়। মসলার বাণিজ্যটা ছিল পোর্তুগালের রাজার

একচেটিয়া কারবার। এদেশে যে সব বাণিজ্য-সর্দার বা মাঝিমাল্লা আসত, সবাই ছিল রাজকর্মচারী। ক্ষত্রিয় মনোবৃত্তি নিয়ে বৈশ্যকর্মে সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। এর ফলে কালিকটের জামোরিনের সঙ্গে তাদের কখনো আর সখ্যতা হল না। আবার কোচিনের রাজা তাদের একান্ত বশংবদ হয়েও, এমনকি পোর্তুগালের রাজার আনুগত্য স্বীকার করেও, পদে পদে অপমানিত হলেন। সর্বত্র ক্ষোভ ও অন্তর্দাহ প্রবল হয়ে রইল।

পোর্তুগীজেরা যে তাদের দেশের কল্যাণ কামনায় হিন্দুস্থানে এসেছিল একথা মনে করলে ভুল করা হবে। সাধারণতঃ সবাই নিজের নিজের ভবিষ্যতের কথাই বেশি করে ভাবত। মাঝিমাল্লারা বেতনই বা কি পেত? খাওয়া ছাড়া প্রতি মাসে পাঁচ কি সাত ক্রুসাডো; প্রতি ক্রুসাডোর মূল্য আড়াই শিলিং। তারপর বাণিজ্য শেষে বাড়ি ফিরে যাবার সময় হন্দর দুই গোলমরিচ দেয়া হত; এটাই অবশ্য ছিল প্রধান আকর্ষণ। এদের কিন্তু সবারই লক্ষ ছিল 'উপরি' পাওনার দিকে।

ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, সাধারণ একজন ক্যাপ্টেনের তিন বছরের মাইনে হাজার পাউণ্ডের বেশি হত না; অর্থাৎ মাসে তিন শ সাড়ে তিন শ টাকা মাত্র। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তার নিজস্ব বাণিজ্যে ও লুটতরাজের অংশে আয় হত মোটামুটি সাতান্ন হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ মাসে প্রায় বিশ বাইশ হাজার টাকা। উপার্জনের এ অঙ্ক ছিল সাধারণের কল্পনাতীত। তাই সারা ইউরোপে হিন্দুস্থানের এই স্বর্ণখনির কথা মুখে মুখে প্রচারিত হতে লাগল।

পোর্তুগালের রাজা ও রাজসরকার এই অভাবিত 'উপরি' পাওনার কথা ভালোভাবেই জানতেন। তাই এসব চাকুরির দর নিলাম ডেকে ঠিক করা হত অর্থাৎ এ চাকুরি নিয়ে হিন্দুস্থানে যেতে হলে রাজসরকারকে সবারই বেশ কিছু 'প্রিমিয়াম' বা লাভের অংশ অগ্রিম দিতে হত। ফলে, প্রত্যেকটি পোর্তুগীজই ছিল এক-একটি ঠিকেদার, এক-একটি ছোটখাট দস্যু।

এই পরম অর্থলোভের বশবর্তী হয়ে এরা যা আচরণ করত তা নিতান্তই বর্বরোচিত, শ্বাপদবৎ। বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় এদের

ইতিহাস এত কলঙ্কিত যে তার তুলনা হয় না। ফরাসী ভিষক্-পর্যটক্ বার্ণিয়ার সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় এসে বলেছিলেন যে পোর্তুগীজরা নামে মাত্র খ্রীষ্টান। এদের জীবনযাত্রা বীভৎস; বিবেক বলে এদের কিছু আছে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয়, গোঁড়া পাদরীদের প্ররোচনার ফলে পোর্তুগালের রাজা হিন্দুস্থানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রতিভূদের কার্যকলাপে এদেশে কোথাও পোর্তুগীজ-প্রীতির সঞ্চার হয়নি, শুধু পোর্তুগীজ-ভীতিই বেড়েছে। এমনকি জেস্যুয়িট্ সম্প্রদায় যে সকল হিন্দুস্থানী বা অন্য দেশীয় মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, আর যাদের মধ্যে পোর্তুগীজ ভাষারও কিছু কিছু প্রচলন হয়েছিল, তারাও এদের নৃশংস ও বীভৎস ব্যবহারে ক্রমশঃ পোর্তুগীজ-বিদ্বেষী হয়ে উঠল।

তৃতীয়, পোর্তুগীজের কালেই হিন্দুস্থানে মোগল রাজত্বের শুরু হয়ে, বিশেষ করে উত্তরাপথে শান্তি সংস্থাপিত হল। কাজেই উত্তর বা পূর্ব ভারতে পোর্তুগীজের পক্ষে কোনো রাজ্য লাভের সম্ভাবনা রহিত হয়ে গেল। বাকি রইল দক্ষিণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। তা একা কালিকটের জামোরিনই নানা কারণে পোর্তুগীজের কাছে শতাধিক বছর অজেয় হয়ে রইলেন।

চতুর্থ, ষোড়শ শতকের শেষপাদে, ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে, পোর্তুগালই পরাধীন হয়ে গেল—স্পেনের। ফলে, সেকাল থেকে পোর্তুগীজদের শুধু হিন্দুস্থানে কেন, দূরপ্রাচ্যের সর্বত্রই, বাণিজ্যস্রোতে ভাঁটা পড়ল। অর্থবল ও নৌবলও কমে এল। এদিকে পোর্তুগীজের দুর্বলতার সুযোগে এদের প্রতি হিন্দুস্থানের মজ্জাগত অন্তর্দাহ ও বিদ্বেষ প্রবলতর আকার ধারণ করল। সে বিদ্বেষবহ্নিতে ইন্ধন জোগাল নবাগত ওলন্দাজ বা ডাচ্ এবং শেষ পর্যন্ত ডাচদের লাঠির ঘায়েই পোর্তুগীজকে নিতান্ত অসম্মানে হিন্দুস্থান থেকে বিদায় নিতে হল।

হিন্দুস্থানের ইতিহাসে পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা দিল ডাচ্।

॥ তিন ॥

এবার ওলন্দাজ ওরফে ডাচ্‌দের কথায় আসা গেছে। ওলন্দাজ কথাটা পোর্তুগীজ Hollandez-এর অপভ্রংশ; এর অর্থ হল্যাণ্ড দেশের লোক।

এদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই স্পেনের কথা কিছু বলতে হবে, কারণ ষোড়শ শতকে এ দেশটা ছিল স্পেনের অধীনে।

যে দুটি খণ্ড খণ্ড রাজ্য একত্র হয়ে স্পেনকে বড় করেছে তার একটির নাম ক্যাষ্টিল্‌, অন্যটির অ্যারাগঁ। উত্তরাধিকারসূত্রে ইজাবেলা ছিলেন ক্যাষ্টিলের রানী আর ফার্ডিনাণ্ড অ্যারাগঁর রাজা। এঁদের মিলন হল ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর থেকেই স্পেনের প্রতাপ বৃদ্ধি পেল। পূর্বেই বলা হয়েছে, জেনোয়ার দুর্ধর্ষ নাবিক কলম্বস্‌ এই রাজা-রানীর অনুগ্রহে হিন্দুস্থান ও দূরপ্রাচ্যের মসলার বাজারের খোঁজে গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করলেন ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে।

ইউরোপে সোনা বা রূপার খনি নেই বললেই চলে। আমেরিকার মেক্সিকো, পেরু, নিউগ্রানাডা, অর্থাৎ আধুনিক কলম্বিয়া, প্রভৃতি দেশে সেকালে এ দুটি ধাতু পাওয়া গেল অপর্যাপ্ত। স্পেন বহুকাল ধরে আমেরিকার এই মহামূল্য ধাতু-ভাণ্ডার লুট করে তার প্রায় সবটা দিয়েই রাজকোষের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বৃদ্ধি করল। ফলে, আমেরিকা আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে স্পেন হয়ে উঠল ইউরোপের সর্বাপেক্ষা ধনী জাতি। অর্থনীতির পণ্ডিতেরা আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে ও পরে ইউরোপের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাবলের একটা তুলনামূলক হিসাব করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে আমেরিকা থেকে আনা এ দুটি ধাতু দিয়ে সমগ্র ইউরোপের মুদ্রাবল তখন শতকরা সত্তর ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই অভাবিত অর্থলাভের সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনে এল নবজাগরণ। যাকে বলা হয়েছে রেনেসাঁস। স্পেনের সৈন্যবল বাড়ল আর বাড়ল

শিক্ষা, দেশের প্রাচীন সালমাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন প্রসারে। এদিকে সমগ্র দেশেই, বিশেষ করে ক্যাষ্টিলে, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার হয়ে দেশের সম্পদ ও শ্রী স্বপ্নাতীতরূপে বেড়ে গেল। মোটের উপর স্পেন, অল্পকালের জন্য হলেও, ইউরোপের অবিসম্বাদী নায়ক বলে পরিগণিত হল।

আমাদের কথা ডাচের। ডাচেরা চিরদিনই পটু বণিক জাতি। উত্তর সাগরে স্কটল্যাণ্ডের উপকূলের কাছে হেরিং মাছ ধরে তারা সারা ইউরোপে ফেরি করে বেড়াত। মাছ বিক্রি হত বেশি রোমান্ ক্যাথলিক দেশে—ফ্রান্সে, ইটালিতে, স্পেনে ও পোর্তুগালে। আরো উত্তরের দেশ ডেনমার্ক ও সুইডেন থেকে তারা নিয়ে আসত নানারকম মূল্যবান কাঠ, আর বলটিক সাগরের তীরে রাশিয়ার বন্দর থেকে খাদ্যশস্য। এর বেশির ভাগ তারা নিয়ে যেত ইটালির বন্দর ভেনিসে, জেনোয়ায়। ভেনিস ছিল সেকালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দর। আবার ভেনিস থেকে নিয়ে আসত ইটালির বিখ্যাত মার্বেল পাথর। পোর্তুগালের লিসবন বন্দরও খুব বড়; সে বন্দরও বোঝাই থাকত ডাচের জাহাজে। ডাচের জাহাজ সংখ্যায় ছিল এত বেশী যে ইউরোপ থেকে ভূমধ্যসাগরে সেকালে যত জাহাজ যাতায়াত করত তার মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগই ছিল হল্যাণ্ডের। বাণিজ্যই ছিল ডাচের কুলধর্ম।

এদের দেশের বড় বন্দর ছিল এণ্টোয়ার্প। ডাচের জমজমাট ব্যবসায়ের ফলে সে বাজারের কাজকর্ম ছিল ক্রমবর্ধমান। এদিকে ভেনিসের হাটে ভাঙ্গন ধরেছে। কারণ পোর্তুগীজেরা তখন জাহাজ বোঝাই মসলা নিয়ে আসে সোজা হিন্দুস্থান থেকে। তাই ইউরোপে ভেনিসের স্থান ক্রমে দখল করতে লাগল এণ্টোয়ার্প। ইংরেজরা বহু পূর্ব থেকেই পশম তৈরি করত বটে, কিন্তু গোড়ায় তারা তাঁতের কাজ জানতো না। তাই সে পশম দিয়ে কাপড়ও তৈরি করতে পারত না। ফলে, তারা পশম বিক্রি করত এসে হল্যাণ্ডে, বিশেষ করে এণ্টোয়ার্পে। হল্যাণ্ডে সে পশম দিয়ে যে শোভন কাপড় তৈরি হত তার তুলনা সেকালে ইউরোপে মিলত না।

স্পেন এর মত হল্যাণ্ডও ছিল রোমান্ ক্যাথলিক। কিন্তু ক্রমে

সে দেশের অধিকাংশ লোক হয়ে উঠল প্রোটেষ্টাণ্ট। এই ধর্মবিভাগ থেকেই স্পেন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে হল গোলযোগের সূত্রপাত।

স্পেনের রাজা তখন দ্বিতীয় ফিলিপ। তিনি গোঁড়া রোমান্ ক্যাথলিক। রাজধর্মের প্রতি ডাচদের এই অশোভন তুচ্ছতাচ্ছিল্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হল্যাণ্ডকে শিক্ষা দিয়ে 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' সৈন্যসামন্ত পাঠালেন। শিক্ষার প্রথম পর্ব হল—এণ্টোয়ার্পের লুটতরাজ, দ্বিতীয় পর্ব প্রোটেষ্টাণ্টদের উপর অমানুষিক অত্যাচার।

এর ফল ভাল হল না।

দেশটা এই ধর্ম-বিতণ্ডায় দক্ষিণ ও উত্তর এই দু খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় রইল দক্ষিণ জুড়ে; উত্তরে সাতটি ছোট ছোট প্রদেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল প্রোটেষ্টাণ্টের দল। এই দ্বিতীয় দলে রইল বহু বিত্তশালী বণিক যাদের কাজ কারবার চলত দেশে ও দেশান্তরে। এণ্টোয়ার্প দক্ষিণদেশে; তাই এরা সেখান থেকে আস্তানা গুটিয়ে জড় হল উত্তরের আমষ্টারডাম বন্দরে। এ ঘটনা ঘটল ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে, ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরে উত্তরের বিদ্রোহী প্রদেশগুলির সঙ্গে স্পেনের দ্বন্দ্ব চলল আশি বছর; শুধু মাঝখানে বছর বারোর জন্য এর বিরতি ঘটেছিল।

হল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের নূতন আস্তানা আমষ্টারডাম বন্দরটি ক্রমশ জাঁকিয়ে উঠল। সেকালে স্পেন ও পোর্তুগাল দুটি দেশই ইহুদিদের প্রতি অত্যাচার করত, বিধর্মী বলে। ইহুদিরা ব্যবসায়ী জাতি। এরা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দলে দলে আমষ্টারডামে এসে জুটল। ক্রমে সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে আমষ্টারডাম পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় বন্দর বলে গণ্য হল। বন্দরটির ব্যবসাবাণিজ্য এত বিস্তৃত হল যে এর ঐশ্বর্য হয়ে দাঁড়াল সেকালের বন্দরশ্রেষ্ঠ ভেনিসেরও বহুগুণ।

কিন্তু স্পেনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার পর বিদ্রোহী হল্যাণ্ডের জাহাজ আর দক্ষিণ দিকে যেতে পারত না। তাই তাদের ভূমধ্য-সাগরের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। এর মধ্যে স্পেনের রাজা দ্বিতীয়

ফিলিপ দখল করলেন পোর্তুগাল ; কাজেই বিদ্রোহী ডাচের জাহাজ লিস্‌বনেও আর যেতে পারত না।

এদিকে স্পেন ও উত্তর হল্যাণ্ডের দ্বন্দ্ব চলতে থাকল বটে, কিন্তু স্পেন তখন অসীম বলশালী। এরূপ প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান সোজা কথা নয়। তাই প্রোটেষ্টাণ্ট ডাচ্ তার ধর্মভাই প্রোটেষ্টাণ্ট ইংরেজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। রানী এলিজাবেথ তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে। তিনি সাহায্য করলেন বটে, তবে অনেক বিলম্বে।

ইংরেজ ডাচদের সাহায্য করল বলে স্পেন তাদের উপর দারুণ ক্রুদ্ধ হল। তা ছাড়া ক্রোধের আরো অনেক কারণও ছিল। স্পেনের মতে ইংল্যাণ্ডও তো বিধর্মী অর্থাৎ প্রোটেষ্টাণ্ট। স্পেনকে তার জমিদারী হল্যাণ্ডে যেতে হলে ইংল্যাণ্ড অতিক্রম করে যেতে হয়। সে-পথে স্পেনের নৌবহরকে আক্রমণ করে ইংরেজ জলদস্যুর দল প্রায়ই ধনরত্ন, মালপত্র লুটতরাজ করে। ইংরেজের রানীর কাছে বারবার লিখেও এই অত্যাচারের কোন প্রতিকার হয় না।

তাই, এবার ইংরেজকে শায়েস্তা করবার জন্য স্পেন থেকে একটা বিরাট নৌবাহিনী পাঠানো হল ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ; আর তা-ই হল স্পেনের কাল। সে দুরাসদ চমূ কিন্তু অভাবিতরূপে পরাজিত হল হীনবল ইংরেজের কাছে।

এমন একটা স্বপ্নাতীত ঘটনা যে কি করে ঘটল সে অন্য কথা, কিন্তু এর ফল হল সুদূরপ্রসারী। শুধু ইংরেজের নয়, ডাচদের মন থেকেও দুর্জয় স্পেনের ভয় প্রায় সবটাই কেটে গেল।

এদিকে সমগ্র ইউরোপে মোট যত বাণিজ্য জাহাজ ছিল তার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ডাচদের। ব্যবসায়ী হিসাবেও তারা ছিল সর্বাপেক্ষা পটু। অর্থও তাদের প্রচুর। অথচ, স্পেনের ভয়ে তাদের কাজ কারবার ছিল বন্ধ, জাহাজগুলি অকেজো।

ডাচেরা এবার সাহস পেয়ে দল বেঁধে অগ্রসর হয়ে এল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। সেদিককার বন্দরে বন্দরে পোর্তুগীজের দল মুরদের সাথে নানা দ্রব্য বিনিময় করত। মুরেরা দিত গোলমরিচ,

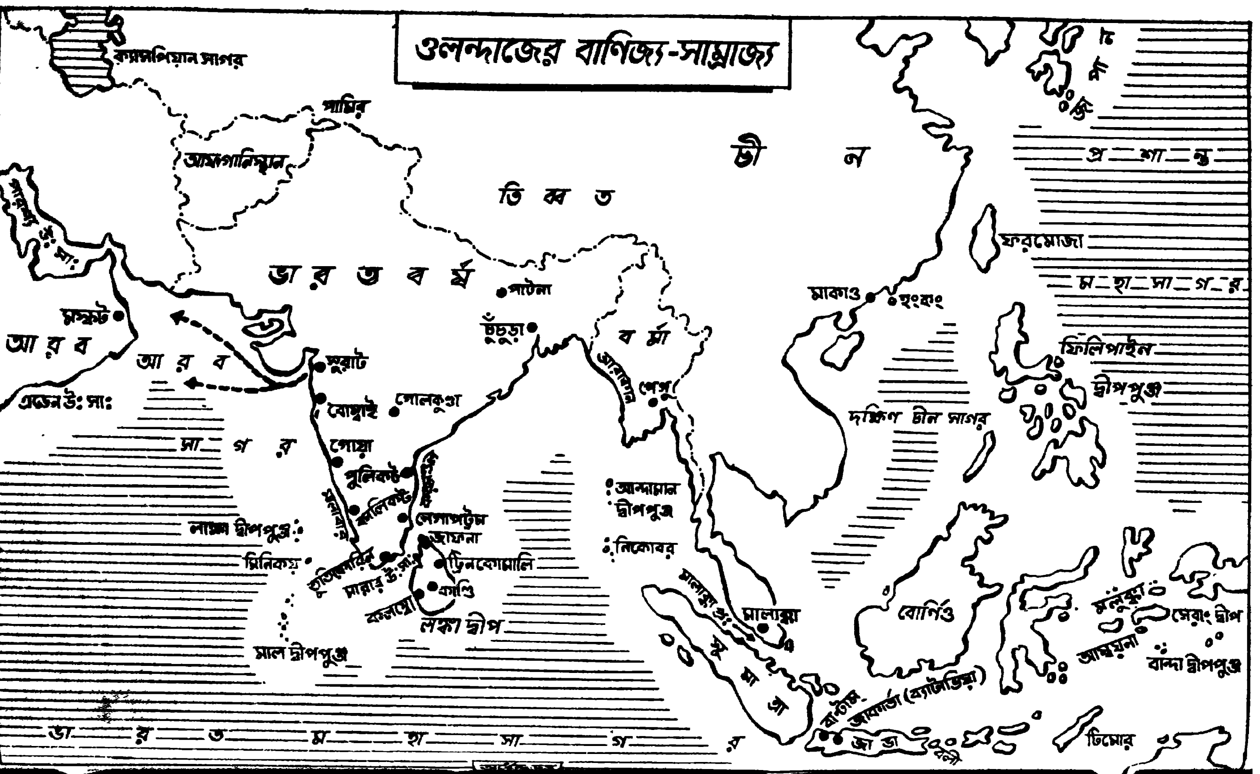
সোনা, নুন আর পোর্তুগীজেরা দিত কাপড়, খাদ্যশস্য, নানাপ্রকার বাসন কোশন, চিরুনি, আরশি আর পশুর চামড়া। ক্রীতদাসও কেনা বেচা হত। ডাচেরা এদিকে এসে পোর্তুগীজদের হটিয়ে দিল; অর্থে ও সামর্থ্যে ডাচেরা ছিল পোর্তুগীজদের চেয়ে অনেক বেশী

কিন্তু আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ব্যবসা নগণ্য। এত সামান্য কাজে দেশের এতগুলি জাহাজ ও তার মাঝিমাল্লাকে পুরোপুরি ব্যাপৃত রাখা ডাচদের পক্ষে হল অসম্ভব। এদিকে দেশে মসলার হল অসম্ভাব আর তার দামও চড়ল অসম্ভাব্যরূপে। কাজেই আমষ্টারডামের বণিকেরা এবার দূর প্রাচ্যের মসলা দ্বীপের খোঁজে যাবার কল্পনা করতে লাগল। পোর্তুগীজদের পরম ঐশ্বর্যের মূল যে কোথায় তা তখন ইউরোপে কারো অজানা ছিল না।

আমষ্টারডাম বন্দরেও লিসবন থেকে ছাপা 'উত্তম+আশা' অন্তরীপ ঘুরে মসলা দ্বীপে গতায়াতের পথের নকশা পাওয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে বেশী খবর ও ভরসা পাওয়া গেল একখানা বই থেকে। বইখানার লেখক লিন্সকোটেন; এটি তাঁর দূর প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জ, হিন্দুস্থান, লংকা, চীন প্রভৃতি ভ্রমণের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার কাহিনী।

লিন্সকোটেন উত্তর হল্যাণ্ডেরই অধিবাসী। ভাগ্যের খোঁজে তিনি প্রথম যান লিসবনে। সেখান থেকে পোর্তুগীজদের সঙ্গে জুটে চলে যান গোয়ায়। গোয়ায় একজন পাদরীর কাছে কাটে তাঁর বছর পাঁচেক। তারপর পোর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে জুটে চলে যান দূর প্রাচ্যের নানা দ্বীপে। এ সব সফরে তাঁর কাটে আরো আট দশ বছর। তারপর তাঁর এই বহুদিনের অভিজ্ঞতা নিখুঁতভাবে লেখেন তাঁর অপূর্ব ভ্রমণ বৃত্তান্তে। এমন ক্রমঅনুযায়ী, যথাতথ, ও তথ্যবহুল পুস্তক সেকালে বড় সুলভ ছিল না। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বিভিন্ন মসলার যে নানা গুণের কথা উল্লেখ করেছি তা এই লিন্স্‌কোটেনের লেখারই পুনরুক্তি মাত্র।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ইংরেজের কাছে স্পেনের পরাজয়ের ছয় বছর পরে, আমষ্টারডামের নয়জন বিশিষ্ট বাণিজ্যপতি একত্র


ওলন্দাজের বাণিজ্য-সাম্রাজ্য
কাস্পিয়ান সাগর
পামির
আফগানিস্থান
চীন
তিব্বত
ভারতবর্ষ
পাটনা
চুঁচুড়া
বর্মা
আরাকান
পেগু
মাকাও
হংকং
ফরমোজা
প্রশান্ত মহাসাগর
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
দক্ষিণ চীন সাগর
মস্কট
আরব
আরব সাগর
এডেন উঃ সাঃ
সুরাট
বোম্বাই
গোলকুণ্ডা
গোয়া
পুলিকট
নেগাপট্টম
জাফনা
ত্রিনকোমালি
মিনিকয়
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
মালাবার
তুতিকোরিন
মান্নার উঃ
কলম্বো
ক্যাণ্ডি
লঙ্কা দ্বীপ
মাল দ্বীপপুঞ্জ
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
নিকোবর
মালাক্কা প্রঃ
মালাক্কা
সুমাত্রা
বোর্ণিও
মলুক্কা
সেরাং দ্বীপ
আম্বয়না
বান্দা দ্বীপপুঞ্জ
বান্টাম
জাকার্তা (ব্যাটাভিয়া)
জাভা
বলী
টিমোর
ভারত মহাসাগর

হয়ে চারখানা জাহাজে গরম কাপড়, কম্বল, কাঁচের গ্লাস, আরশি, ছুরি, তালা প্রভৃতি বোঝাই করে দূর প্রাচ্যের জাভা দ্বীপের দিকে রওনা হল। তাদের দৃষ্টি ছিল দূর প্রাচ্যের দ্বীপগুলির দিকেই—হিন্দুস্থানের দিকে নয়। কারণ মসলার প্রকৃত বাজার সেটাই। জাভা দ্বীপের বাণ্টাম বন্দরে তারা পৌঁছে গেল পনের মাস পরে। কিন্তু নানা কারণে সে গস্তে বহু লোকসান হল। পরের বারে অবশ্য লাভ হল টাকায় চার টাকা। এমনি চলল বার কয়েক।

লিন্সকোটেন একটি মহামূল্যবান কথা লিখেছিলেন। সেটি এই যে প্রাচ্যের সর্বত্রই পোর্তুগীজের অবস্থা সঙ্কটজনক, নড়বড়ে। সামান্য আঘাতেই তাদের বাণিজ্য-সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হবে। যারা বাণ্টাম থেকে দেশে ফিরে এল তারাও লিন্সকোটেনের কথার পূর্ণ সমর্থন করল। ফলে, বাণিজ্যপতিরা দূর প্রাচ্যে বাণিজ্যের জন্য ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে একটা নূতন কোম্পানি গড়ে তুলল। সে কোম্পানির নাম দেওয়া হল 'The United East India Company of Netherlands'—নেদারল্যাণ্ডএর ইউনাইটেড্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। সতের জন বিচক্ষণ বণিক হল তার কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা ভাল। এখন সাধারণত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বলতে আমরা শুধু ইংরেজের কোম্পানিটার কথাই মনে করি। কিন্তু ইউরোপ থেকে যে সব জাতিই এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছে, তারা সবাই কিন্তু যার যার নিজস্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গড়েছিল।

১৬০৩ বা ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ কোম্পানি গড়বার বছর দুয়ের মধ্যেই, ডাচেরা এসে কালিকটে উপস্থিত হল। জামোরিন তখন পোর্তুগীজদের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামায় ব্যস্ত। তাই ডাচদের সাহায্যে পোর্তুগীজদের উৎখাত করবার জন্য জামোরিন এদের কালিকটে ঘাঁটি তৈরির অনুমতি দিলেন। কিন্তু ডাচদের মন ছিল দূরপ্রাচ্যের দ্বীপগুলির দিকে; বাণিজ্যের পক্ষে ওদেশই তাদের বেশী সুবিধাজনক বলে মনে হল। প্রথম স্থায়ীভাবে বসল তারা

বাণ্টামে পরে জাকার্তায়। এর অপর নাম ডাচেরা দিল ব্যাটাভিয়া। এই ব্যাটাভিয়াকে কেন্দ্র করে তারা ক্রমে তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল দূরপ্রাচ্যের সমস্ত দ্বীপেই। হিন্দুস্থানের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হল তাদের অনেক পরে।

এই দ্বীপগুলিতে তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গঠনের কাহিনী ডাচদের চরম কলঙ্কের ইতিহাস। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হুটি। প্রথম, এদেশে যথেচ্ছ মসলা সংগ্রহের সর্বাধিকার; দ্বিতীয়, মসলা উৎপাদনে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রচলন যাতে এদেশ থেকে মসলার রপ্তানি কমিয়ে দিয়ে ইউরোপের বাজারে ইচ্ছামত দাম বাড়ানো চলে। এই হুটি প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য তারা এদেশে যে কোনো প্রকার বর্বরতায় ও নৃশংসতায় পশ্চাৎপদ হয় নি।

বাণ্টামে পোর্তুগীজদের একটি ফ্যাক্টরি ছিল। ডাচেরা এসেই তাদের সেখান থেকে উৎখাত করে দিল। সুমাত্রা গোলমরিচের আস্তানা; পোর্তুগীজের পরম ঐশ্বর্যের মূলে এই গোলমরিচ। তা ছাড়া এখানে পাওয়া যেত সোনা, রূপা, হীরা জহরত আর নানা প্রকার আয়ুর্বেদীয় বৃক্ষলতা। মলুক্কা দ্বীপে জন্মাত নানা প্রকার মসলা; আম্বয়নায় লবঙ্গ আর বান্দায় জয়ত্রী। এ সকল ফসলের ছিল অভাবিত প্রাচুর্য। এ সব দ্বীপে ইউরোপের অন্য কোনো বণিক জাতি যেন না ঢুকতে পারে এ সম্পর্কে সজাগ থাকবার জন্য নির্দেশ দিল কোম্পানির কার্যনির্বাহক সমিতি। সে আদেশ পালিত হল এত নিখুঁতভাবে যে অচিরে এ দেশে ডাচ বণিক ছাড়া আর কারো কাজ করবার উপায় রইল না।

ইংরেজেরাও এই একই সময়ে মসলার লোভে এই দ্বীপগুলির আশেপাশে আনাগোনা করছিল। কিন্তু ডাচেরা ছিল তাদের চেয়ে বলীয়ান ও হুর্দান্ত আর, সর্বোপরি অর্থবলে পরম শক্তিশালী। ইংরেজ হু-একটা দ্বীপে তাদের ঘাটি তৈরি করল বটে, কিন্তু কোথাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। আম্বয়নায় তারা একটা বড় আস্তানা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিল আর সে কাজে অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু ডাচেরা সেখানে হল তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা সে আস্তানা ধ্বংস করে দিয়ে

সেখানকার সব ইংরেজ বণিকদের নির্মমভাবে হত্যা করল। এর ফলে ইংরেজেরা এত হতবুদ্ধি হয়ে গেল যে ভয়ে তারা দূর প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে হিন্দুস্থানের উপকূলে এসে জুটল। তাদের পক্ষে কিন্তু এই পরাজয় হল শাপে বর। এ না হয়ে ডাচেরাই যদি প্রথমে হিন্দুস্থানে এসে পড়ত, তবে হয়ত এদেশের ইতিহাসে ইংরেজের স্থান দখল করত ডাচ।

আম্‌বয়নায় এই নিদারুণ অত্যাচারের কথা অবশ্য ইংরেজ সহজে ভুলতে পারে নি। এর জের চলেছিল অনেক দিন।

পোর্তুগীজ ও ইংরেজদের হটিয়ে দিয়ে, ডাচেরা অন্যান্য বণিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করল। সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিয়ো প্রভৃতি দ্বীপে সেকালে আরো দু দল বণিক আসত। এক মালাবারী অর্থাৎ কালিকট, কোচিন ইত্যাদি বন্দর থেকে হিন্দুস্থানী; দুই, চীনা। হিন্দুস্থানীরা নিয়ে আসত সুতি ও সিল্কের কাপড় যা দিয়ে তৈরি হত মালয়ের জনসাধারণের জাতীয় পোশাক 'সারুং'। চীনের বণিকেরা আনত চাল। এই কাপড় ও চালের বিলক্ষণ চাহিদা ছিল। দু দলই অবশ্য দেশে ফিরত মসলা নিয়ে। ডাচেরা বাণিজ্যপটু; তারা এসব দ্বীপের অন্ন বস্ত্র যোগাবার ভার নিতে পারে কিনা তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হল। নইলে, বাণিজ্যে একাধিপত্য বজায় থাকে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ডাচদের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল এ দ্বীপগুলি থেকে মসলা সংগ্রহের সর্বাধিকার আর মসলার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। এ দুটি ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি রইল সজাগ। দ্বীপগুলি ছোট ছোট হীনবল রাজার অধীনে; তাদের নৌবল, সৈন্যবল অস্ত্রবল ও অর্থবল আর কতটুকু? এদিকে ডাচের পরাক্রম অসীম। তাই রাজারা ডাচদের যেখানে বাধা দিলেন, সেখানেই তাঁরা হলেন সর্বস্বান্ত। এমনকি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে বাধা পেয়ে এক একটি দ্বীপের সমস্ত অধিবাসীদের যে ডাচেরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার স্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। এমনি একটি দ্বীপ বান্দা; সেখানে পনের হাজার লোককে হত্যা করে মসলার চাষের জন্য ডাচদের হল্যাণ্ড থেকে নিজের দেশের লোক আমদানি করতে

হয়েছে। এরই নাম উপনিবেশ স্থাপন; এরই অর্থ যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন!

এ সকল অমানুষিক অত্যাচারের নিয়ামকদের মধ্যে বাণ্টামের ডাচ্ বাণিজ্য-কেন্দ্রের সর্বাধ্যক্ষ কোয়েনের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। দূর প্রাচ্যে তার নামই সর্বাধিক কুখ্যাত।

ডাচেরা বাণ্টামে পাকাপাকিভাবে বসবার পরে কোম্পানির কার্যনির্বাহক সমিতি দূরপ্রাচ্যের ব্যবসার জন্য একজন স্থায়ী অধ্যক্ষ বা গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করে। তাঁকে বাণ্টামেই থাকতে হত। এই বর্বর কোয়েন সেখানকার চতুর্থ অধ্যক্ষ। তার অত্যাচার থেকে কেউ রেহাই পায় নি, না ইউরোপীয় বণিকের দল, না দেশী অধিবাসী, না পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য বণিক সম্প্রদায়।

এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেকালে আর কে প্রতিবাদ করবে? পোর্তুগীজের তখন পড়ন্ত অবস্থা; তারা এ অপমান ও অত্যাচার সহ্য করে নিল। দেশী লোকেরাই বা আর কি করবে? শুধু ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গেল ইংরেজের।

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে ইংলণ্ডের সিংহাসনে ছিলেন পরপর রাজা জেমস্ ও রাজা চার্লস্। তাঁদের কাছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথারীতি আবেদন নিবেদন পাঠানো হল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ-ই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইলেন না বা পারলেন না। ফলে, নিরঙ্কুশ দুর্দান্ত কোয়েনের অত্যাচারে যতি বা বিরতি পড়ল না।

এই বাদ প্রতিবাদের শেষ হল ইংলণ্ডের রাজনীতিক-প্রধান, প্রাজ্ঞ ক্রমওয়েলের আমলে—সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে। ক্রমওয়েল জবরদস্ত লোক; ইংরেজের বাণিজ্য-প্রসারের জন্য তাঁর চেষ্টাও ছিল অপরিসীম। তিনি আম্‌বয়নার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিলেন ডাচদের থেকে খেসারতি আদায় করে। এটা সম্ভব হল খানিকটা তাঁর ক্ষাত্রতেজে, খানিকটা তাঁর কূটনীতিতে। ফলে, ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিক সম্প্রদায় তাঁর কাছে হয়ে রইল অশেষ কৃতজ্ঞ।

দূরপ্রাচ্যের দ্বীপগুলিতে হিন্দুস্থানের মালাবার পাঠাত কাপড় আর চীন যোগাত চাল। চালের খোঁজে ডাচ গেল চীনে আর

কাপড়ের খোঁজে হিন্দুস্থানের মালাবারে। চীনে গিয়ে পেল তারা সিল্ক, চিনি, চা, ও পোর্সেলিন। আবার মালাবারে ও পরে লংকায় এসে প্রতিদ্বন্দ্বী পোর্তুগীজ ও ইংরেজদের হটিয়ে দিয়ে লংকা ও হিন্দুস্থানের সমস্ত পণ্য সংগ্রহের চেষ্টায় ব্রতী হল।

এর পূর্বেও অবশ্য হিন্দুস্থানের প্রধান বন্দর সুরাটে ডাচদের কাজ কারবার হত। কিন্তু তার গতি ছিল মন্দা ও মন্থর। ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল সুরাটে। ব্রোচ, ক্যাম্বে, আহ্‌মদাবাদ, বুরহান্‌পুর, প্রভৃতি গঞ্জে ছিল তার শাখা। মোগল বাদশাহের রাজধানী আগ্রায়ও তাদের আড়ত ছিল। ইংরেজরাও তখন বাণিজ্য করবার জন্য হিন্দুস্থানে ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাচের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে নি। একে তাদের মূলধন ডাচের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, আবার ডাচের বাণিজ্যের রীতিপদ্ধতিও অন্য সব বণিকজাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। ইংরেজ ও ডাচের মধ্যে এ প্রভেদ ছিল সূর্যালোকের মত স্পষ্ট। মোগল বাদ্‌শা জাহাঙ্গীরের দরবারে সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে ইংলণ্ডের রাজার প্রতিভূ হয়ে এসেছিলেন স্যার টমাস রো। তিনি ডাচের সঙ্গে ইংরেজের তুলনা করে ক্ষোভে যা বলেছিলেন তার মর্ম এই যে ঘুষ, ঘুষি বা তৎপরতা যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, ডাচের কাছে ইংরেজ দাঁড়াতেই পারবে না।

ডাচেরা এ সকল কেন্দ্র থেকে খরিদ করত কাপড়, গুজরাটের বিখ্যাত কার্পেট, মণিমুক্তা, হস্তিদন্তে নির্মিত শতরঞ্জ খেলার ছক, নানা অলঙ্কার, বোতাম, খাদ্যশস্য, তেল, ঘি, নীল, আফিং, ভাং ও হরীতকী। এর মধ্যে নীলই ছিল সর্বপ্রধান। হরীতকীর ব্যবহার হত ভেষজ ও রং তৈরিতে আর পশুচর্ম শোধনে। এরা বিক্রি করত নানারূপ মসলা, চিনি, কর্পূর, সিল্ক, সাটিন, পোর্সেলিন, চন্দনকাঠ প্রভৃতি।

সুরাট থেকে বহু জিনিস চালান যেত পারস্যে, বিখ্যাত বন্দর অরমুজ বা হরমুজ হয়ে। এ বন্দরটি ছিল পোর্তুগীজদের দখলে। পোর্তুগীজদের পড়ন্ত অবস্থায় এদিকে প্রথম নজর পড়ে ইংরেজের। ইংরেজের সহায়তায় পারস্যের বাদশাহের স্থানীয় প্রতিভূ সে বন্দর

পোর্তুগীজের হাত থেকে উদ্ধার করেন ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমকালেই ইংরেজ ও ডাচ উভয়েই সে বন্দরে কাজ কারবার করার অধিকার পেয়ে যায়। বাণিজ্যে ডাচ ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ, তাই এরাই অচিরে সে বন্দরের প্রধান বণিক হয়ে উঠে।

পারশ্যের বাদশাহের ছিল সিল্কের কারবার। সে সিল্ক ইউরোপের বাজারে বিক্রি করবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। ডাচেরা সে কাজের ভার গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলল। তারা পারশ্যে নানা জিনিস বিক্রি করত। এর মধ্যে প্রধান ছিল চীন ও বাংলা দেশের চিনি, নানাপ্রকার মসলা, হিন্দুস্থানের কাপড়, আদা, চা, পোর্সেলিন ও তামাক। ডাচদের সর্বাপেক্ষা লাভের ব্যবসা ছিল ব্যাটাভিয়ায়, তারপরেই পারশ্যে।

মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জ থেকে পোর্তুগীজ ও ইংরেজকে হটিয়ে দিয়ে ডাচেরা দৃষ্টি দিল মালয়ের দিকে। সেখানে মালাক্কায় পোর্তুগীজদের একটা বড় আস্তানা ছিল। পোর্তুগীজদের বিধ্বস্ত করে সে আস্তানা তারা দখল করল ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সেখানে ব্যবসা করতে গিয়ে দেখা গেল যে, সে দেশে মসলা পাওয়া যায় শুধু হিন্দুস্থানের কাপড়ের বিনিময়ে; অর্থমূল্যে তা মেলা দুষ্কর। প্রকৃতপক্ষে এই 'কালিকটের কাপড়', যার অপভ্রংশ 'ক্যালিকো', সারা দূরপ্রাচের দ্বীপগুলিতে এক মহা আদরের সামগ্রী। ইউরোপেও এর কদর ছিল।

এ সব কাপড়ের বেশির ভাগই পূর্বে তৈরি হত হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলে, বিশেষ করে গুজরাটে। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে সে দেশে এ ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল। ১৬৩০-১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র গুজরাট নিদারুণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে উজাড় হয়ে যায়; হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলে এত প্রচণ্ড ও ব্যাপক দুর্ভিক্ষ আর কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। এ ফলে সে দেশে তাঁতির বংশে বাতি দিতে আর কেউ রইল না।

এর পরে কাপড়ের বাজার এসে বসল পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজে। সুরাটের বন্দর থেকে প্রচুর নীল নানা দেশে রপ্তানি হত, কিন্তু

প্রায় ওই একই কালেই এর চাহিদায়ও মন্দা পড়ে এল, কারণ আমেরিকার কোলঘেঁষা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে ইউরোপে নীল চালান হল আরো সস্তা দরে। কাজেই পশ্চিম উপকূলের সুরাট প্রভৃতি বন্দরের গৌরব কিছু কমে গেল আর ডাচ ইংরেজ প্রভৃতি সকল বণিকেরই দৃষ্টি পড়ল পূর্ব উপকূলের দিকে।

ডাচেরা দক্ষ বণিক। তারা হিন্দুস্থানের সুতার টানে এদেশে এসে মোটামুটি হিন্দুস্থানে তাদের ব্যবসার একটা ছক কেটে ফেলল। তাদের লক্ষ্য ব্যবসায় একাধিপত্য লাভ, তাই প্রথম থেকেই তারা ছয়টি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করল। এক, কোরোমণ্ডল উপকূল বা মাদ্রাজ; দুই, বঙ্গোপসাগরের বন্দর; তিন, আরাকান ও বর্মা; চার, সিংহল বা লংকা; পাঁচ, মালাবার উপকূল আর ছয়, সুরাটকে কেন্দ্র করে উত্তর-পশ্চিম হিন্দুস্থান, আরব ও পারশ্য। সুরাটের বন্দর থেকেই ডাচেরা আরবের বাজার এডেন, মোচা প্রভৃতি বন্দরে যেত। আরবে মাল বিক্রি হত নগদ মূল্যে; সেখানে পাওয়া যেত সোনা ও রূপা।

কোরোমণ্ডলের মসুলিপট্টম্, পেটাপোয়েলি ও পুলিকটে এরা ক্রমে স্থায়ী হয়ে বসল। মসুলীপট্টমের আশপাশে নানা ধরনের সাদা ও রঙিন কাপড় তৈরি হত—টাফেটা, পারকেল, পাগড়ীর কাপড় মল্‌মল্। গোলকুণ্ডায় লোহা ও ইস্পাতের কারখানা ছিল; সে মাল মসুলীপট্টমের বন্দরে আসত গরুর গাড়িতে। তারই কাছে কৃষ্ণা নদীর মোহনায়, পন্নিপিলিতে ডাচেরা একটা পেরেকের কারখানা করেছিল। তাদের সব জাহাজ মেরামত হত সে বন্দরে। পুলিকটের রঙিন শাড়ীর নাম ছিল পিণ্টাডো; এর নামডাক ছিল।

এ সব বন্দরে ডাচেরা বিক্রি করত নানা মসলা, সীসা, টিন, পারদ, সিভেট্ বা মৃগনাভির মত এক প্রকার সুগন্ধ জান্তব দ্রব্য, কর্পূর, গন্ধক, ফটকিরি, সিঁদুর ও পোর্সেলিন। আর সারা উপকূল জুড়ে চলত ক্রীতদাসের ব্যবসা; এতে সবাই মত্ত থাকত—ডাচ, ইংরেজ, পোর্তুগীজ ও হিন্দুস্থানী। কালক্রমে ইংরেজদের প্রাধান্য হল মসুলীপট্টমে। ডাচ কারিকলের কাছে নেগাপট্টমে এসে আস্তানা গাড়ল।

এদিকে বাংলার নবাব পোর্তুগীজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক্রমশঃ ডাচের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। তিনি তাদের হুগলিতে বাণিজ্য করবার অধিকার দিলেন ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সুবা বাংলা বিহারে ডাচের কারবার বেড়ে উঠে আরো পনের ষোলো বছর পরে।

আরাকান ও পেগুর মধ্যে ডাচেরা বাণিজ্য করত সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই। তাদের আড়ত ছিল দিয়াংগায়—যে গঞ্জের কথা পোর্তুগীজ-পর্বে বলা হয়েছে। আরাকানের দস্যুর দল, পোর্তুগীজ ও মগ, বাংলা দেশ থেকে মানুষ ধরে এনে এখানে ক্রীতদাসের ব্যবসা করত। এ ছাড়া আরাকানে পাওয়া যেত মোম, নীল, চাল, আর একপ্রকার সুন্দর লাল রং। পেগুতে পাওয়া যেত সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত, মধু, চাল আর খনিজ তেল। সে তেল ব্যবহৃত হত বাতের মালিশ হিসাবে।

লংকার দারুচিনির ব্যবসা ছিল পোর্তুগীজদের একচেটিয়া। কিন্তু তাদের দারুণ অত্যাচারে শুধু দেশের লোক নয়, স্বয়ং রাজাও ছিলেন উত্ত্যক্ত। তিনি পোর্তুগীজদের তাড়াবার জন্য ডাচকে নিমন্ত্রণ করেই আনলেন। লোভ দেখালেন যে পোর্তুগীজ চলে গেলে, লংকার সমস্ত ব্যবসা তাদের দখলে আসবে। ডাচ পোর্তুগীজকে উৎখাত করবার চেষ্টা শুরু করল ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে লাগল আরো আঠারো বিশ বছর। এর পর লংকার দারুচিনি, মণিমুক্তা ও হাতীর ব্যবসা ডাচের হাতে এল। এ ছাড়া তারা আরো পেল সেখানকার নানা আয়ুর্বেদীয় লতাগুল্ম।

এরও প্রায় বিশ বছর পরে তারা কালিকটে এসে জুটল। জামোরিনের সঙ্গে তাদের পূর্ব চুক্তিগুলির শর্ত ঝালিয়ে নিয়ে পোর্তুগীজের সঙ্গে শুরু করল সরাসরি লড়াই। প্রথমেই আক্রমণ করল কোচিন ও কুইলন, ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

কোচিনে ডাচদের সঙ্গে হেরে গিয়ে পোর্তুগীজেরা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। এ যুদ্ধে তাদের ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যাবে। পোর্তুগীজদের মারা গেল প্রায় দেড় হাজার

সৈন্য; হয় ধ্বংস নয় হস্তান্তরিত হল প্রায় দেড় শ জাহাজ; আর বিত্তনাশ যা হল তার পরিমাণ প্রায় ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড। এই সর্বনাশের ফলে পোর্তুগীজের আর শুধু হিন্দুস্থানে কেন, সমগ্র দূরপ্রাচ্যেই, দাঁড়াবার স্থান রইল না।

কোচিনের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ডাচেরা মালাবারে পোর্তুগীজদের আসন দখল করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে পেল গোলমরিচ ও দারুচিনি ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার। কিছু কার্পাসবস্ত্র সংগ্রহেরও ব্যবস্থা হল।

কিন্তু পোর্তুগীজদের মত ডাচদের সাথেও জামোরিনের বনিবনাও হল না। জামোরিন দাবী করলেন যে কোচিনের রাজাকে আগের মত তাঁর পুরোপুরি তাঁবেদার করে দেয়া হোক। ডাচেরা এতে রাজী হল না। রাজী হলে দু রাজার বিরোধের ফাঁক দিয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেওয়া চলে না। এই নিয়ে আবার তাদের সাথে জামোরিনের বাদ-বিসম্বাদ চলল অনেক কাল। জামোরিনকে কাবু করবার জন্য ডাচদের অনেক সাদা ও কালো সৈন্যসামন্ত বাড়াতে হল। সাদা আসল হল্যাণ্ড থেকে, কালো জাভা থেকে। শেষ পর্যন্ত জামোরিনকে হার মানতে হল চেতওয়ারীর যুদ্ধে।

এর পরের ঘটনাটুকু সংক্ষেপে বলে ডাচদের মালাবারের ইতিহাস শেষ করা যাক।

মালাবারে ডাচদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল গোলমরিচ সংগ্রহের একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু তখন ইংরেজ ও ফরাসী দু-ই এসে জুটেছে সে দেশে, আর ছোটখাট রাজাদের সঙ্গে মিতালি করে গোলমরিচ সংগ্রহও করছে। তাই ডাচেরা ভাবল, কোচিন রাজার মত সবাইকে পদানত করতে পারলে গোলমরিচ সংগ্রহের কাজে আর কোন অন্তরায় ঘটবে না। তাই তারা ক্রমাগত নিজেদের সৈন্যবল বৃদ্ধি করতে লাগল। যথেষ্ট অর্থব্যয় করে সৈন্যবল বৃদ্ধি হল বটে, কিন্তু তাদের সে আশা আর সফল হল না।

মসলার গন্ধে ডাচ চলে গিয়েছিল দূরপ্রাচ্যে, কিন্তু হিন্দুস্থানের সুতার টানে তাদের ফিরে আসতে হল এদেশে। বিধ্বস্ত

পোর্তুগীজ তাদের রাস্তা ছেড়ে দিল, কিন্তু পুরনো শত্রু ইংরেজ এখানে দেখা দিল এসে প্রতিযোগীরূপে।

ডাচেরা মালাবারে ঢুকবার সাথে সাথে ইংরেজও এসে মালাবারের তেল্লিচেরিতে ঘাঁটি বাঁধল। তারপর চলল ইংরেজের সাথে ডাচের রেষারেষি; মালাবারে এ দ্বেষের কখনো শেষ হয় নি।

ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য তেল্লিচেরি ও কালিকটে বেশ জোরালো হয়ে উঠল। তারপর ফরাসী এসে তাদের আড়ত তৈরি করল পাশের মাহে বন্দরে। এবার প্রতিযোগী হল দু দল। কাজেই ডাচের পক্ষে সারা মালাবারের মধু সংগ্রহ করা ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

তবু ইংরেজ ও ফরাসীর সঙ্গে মোটামুটি পাল্লা দিয়ে ডাচেরা মালাবারে প্রায় ষাট বছর কাটিয়ে দিল। কিন্তু এর পরে তারা পড়ল কুগ্রহের ফেরে। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ত্রিবাঙ্কুরের রাজার সাথে যে চুক্তি করল তা-ই বোধ হয় হিন্দুস্থানে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে এদেশের রাজার প্রথম চুক্তি। সে চুক্তির ফলে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা পেল ইংরেজের গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র; ইংরেজ পেল ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে মসলা ক্রয়ের অনুমতি। ডাচেরা ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার সঙ্গে করল প্রবল কলহ। ফলে তাদের এদেশের ব্যবসা প্রায় রসাতলে যাবার যোগাড় হল। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে তারা মালাবার থেকে প্রায় বিশ লাখ পাউণ্ড গোলমরিচ সংগ্রহ করেছিল; এর বছর বিশেক পরে প্রতি বছরে তাদের পাঁচ লাখ পাউণ্ড সংগ্রহ করাও দায় হয়ে পড়ল।

এরও অনেক পরে, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে, মহীশূরের রাজা হায়দর আলীর পুত্র টিপু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করলেন। তখন ইংরেজ হিন্দুস্থানে সাবালক হয়ে গেছে; ত্রিবাঙ্কুরের রাজা তাদের হাতধরা। এ যুদ্ধে টিপুর হল পরাজয় আর তার ফলে ইংরেজ মালাবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। ডাচেরা অনন্যোপায় হয়ে মালাবারে ব্যবসার পাট গুটিয়ে ফেলল।

এবার তাদের সুবা বাংলা বিহারের বাণিজ্যের কথা বলা যাক।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে মোগল সাম্রাজ্যের এই পূর্বাঞ্চলে তাদের কাজকারবার বেড়ে ওঠে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে; এর পূর্বে

বছর ষোলো তাদের ব্যবসা চলত নিতান্ত ঢিমা তেতালায়। তাদের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের ব্যবসার মূল কেন্দ্র ছিল ব্যাটাভিয়া; হিন্দুস্থানের বাণিজ্যেরও প্রকৃতি ও গতি নিয়ন্ত্রিত হত সেখান থেকেই। এ বছর সে মূল কেন্দ্র থেকে বাংলা ও পেগু অর্থাৎ বার্মার রেঙ্গুন এলাকা সম্পর্কে যে আদেশ জারি করা হয় তার মর্ম এই যে, এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ বাংলার সিল্ক দিয়ে জাপানের চাহিদা মেটাতে হবে। জাপানের বাজার এরা দখল করেছিল পোর্তুগীজদের হাত থেকে।

এর ফলে বাংলা দেশে ডাচদের ব্যবসা বাড়তে থাকে। চুচুঁড়াতে তাদের আড়ত তৈরি হয় সম্ভবতঃ ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে; তারপর তারা ছড়িয়ে পড়ে সারা পূর্বাঞ্চলে। বালাসোর (উড়িষ্যা), পাটনা, ফতোয়া (বিহার), ঢাকা, মালদহ, কালিকাপুর (মুর্শিদাবাদ) ও বরাহনগরে (কলিকাতা) তাদের ছোট বড় নানারূপ ফ্যাক্টরি বসে যায়। ক্রমে মাকড়সার জালের মত তাদের বাণিজ্যতন্তু ছড়িয়ে পড়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে। এর কারণ ছিল।

সেকালে বস্ত্র-বয়নই ছিল সুবা বাংলার প্রধান শিল্প। সিল্ক ও কার্পাস উভয় প্রকার বস্ত্র বয়নেই বাংলার তাঁতির জুড়ি ছিল না। তাঁতিরা কিন্তু সবাই শহরে এসে বাস করত না। বেশির ভাগই বাস করত গ্রামে। তাই তাদের কাছ থেকে ভালো ও সস্তা কাজ পেতে হলে ব্যবসায়ীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাদের দাদন দিয়ে আসতে হত। সেকথা বুঝেছিল ইংরেজ, সেকথা বুঝেছিল ডাচ। কাজেই তারা তাঁতিদের বড় বড় গ্রামে তাদের আড়ত বা ফ্যাক্টরি খুলে বসল। সেখানে তাঁতিদের কাছে কাপড় কিনে আড়তে মজুদ করা হত; আবার তাঁতি খাটিয়ে নিজেরাও কাপড় তৈরি করাত। পলাশীর যুদ্ধের পর এরূপ ফ্যাক্টরির সংখ্যা অভাবিতরূপে বেড়ে যায়, অবশ্য ইংরেজের। এর ফলে গ্রামে গ্রামে কুৎসিত বাজারে-আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়ে দেশের লোকের ও বিদেশীদের নানা অশোভন ও অসংযত আচরণ বৃদ্ধি পায়। তাঁতিদের উপর জুলুম জবরদস্তিও চলতে থাকে। নবাব মীরকাশিম এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ইংরেজ-দরবারে যা লিখেছিলেন তার মর্ম এই যে তাঁর এলাকায়

সম্প্রতি চার-পাঁচশ নূতন ফ্যাক্টরির সৃষ্টি হয়েছে। এতে দেশের লোক যে কিরূপ নির্যাতিত হচ্ছে তা বর্ণনা করা তাঁর সাধ্যাতীত।

বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন বা এ অত্যাচারের কোন প্রতিকার হয় নি।

ইংরেজ বাংলা দেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ পলাশীতে শক্তিপরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত, ডাচ ও ইংরেজ এদেশে পাশাপাশি বসে দেশের রসে সমভাবেই পুষ্টিলাভ করেছে। কেউ কাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে নি। ইংরেজের অনুরূপ ফ্যাক্টরি ছিল ডাচের; এদের কালিকাপুরের সিল্ক ফ্যাক্টরিতে সাত আট শ দেশী লোক কাজ করত।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে ডাচেরা বাংলায় চালের কারবার করেও বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এ ব্যবসায়ে লাভ হত প্রচুর, নবাবের ক্রমবর্ধমান কর মিটিয়েও। এ চাল তারা বিক্রি করত দূর-প্রাচ্যের দ্বীপগুলিতে; কখনো বা লংকায়, এমনকি আরো দূরে মল্‌ডাইভ দ্বীপপুঞ্জে।

ডাচেরা বিহার থেকে সংগ্রহ করত সল্টপিটার, অর্থাৎ পটেসিয়াম্ নাইট্রেট। এ ব্যাপারে তারাই ছিল অগ্রণী। বিহারের সমস্ত মাল খরিদ করে এরা ইংরেজ ও ফরাসীকে যার যার হিস্যামত অংশ ভাগ করে দিত। অনেক কাল ধরে এই যৌথ ব্যবসায়ই প্রচলিত ছিল। ব্যবসাবুদ্ধি ও রীতি, শৃঙ্খলাবোধ ও বিপুল অর্থবলের জন্য এদের প্রতিযোগীর দল, অর্থাৎ ইংরেজ ও ফরাসী, এদের কাছেও ঘেঁষতে পারত না। শেষের দিকে এদের নেতৃত্বে বিদেশী বণিক-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতাও যেন ক্রমশ কমে আসছিল। কিন্তু নাটকের পরিসমাপ্তি হবার কথা অন্যরূপে; নইলে পলাশীর অভিনয়ের জন্য ইংরেজ নায়কের প্রয়োজন হল কেন?

এতগুলি ঘাঁটির মধ্যে একমাত্র চুচুঁড়া ও বরাহনগরেই ডাচদের নিজস্ব একটুকরা জমি ছিল। সে জমি তারা যুদ্ধ করে দখল করে নি; পেয়েছিল নবাবের কাছে দরবার করে। কিন্তু সেইটুকুও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। কি করে তা হল, সেকথা পরে বলা যাবে।

ইউরোপের বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব ঘটল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের বত্রিশ বছর পরে। এর কিছু আগে সে মহাদেশে যে বড় দুটি দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা আছে তার একটি অষ্ট্রিয়ার রাজসিংহাসন নিয়ে, অন্যটি আমেরিকার স্বাধীনতা সম্পর্কে। এসব বিরোধের কারণে আমাদের প্রয়োজন নেই। প্রথমটিতে ডাচ ও ইংরেজ ছিল একদলে, ফরাসীর বিপক্ষে। কিন্তু অন্যটিতে ফরাসী ও ডাচ দু-ই ছিল ইংরেজের প্রতিপক্ষে। ইউরোপের এসব দাঙ্গাহাঙ্গামার ঢেউ বিদেশী সমুদ্র পার হয়ে এসে তোলপাড় তুলত এদেশের সমুদ্রে। তার ফলে এই বিভিন্ন জাতির বণিকগোষ্ঠী সুযোগ পেলেই এদেশে প্রতিপক্ষের বিত্ত-ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করে নিতে দ্বিধা করত না।

অষ্ট্রিয়ার হাঙ্গামা শুরু হয় পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সতেরো বছর আগে। এদেশে তার সাক্ষাৎ ফল দেখা যায় ইংরেজ ও ফরাসীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে কর্ণাটে অর্থাৎ, মাদ্রাজে, ও বাংলায়।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ বাধে পলাশীর যুদ্ধের তেইশ বছর পরে। সে হাঙ্গামায় ইংরেজের বিপক্ষে যোগ দিয়ে, ইংরেজের কোপানলে, হিন্দুস্থানে ডাচদের সমস্ত সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়ে যায়। অবশ্য এই যথাসর্বস্বের মূল্য তখন আর খুব বেশি ছিল না। কারণ ডাচেরা ব্যবসায়ী হিসাবে সেকালে ইংরেজের প্রায় তাঁবেদার হয়েই ছিল।

নবাব সিরাজোদ্দৌল্লা তাঁর ইংরেজ-ধ্বংসযজ্ঞে সাহায্য করবার জন্য ডাচদের আক্রমণ করেন। কিন্তু তারা সে আহ্বানে যথাযোগ্য সাড়া দেয় নি। তারপর নবাব সাহেব একাকীই ইংরেজের কাশিম-বাজার ও কলকাতার কুঠি লণ্ডভণ্ড করেন। কলকাতার কুঠিয়াল ড্রেক কলকাতার কিছু দক্ষিণে ফলতায় গিয়ে আশ্রয় নেন। এসব হাঙ্গামায় কেবল ড্রেককে গোপনে কিছু সাহায্য করা ছাড়া ডাচেরা ইংরেজদের আর কোন সাহায্য করে নি। ফলে, ইংরেজ ডাচের উপর বিষম চটেই ছিল।

তারপর পলাশীর রণরঙ্গ হল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন। সে অভিনয় যে কোনো-একটা গুরুতর ব্যাপার একথা ডাচেরা মনেই করতে পারল না। কলকাতার ডাচ-প্রধান বিস্‌ডম্‌ ক্লাইভকে পলাশী

বিজয়ের জন্য অভিনন্দন পাঠালেন ১০ই জুলাই অর্থাৎ ঘটনার এক পক্ষকাল পরে! তা ছাড়া ইংরেজের হাত-ধরা নবাব মীরজাফরকে খুশী করতে ডাচেরা বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করল না; ফলে, তিনিও হলেন এদের উপর বিষম নারাজ।

তাই, ইংরেজ এবার সুযোগ পেয়ে বাংলা থেকে ডাচদের উৎখাত করবার চেষ্টা করল।

এদিকে ডাচেরাও ক্রমে পলাশী-যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছিল। হয়ত ইংরেজের প্রতিপত্তি নষ্ট করবার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম; ক্লাইভের ভাগ্যে তখন নানা গ্রহের শুভ-সংযোগ।

ইংরেজ হুগলীতে (চুঁচুঁড়ায়) ডাচদের আক্রমণ করে বসল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। যুদ্ধ হল বিদোরার মাঠে; চন্দননগর ও চুঁচুঁড়ার মাঝখানে। ডাচের দলে ছিল ভাড়াটে ফরাসী কর্নেল রৌসল্, শ সাতেক ইউরোপীয় ও অনুরূপ মালয়ের সৈন্য আর তার সঙ্গে কিছু এদেশী। ইংরেজের দলে ছিল শ তিনেক ইউরোপীয় পদাতিক, জন পঞ্চাশেক অশ্বারোহী আর শ আটেক দেশী সৈন্য। এই হাজার তিনেক লোকের দাঙ্গা-হাঙ্গামা আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা হল বিপুল। এ যুদ্ধে ডাচেরা একেবারে হেরে গেল।

বিদোরায় হেরে গিয়ে ডাচেরা বাংলায় আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না। ইংরেজ তখন বাংলার মহামহিমান্বিত। ডাচেরা বহুদিন তাদের উচ্ছিষ্টভোজী হয়ে বাংলার মাঠে, ঘাটে ঘুরে বেড়াল। সেকালে তারা নিজেরাই নিজেদের যে চিত্র এঁকেছে তা এইঃ হুগলীতে আমাদের একটি দুর্গ আছে বটে, কিন্তু তার জন্য এত নজরানা দিতে হয় যে একে আর দুর্গ বলা চলে না, বলা যায় ফ্যাক্টরি বা আড়ত। ডাচেরা এখানে সাধারণ ফ্যাক্টর মাত্র। বাংলা থেকে যে সকল পণ্য রপ্তানি হয়, তার মধ্যে নানাপ্রকার কার্পাস বস্ত্র, সিল্ক, আফিং ও পোটেসিয়াম নাইট্রেটই প্রধান। কিন্তু ইংরেজেরা কিনে নেবার পর ঝড়তি-পড়তি যা থাকে সে সব বকেয়া নিকৃষ্ট মালই পায় ডাচেরা। এমনকি আমাদের এদেশে বসবাসও ইংরেজের মর্জির উপর নির্ভর করে।

কাজেই আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ডাচেরা যখন ইংরেজের বিরোধিতা করল তখন হিন্দুস্থানে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল অতিশয় মন্দা। ইংরেজ এদেশে ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে বসল।

সন্ধি হল বছর দুই পরে। সে সন্ধির শর্ত অনুসারে ডাচ সমস্ত সম্পত্তিই আবার ফিরে পেল। তবে বাংলায় বরাহনগরের বদলে তাদের হুগলিতেই একটু বেশি জমি দেওয়া হল। ইংরেজ বরাহ-নগরের দখল ছাড়ল না।

কিন্তু হিন্দুস্থানে ডাচের জীবনী-শক্তি তখন প্রায় নিঃশেষিত। যেমনি বাংলায়, তেমনি মালাবারে। মৃতকল্প হয়েও তারা আরো কিছুদিন বেঁচে রইল।

এদিকে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী হল্যাণ্ড দখল করে বসল; তাই ডাচ ইউরোপে হল ইংরেজের শরণাপন্ন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের বাংলার চুঁচুড়ার কুঠিটি ইংরেজদের হাতেই সমর্পণ করতে হল। সে হস্তান্তর ঘটল ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে। হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলে ডাচ আগেই অবলুপ্ত হয়েছিল; এবার হল পূর্বে।

ডাচ ও ইংরেজ হিন্দুস্থানে এসেছিল প্রায় একই সময়ে। কিন্তু সেকালে পৃথিবীর মধ্যে ডাচেরা নৌবলে ছিল অদ্বিতীয়। অর্থবলেও তারা ইংরেজের চেয়ে ছিল অনেক বেশী শক্তিমান। তাদের বাণিজ্য-বুদ্ধি ও পদ্ধতির অনুকরণ করত ইংরেজ। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, দর্শনে হল্যাণ্ড সেকালে ছিল ইংরেজের আদর্শস্থানীয়। হল্যাণ্ডের লিডেন ইউনিভারসিটির বিদ্যা-খ্যাতি ছিল বিশ্ববিশ্রুত। শিল্পী রেমব্রাণ্ডট, হলস, ভার্মির প্রভৃতি সেকালেই জন্মেছিলেন হল্যাণ্ডে; দার্শনিক স্পিনোজা ও আইন-কানুনের স্রষ্টা গ্রেটিয়াসও সে কালেরই। সপ্তদশ শতকে ডাচ ছিল ইংরেজের শিক্ষাগুরু। ইংরেজের সামাজিক ইতিহাসের প্রখ্যাত রচয়িতা ট্রেভেলিয়ান এই ঋণ স্বীকার করে বলেছেন, সেকালে ইংরেজ ধর্ম, রাজনীতি, কৃষি, জলসেচ, উদ্যানরচনা বিদ্যা, বাণিজ্য, নৌবাহবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পের পাঠ নিত হল্যাণ্ডের কাছে।

অর্থাৎ, ডাচদের সঙ্গে সেকালে ইংরেজের কোনো তুলনাই চলত না। তথাপি হিন্দুস্থানে জয়ী হল ইংরেজ আর, অপমানিত হয়ে ফিরে গেল ডাচ।

ঐতিহাসিকেরা এই স্পষ্ট অসঙ্গতির কারণ সম্পর্কে যা বলেছেন আমরা মোটামুটি সে কথারই অনুসরণ করছি।

ইংরেজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাচ হিন্দুস্থানে এসেছিল বটে, কিন্তু বরাবর তাদের পরম লক্ষ্য ছিল দূর প্রাচ্যের দ্বীপগুলি। প্রথমত তারা হিন্দুস্থানে স্থায়ী হয়ে বসতেও চায় নি এবং ব্যাটাভিয়ায় একছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করে অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার ইচ্ছাও তাদের হয় নি। হিন্দুস্থানে এসেছিল তার সুতার টানে; সে কথা বিশদ করে বলা হয়েছে। ইংরেজ কিন্তু দূর প্রাচ্যে ডাচের তাড়া খেয়ে হিন্দুস্থানকেই প্রধান অবলম্বন বলে ধরে নিয়েছিল। ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ডাচ যদি ভারতবর্ষে আসত, তবে ভারত ইতিহাসে লণ্ডনের যে স্থান তা যে দখল করত আম্‌ষ্টারডাম এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। ইংরেজের স্থান নিত ডাচ।

রোমান ক্যাথলিক পোর্তুগীজদের মত প্রোটেষ্টাণ্ট ডাচ হিন্দুস্থানে খ্রীষ্টধর্ম স্থাপনের জন্য কখনো বদ্ধপরিকর হয় নি। তাই, এ সম্পর্কে কোনো বিসদৃশ কার্য করে তারা সাধারণ জনের বিদ্বেষভাজনও হয় নি। কিন্তু তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে পূর্বাঞ্চলের সর্বত্রই বাণিজ্য বিস্তারের জন্য শস্ত্রবল প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন। দূর প্রাচ্যের দ্বীপগুলিতে নানা অমানুষিক ও নৃশংস কার্য করে এ ধারণা তাদের আরো দৃঢ় হয়। হিন্দুস্থান ও দূর প্রাচ্যের দ্বীপগুলির মধ্যে যে শক্তি ও সংস্কৃতিগত বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান একথা বুঝে উঠতে তাদের বহু বিলম্ব হয়েছে। তাই তারা সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত নিরর্থক এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করে একদিকে অযথা নিজেদের বাণিজ্যব্যয় বৃদ্ধি করেছে অন্যদিকে হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের বিরাগভাজন হয়েছে।

ডাচ কর্তৃপক্ষের একমাত্র চিন্তা ছিল কি করে সর্বত্র টাকায় টাকা লাভ করা যায়। এর কম লাভে তাদের মন উঠত না। তারা

হিন্দুস্থানের উপকূলে শুধু বাণিজ্যই করতে এসেছিল ; এদেশে কোনো অধিনিবেশ স্থাপনের জন্য না ছিল কোনো চিন্তা, না ছিল চেষ্টা।

তারপর পলাশীর রণরঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের নিদারুণ মতিভ্রম ঘটেছিল। এদেশের রাজনীতির স্রোত যে কোন খাতে বইত, তার সন্ধান তারা কোনোদিনই পায় নি। আর পলাশী যে একদিন ইংরেজের সাম্রাজ্য-জয়যাত্রায় হিন্দুস্থানের তোরণ হয়ে উঠতে পারে, এ কল্পনা তারা স্বপ্নেও করে নি। এটা তাদের কর্তৃপক্ষের নিতান্ত অদূরদর্শিতার ফল।

এ ছাড়াও যে আর একটি গুরুতর কারণে তাদের বাণিজ্য এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি তা তাদের কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে অবাধ ও ব্যাপক দুর্নীতি। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই গোপনে নিজ নিজ ব্যবসা করত, বিশেষ করে বাংলার আফিংএর। দূর প্রাচ্যের দ্বীপগুলিতে আফিং এর চাহিদা ছিল প্রচুর আর এ ব্যবসায়ে লাভও হত অপরিমিত। এই গোপন ব্যবসা ক্রমে এত ব্যাপক হয়ে উঠল যে কর্মচারীরা এর জন্য নিজেদের মধ্যে একটা সমবায় কোম্পানি গড়ে তুলে তার নাম দিল, 'ছোট কোম্পানি'। ছোট কোম্পানির কাজ চলত বড় কোম্পানির মূলধনেই। তার লাভ অবশ্য ভাগ বাটোয়ারা হত কর্মচারীদের মধ্যে। কাজেই বড় কোম্পানির ভাগে জমতে লাগল অষ্টরম্ভা। এমন করে কি আর ব্যবসা বাণিজ্য টিকে থাকতে পারে ?

তাই, ডাচের ভাগ্যদেবী তাদের প্রতি হলেন নিদারুণ অপ্রসন্ন ; ডাচকে পরাস্ত ও অপমানিত হয়েই হিন্দুস্থান থেকে ফিরে যেতে হল।

॥ চার ॥

তারপর এল ইংরেজ। ভারতবর্ষের দুই শতকের প্রভু, অধুনাতন সুহৃৎ। তাদের কথা বিশেষভাবে বলবার আগে বাকি তিন দলের কথা একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন। এরা হল ফরাসী, দিনেমার ও বেলজিয়ান। এই বাণিজ্য-নাটে ফরাসীর অংশ ছিল কিছু বড়, আকারে ও গুরুত্বে প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু দিনেমার ও বেলজিয়ানের অংশ নিতান্তই ছোট। তাদের কথা হিন্দুস্থানের মানুষের বেশি মনে থাকবার কথা নয়।

ইংরেজের সঙ্গে দিনেমারদের, অর্থাৎ ডেনমার্কের অধিবাসীদের, পরিচয়, সখ্য ও বিরোধ বহুকালের। ডেনমার্কের ভাইকিং অর্থাৎ জলদস্যুর কথা বিশ্ববিশ্রুত। সে দস্যুদলের আবির্ভাব হয় অষ্টম শতকের একেবারে শেষধাপে। সমুদ্রের কূলে নানা দেশের বন্দরে বন্দরে হানা দিয়ে এরা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল ইতিহাসে তার তুলনা কম। এদের নৌবল ছিল অসাধারণ; নৌবাহবিদ্যা ও জাহাজ নির্মাণে এরা ছিল অদ্বিতীয়।

এই ভাইকিং শব্দটার অর্থ কি তা বলা দুষ্কর। ডেনমার্ক ও নরওয়ের ভাষায় ভিক্ (vik) ও ভিগ্ (vig) বলে দুটি শব্দ রয়েছে। এদের অর্থ, ছোটখাটো ফিঅ্যার্ড (Fjord)। দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরু, সমতলভূমিকে বলা হয় ফিঅ্যার্ড। পণ্ডিতদের অনুমান, হয়তো এই ফিঅ্যার্ডের অধিবাসীদের বলা হত ভাইকিং। এই ভাইকিংদের দল প্রথমে বাস করত সমুদ্রের বুকে, জাহাজে! কিন্তু কালক্রমে এরা স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগল নানা দেশে। ইংলণ্ডে ছিল এদের একটা মস্ত বড় আস্তানা।

ইংলণ্ডের ইতিহাস বিচিত্র। এদেশের আদিম অধিবাসী ব্রিটনদের পরাজিত করে সেল্টস্; তারপরে রোমান রাজারা সে দেশ দখল করে শাসন করেন চার শ বছর। রোমানদের পরে ইংলণ্ড পদানত হয় এ্যাংগল ও স্যাকসনদের। তারপর আসে দিনেমার, তাদের রাজা ক্যানুটের নেতৃত্বে এখন থেকে প্রায় নয় শ পঞ্চাশ

বছর আগে। এই রাজা ক্যান্যুটই ইতিহাসের পাতায় ক্যান্যুট দি গ্রেট বা মহামহিম ক্যান্যুট নামে খ্যাত। ইংলণ্ড ও ডেনমার্কের যুগ্ম রাজা হয়ে ক্যান্যুট ডেনমার্কে ধর্মপ্রচারের জন্য খ্রীষ্টান পাদরী পাঠিয়ে দেন।

রাজা ক্যান্যুটের কালে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও বেশি ছিল দিনেমার বা দিনেমারদের বংশধর।

দিনেমাররা পূর্বাপরই নাবিক জাতি। বহুযুগের অভিজ্ঞতার ফলে ডেনমার্কের জাহাজ ছিল ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ। তারপর, এদের বাণিজ্য চলত মিশর ও ইটালির সাথে—ভূমধ্যসাগরের পথে। দেশের সম্পদ ছিল নানাপ্রকার মূল্যবান কাঠ, একপ্রকার পীতবর্ণ, স্বচ্ছ বনজগুঞ্জিকা যাকে বলা হয় 'অ্যাম্বার বিড্' বা সমুদ্রের সোনা, আর ফ্লিণ্ট বা একপ্রকার অত্যন্ত কঠিন প্রস্তর যা দিয়ে সেকালে তৈরি হত ছুরিকা ও কুঠার।

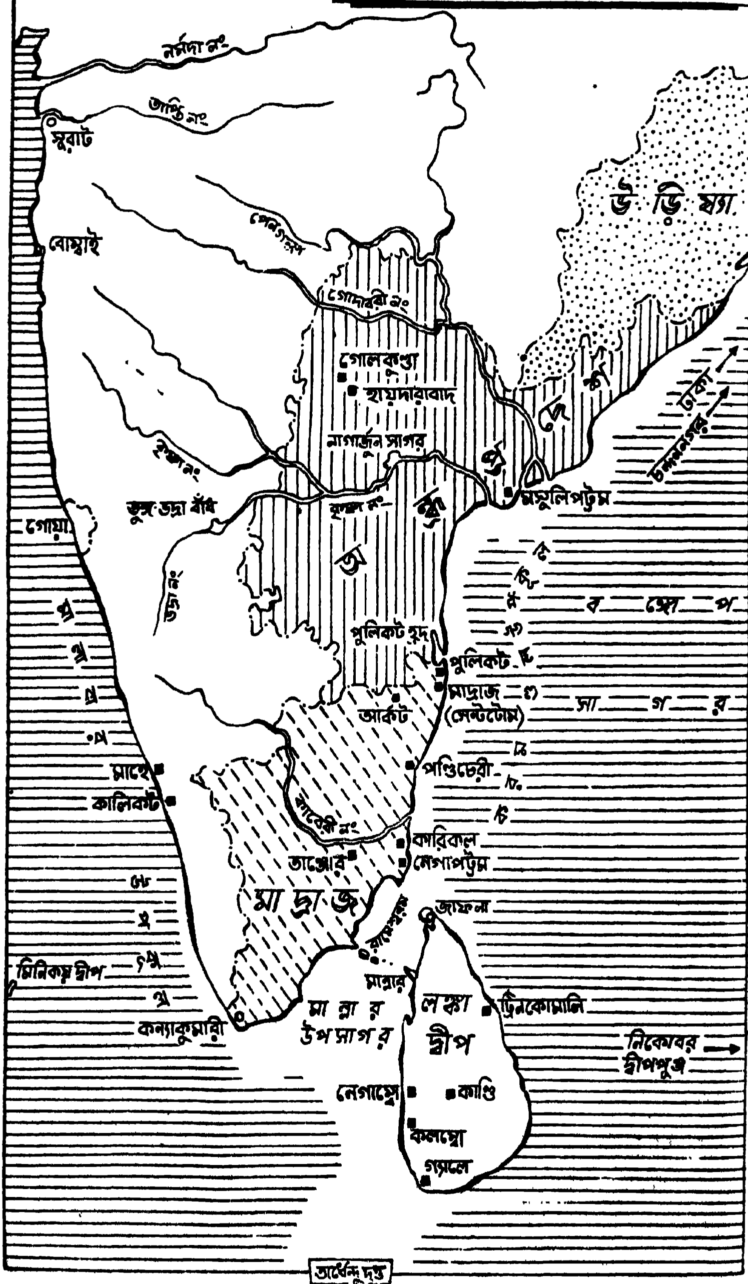
অলঙ্কার হিসাবে এই 'সমুদ্রের সোনা' দিয়ে গড়া মালার বিশেষ চাহিদা ছিল। দিনেমারেরা এই মালা ইউরোপের ঘাটে ঘাটে ফেরি করে বেড়াত। রোম থেকে জাহাজ আসত ডেনমার্কের বন্দরে, পশুলোম, সমুদ্রের সোনা, কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করতে। সঙ্গে সঙ্গে রোমানরা করত ক্রীতদাসের ব্যবসা।

রোমান রাজারা যখন রোম থেকে কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী তুলে নিলেন, তখন দিনেমারেরা আর সমুদ্র ঘুরে ভূমধ্যসাগর দিয়ে নূতন রাজধানীতে যেত না ; যেত রাশিয়ার নদী বেয়ে কৃষ্ণসাগরের পথে।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন। এ বন্দরটির সৃষ্টি করে সেখানে একটি বিরাট নৌবাহিনীর আস্তানা গড়ে তোলেন রাজা হ্যানস পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় পাঁচ শ বছর আগে।

ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ানই দেশের সর্বাপেক্ষা প্রথিত-যশা নৃপতি। এর কাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ান যখন ডেনমার্কের রাজা, তখন ইংলণ্ডে পরপর তিনজন রাজা ও রানীর আমল। রানী এলিজাবেথের পর রাজা



ফরাসীর বাণিজ্য-ক্ষেত্র
নর্মদা নং
তাপ্তি নং
সুরাট
বোম্বাই
উড়িষ্যা
গোদাবরী নং
গোলকুণ্ডা
হায়দারাবাদ
নাগার্জুন সাগর
কৃষ্ণা নং
তুঙ্গভদ্রা বাঁধ
গোয়া
মসুলিপট্টম
পুলিকট হ্রদ
পুলিকট
মাদ্রাজ
(সেন্টটোম)
আর্কট
বঙ্গোপ
সাগর
পণ্ডিচেরী
মাহে
কালিকট
কাবেরী নং
কারিকল
তাঞ্জোর
নেগাপট্টম
মাদ্রাজ
জাফনা
মিনিকয় দ্বীপ
মান্নার
মান্নার উপসাগর
লঙ্কা দ্বীপ
ট্রিনকোমালি
কন্যাকুমারী
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
নেগাম্বো
কাণ্ডি
কলম্বো
গল্লে
ঢাকা
চন্দননগর
অর্ধেন্দু দত্ত

হলেন প্রথম জেমস, তারপর প্রথম চার্লস। রানী এলিজাবেথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ানের বোন ছিলেন প্রথম জেমস এর রানী। তাই তখন ইংলণ্ডের সঙ্গে ডেনমার্কের ছিল বিশেষ সৌহার্দ্য। এই প্রীতির সূত্রেই বোধহয় হিন্দুস্থানে অধিনিবেশ স্থাপনের প্রেরণা পান ডেনমার্কের রাজা। তিনি অ্যাডমিরাল্ জেড্ডাকে পাঠিয়ে দেন হিন্দুস্থানে। জেড্ডা দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরের প্রায় ষাট মাইল দূরে ট্রেন্কুইবার বন্দরে একটা আস্তানা গাড়েন ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি যে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ কিছু করেছিলেন তা মনে হয় না। কারণ, একে তো বাণিজ্যের জন্য পণ্য ও অর্থ সম্বল তাঁর বিশেষ কিছু ছিল না, আবার ইংরেজ বণিকেরা তাদের নিজেদের মালের দাম কমিয়ে দিয়ে এই ক্ষীণপ্রাণ দিনেমারদের সঙ্গে অসঙ্গত প্রতিযোগিতায় নেমে গেল।

এরপরে দিনেমারেরা উড়িষ্যার বালাসোরে ও বাংলার হুগলিতে এসে ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টা করেছিল ১৬৭৩ থেকে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। বাংলার শাসক শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে এদের বিশেষ বনিবনাও হল না, কাজেই ব্যবসারও কোনো সুবিধা হল না। ফলে নিরাশ হয়েই এরা সুবা বাংলা থেকে চলে যায় ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে, অবশ্য 'পুনরাগমনায়'।

ইংলণ্ডের দেখাদেখি তারা আফ্রিকার উপকূলে ক্রিশ্চিয়ানবর্গ, অগষ্টেনবর্গ, ফ্রেডেন্সবর্গ প্রভৃতি ছোট ছোট কয়েকটি ঘাটিও তৈরি করেছিল, কিন্তু কোথাও তাদের ব্যবসা জমজমাট হয় নি। সেগুলি পরে বিক্রি করতে হয়েছিল ইংরেজের কাছেই।

বঙ্গোপসাগরের নিকোবর দ্বীপগুলির দিকেও তাদের দৃষ্টি পড়েছিল ; ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় দশ বছর এখানে তারা কায়েম হতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে কাজেও তারা সফলকাম হয় নি।

বাংলাদেশে পুনরাগমন করে এরা বাসা বাঁধে শ্রীরামপুরে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের মাত্র দু বছর আগে। একে ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসীর সাথে প্রতিযোগিতা করে ব্যবসা করা ছিল দিনেমারদের সাধ্যাতীত, তারপর অচিরেই ইংরেজ শুধু বাংলার কেন, হিন্দুস্থানের সর্বত্রই হয়ে উঠল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই শেষ

পর্যন্ত দিনেমার ইংরেজের কাছেই তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে ঘরে ফিরে গেল। ইংরেজের কাছে ট্রেন্‌কুইবারের ঘাটি বিক্রি করল কুড়ি লক্ষ ক্রোনারে, অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকায়।

এই হল দিনেমারদের প্রাচ্য-বাণিজ্যের মোটামুটি ইতিহাস। বেলজিয়ানদের ইতিহাস আরো সংক্ষিপ্ত।

জাতি হিসাবে বেলজিয়ানরা পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছে মাত্র ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পরে। এর আগে এরা ছিল পরপর স্পেনের, অষ্ট্রীয়ার, ফ্রান্সের ও হল্যাণ্ডের তাঁবেদার। হিন্দুস্থানের সঙ্গে যেকালে এদের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে, সে কালে এরা ছিল অষ্ট্রীয়ান সম্রাটের অধীনে। তবে রাজার প্রভুত্ব অতি উগ্র বা প্রত্যক্ষ ছিল না। শাসনভার ছিল একজন প্রতিভূর হাতে; তাঁর বাসস্থান ছিল ব্রুসেল্‌সে।

কিন্তু দেশের একদিকে প্রবল ফ্রান্স, অন্যদিকে দুর্ধর্ষ হল্যাণ্ড। এ দুটি যুযুৎসু জাতির মাঝে পড়ে দেশের শান্তি হল ব্যাহত আর অর্থনৈতিক অবস্থাও হল ক্রমাগত জীর্ণ। ফলে বেলজিয়ামে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল, কোথাও কোথাও বিদ্রোহের আভাসও। অষ্ট্রীয়ান সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস্‌ তখন সিংহাসনে; তিনি দেশের অর্থস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পরিকল্পনায় মন দিলেন। দেশের বন্দরের মধ্যে প্রধান ছিল অষ্টেণ্ড। পূর্বতন প্রধান বন্দর অ্যান্টোয়ার্পের গৌরব তখন লুপ্তপ্রায়। সম্রাট চার্লস্‌ অষ্টেণ্ড থেকে খাল কেটে নানা দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগের কল্পনা করলেন। আর অষ্টেণ্ডের জনকয়েক বিত্তশালী ও উৎসাহী বণিকের সাহচর্যে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টেণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্টি করলেন। কোম্পানীর মূলধন হল ষাট লক্ষ ফ্লোরিন্‌ বা মোটামুটি পাঁচলক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু প্রথম থেকেই ইংরেজ ও ডাচ সরকার এ পরিকল্পনার হল প্রবল বিরোধী। প্রধানত এদের বিরোধিতার ফলেই, ইউরোপে শান্তিরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রীয়ান্‌ সম্রাট ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ কোম্পানীর জন্মের বছর পাঁচেক পরে, এর কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

এই হল বেলজিয়ানদের দেশের কথা; এবার এদের এদেশে অভিযানের কথা বলা যাক।

কোম্পানি সৃষ্টির বছর খানেকের মধ্যেই এরা বাংলায় এসে উপস্থিত হল, মাত্র তিন-চারখানা জাহাজ নিয়ে। বাংলার নবাব মুর্শীদকুলি খাঁ এদের কলকাতার মাইল পনের উত্তরে, বাঁকিবাজারে, কুটি তৈরি করার অনুমতি দিলেন। এরা প্রথম কাঁচা, অর্থাৎ বাঁশ ও পাতার, ঘর বেঁধে রইল, ক্রমে পাকাবাড়ী তৈরি করল। ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসী এই তিন দলই তখন এদেশে শক্তিমান। তারা সবাই, বিশেষ করে ইংরেজ, এদের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতা করতে লাগল ; আর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবাবকে অর্থে বশীভূত করে এদের বাণিজ্যপথ বিষম কণ্টকাকীর্ণ করে তুলল। এদের বিরুদ্ধে অনুযোগও করল অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের কাছে। তাই অষ্টেণ্ডের বাণিজ্য কোনক্রমেই ফলপ্রসূ হল না। তারপর অষ্ট্রীয়ান সম্রাট তো অল্প দিনের মধ্যেই এদের প্রাচ্যে বাণিজ্য করবার অনুমতিই রহিত করে দিতে বাধ্য হলেন। ফলে হিন্দুস্থানের ব্যবসার পাট গুটিয়ে কোম্পানির বণিকেরা দেশে ফিরে গেল।

এরা এদেশে বাণিজ্য করল সামান্যই, কিন্তু এদের দিয়ে শোরগোল হল যথেষ্ট এবং বেশি হৈ-চৈ করল ইংরেজ। পোল্যাণ্ড থেকেও একালেই দু-একখানা জাহাজ এসেছিল, কিন্তু দিনেমার, অষ্টেণ্ড, পোলিস সব মিলিয়েও এ কয় বছরে সবশুদ্ধ দশ-বারোখানার বেশি জাহাজ সুবা বাংলায় আসে নি।

এবার এল ফরাসীর কথা।

আড়াই শ বছর ধরে হিন্দুস্থানের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের পটভূমিকায় যে নাটকের অভিনয় হয়েছিল, তাতে অংশ গ্রহণ করতে এল ফরাসী প্রায় সর্বশেষে ; কিন্তু শেষে এলেও দিনেমার বা বেলজিয়ানদের মত তাদের অভিনয় তুচ্ছ বা অস্পষ্ট ছিল না ; এমনকি, ভাগ্যের কথা ছেড়ে দিলে, স্থূল বিচারে শুধু তাদের দলপতিদের দূরদৃষ্টির অভাবেই তারা পূর্ণ নায়কত্বের দাবি করতে পারল না।

ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পত্তন হল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। রানী এলিজাবেথ তার উদ্বোধন করলেন। ফরাসী বণিকেরা তা লক্ষ্য করল। এদের মধ্যে একদল La Campagnie desmers

Orientals, তুখানা মাত্র জাহাজ নিয়ে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে বাণিজ্য করতে এল। তারপর আর এক দল এল আরো বছর তিনেক পরে। কিন্তু তাদের মধ্যে কারোরই মূলধনের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না; মালিকদের মধ্যে বাদবিসম্বাদও ছিল। ওদিকে ডাচ তখন হিন্দুস্থানের বাণিজ্যজগতে মহাপরাক্রমশালী; তাদের অর্থবল দেখে ফরাসী বণিকেরা হতাশ হল।

কিন্তু তা বলে তারা একেবারে হাল ছাড়ল না। মাঝে মাঝে আফ্রিকার উপকূলে এসে তারা কিছু কিছু ব্যবসাবাণিজ্য করে যেত। এমনকি তু-একবার দূরপ্রাচ্যের দ্বীপ সুমাত্রা, জাভায়ও মসলার খোঁজ করে এল। তবে তাদের জাহাজ বেশি ছিল না; আর যে কখানা ছিল, তার মধ্যে চার শ কি সাড়ে চার শ টনের চেয়ে বড় জাহাজও ছিল না। তবে ভরসার কথা, মসলার ব্যাপারে লাভ ছিল অবশ্যম্ভাবী; কখনো কিছু কম, কখনো বেশি।

বছর চল্লিশেক তাদের কাজকারবার চলল এমনি ঢিমা তেতালায়। তারপর বিখ্যাত রাজা চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন পাঁচ বছর বয়সে আর পূর্ণ সাবালক হলেন তেইশ বছরে, তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও অছির মৃত্যুর পরে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে। একটানা চুয়ান্ন বছর চলল তাঁর নিরঙ্কুশ রাজত্ব। জগতে কোন রাজা বা রানী আর এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নি। এত বড় সর্বাত্মক সম্রাটও আর কোথাও দেখা যায়নি। সম্রাট ও সাম্রাজ্য তাঁর কাছে ছিল অভেদ; তাই তিনি সর্বদা বলতেন, L'e´tat ce´st moi অর্থাৎ রাষ্ট্র কি? সে তো আমিই! তাই সাম্রাজ্যের যাবতীয় কাজ হত শুধু তাঁরই আজ্ঞায় ও দায়িত্বে।

রাজধানী প্যারিস তাঁর পছন্দ হল না। তিনি নূতন রাজধানী ভার্সেলিসের বা ভার্সাইএর প্রতিষ্ঠা করলেন প্যারিস থেকে ন মাইল দূরে। সেখানে করলেন এক অমরাবতীর সৃষ্টি। দেশের যত সামন্তরাজ এসে বসবাস করতে লাগলেন রাজপ্রাসাদের আশপাশে। শুধু সেখানকার রাজপ্রাসাদই নয়, রাজোত্থানও হল প্রধান দর্শনীয় বস্তু। সে প্রাসাদের নির্মাণশৈলীর অনুকরণ করল সারা ইউরোপ; সে উত্থান ও তার পরিকল্পনা হল সে যুগের পরম আদর্শ।

সেকালে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে, ফরাসী হয়ে উঠল ইউরোপের

অবিসম্বাদী নায়ক। একালেই ফ্রান্সে জন্ম হল বিখ্যাত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ডেকার্ত ও প্যাসকালের, সাহিত্যাচার্য মলিয়রের, ভাষাবিদ্ মলহার্বের। শুধু জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে ও শিল্পেই নয়, এমনকি সৈন্য সংগঠনের ব্যবস্থায়ও ফ্রান্স ইউরোপের পথিকৃৎ হয়ে উঠল। এর পূর্বে ইউরোপে রাজাদের স্থায়ী সৈন্য বলে কিছু ছিল না; দরকার মত বিভিন্ন এলাকার মোড়লদের ধরে হাতিয়ার-শুদ্ধ সৈন্য যোগাড় করা হত। আবার প্রয়োজন শেষ হলে তাদের বিদায় দেওয়া হত। ফ্রান্সই একালে প্রথম স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করল। ক্রমে সে সৈন্যসৃষ্টির আদর্শ গ্রহণ করল সর্বদেশ।

এই সর্বাত্মক সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর কালেও যে কয়জন রাজ-উপদেষ্টা কিছু কিছু প্রভুত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোলবার্ট প্রায় সর্বশীর্ষে। এঁরই একান্ত চেষ্টার ফলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য রাজশক্তির সাহায্য পেল। কোলবার্টের এই চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সহজেই ফলপ্রসূ হল সম্রাটের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে।

এর কিছু আগে থেকেই ইউরোপের নানা দেশের রাজাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে রাজশক্তির প্রকৃত প্রতীক হল অর্থবল, সৈন্যবল নয়। দেশের অর্থাগম হয় চাষে, শিল্পে ও বাণিজ্যে। কাজেই রাজশক্তির পক্ষে দেশের চাষ, শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তার ও সংহত করার চেষ্টা অপরিহার্য কর্তব্য; এই মতবাদকে বলা হয় মার্কেণ্টাইলিজম্ বা বণিকদৃষ্টি। কালক্রমে ইউরোপে এ মতবাদের রূপ কিছু বদলেছে বটে, কিন্তু এর মূলধর্মের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

কোলবার্টের এই বণিকদৃষ্টির ফলে ফ্রান্সের বাণিজ্যসারথির দল উৎসাহিত হয়ে উঠল। হিন্দুস্থান ও দূরপ্রাচ্যে ডাচদের তাড়নায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে এর পূর্বে ফ্রান্সের বণিকেরা ভারতসাগরে আফ্রিকার কোল-ঘেঁষা দ্বীপ মাদাগাস্কারে অধিনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। ইচ্ছা ছিল, এখানে ঘাঁটি করে হিন্দুস্থানে বাণিজ্য করবে; কিন্তু সে চেষ্টাও তাদের ব্যর্থ হল। দেশের লোক যতটা না প্রতিকূল হল তার চেয়ে বেশি হল জলবায়ু। মাদাগাস্কারে তারা টিকতে পারল না।

এই মাদাগাস্কার দ্বীপের কথা ইউরোপে প্রথম প্রচারিত করেন বিখ্যাত চীনদেশ পরিব্রাজক মার্কোপোলো ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

ইটালির ভেনিসের বাসিন্দা মার্কোপোলোর কাহিনী চমকপ্রদ। সেকালে চীনের পিকিং থেকে, আধুনিক রাশিয়ার বোখারা হয়ে, কাস্পিয়ান সাগরের ঠিক উপর দিয়ে, ইউরোপ পর্যন্ত এক দীর্ঘ বাণিজ্যপথ তৈরি হয়েছিল। সে পথ দিয়ে চীন থেকে ইউরোপে বহু পরিমাণে সিল্ক যেত বলে তার নামই হয়েছিল 'সিল্কের পথ'। বোখারার একটু পূবে সমরখণ্ড থেকে এ পথের সংযোগ ছিল হিন্দুস্থানের দিল্লীর সঙ্গে—কাবুল ও পেশোয়ারের ভিতর দিয়ে।

মার্কো মাত্র সতেরো বছর বয়সে চীনে যান, অবশ্য 'সিল্কের পথে' নয়, পারশ্য ও কাশ্মীর ঘুরে। সেখানে তিনি ছিলেন চব্বিশ বছর, ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। চীন থেকে বাড়ী ফিরেন জলপথে; লংকা, হিন্দুস্থান ও পারশ্যের মধ্য দিয়ে।

তাঁর লেখায় সেকালের চীনসম্রাট কুবলাই খাঁর পরম ঐশ্বর্যের কথা ছাড়াও সে দেশ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য রয়েছে। তারপর রয়েছে বার্মার চিরোজ্জ্বল স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত প্যাগোডা, কাশ্মীরের অত্যাশ্চর্য জাতুবিদ্যা, সুমাত্রার হিংস্র নরখাদক মানুষ, মাদাগাস্কারের বিরাট 'রক' পাখী, লংকার ব্রাহ্মণের অপূর্ব মন্ত্রশক্তি প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

মাদাগাস্কারের 'রক' পাখী তিন তিনটি হাতি পায়ে ঝুলিয়ে উড়তে পারত। লংকার ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মন্ত্র-শক্তিতে শত সহস্র হাঙ্গরের মুখে পড়েও ডুবুরীরা সমুদ্রে মুক্তা সংগ্রহের জন্য ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসতে পারত।

বলা বাহুল্য, এর কিছুটা সত্য, কিছুটা জনশ্রুতি, কিছুটা কল্পনা। মাদাগাস্কারের 'রক' পাখীটা অবশ্য আরব্যোপন্যাসের কাহিনী, কিন্তু সত্যই এ দ্বীপে যে একদা খুব বড় বড় পাখীর আস্তানা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মার্কোপোলো ভাস্কো-ডা-গামার তুই শতক পূর্বের মানুষ। তাই তাঁর লেখায় হিন্দুস্থানের বিবরণ ঐতিহাসিকের পক্ষে মূল্যবান।

হিন্দুস্থানকে তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যপূর্ণ দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। দেশের লোকগুলিকেও তাঁর ভাল লেগেছে। ব্রাহ্মণদের তিনি বলেছেন, সত্যসন্ধ ; তাঁরা এমনই সত্যাশ্রয়ী যে সত্যপ্রকাশে প্রাণাত্যয়ের পরিপূর্ণ সম্ভাবনাসত্বেও তাঁরা মিথ্যা কথা বলেন না। তাঁর বিবরণে যোগী, সতীদাহ, ধর্মোন্মত্ত আত্মঘাতী, জনসাধারণের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার প্রভৃতির স্পষ্ট চিত্র রয়েছে। আরো রয়েছে মহাজন ও খাতক সম্পর্কে একটি সর্বজনমান্য প্রাচীন রীতির কথা। যদি মহাজন কোনক্রমে খাতকের চারিপাশে একটি পুরা বৃত্ত এঁকে দিতে পারে, তবে খাতক তার ঋণ শোধ না করে সে বৃত্ত লঙ্ঘন করতে পারবে না ; এমনকি খাতক যদি দেশের রাজাও হন। এ রীতি যে অমোঘ আর তা যে যথারীতি পালিত হয়, তা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন।

ভগবান বুদ্ধের কাহিনী ইউরোপে মার্কোপোলোর মুখে যেরূপ প্রচারিত হয়েছিল তা অভিনব।

'সাগামনি বরকান' (অর্থাৎ শাক্যমুনি) লংকার এক রাজপুত্র। রাজপুত্র সংসার-বিরাগী। তাই তাঁর পিতা অর্থ, বিত্ত ও সুন্দরী স্ত্রী দিয়ে তাঁকে ঘরে বাঁধতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। তিনি এক রাত্রে পালিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বসে তপস্যা শুরু করলেন। পরে তাঁর মৃত্যু হলে, তাঁর পিতা শাক্যমুনির একটি মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণমূর্তি তৈরি করে প্রজাদের সেটিকে ঈশ্বর বলে পূজা করতে আদেশ দিলেন। 'সাগামনি' পরজন্মে হলেন ষাঁড় পরে ঘোড়া। এমনি পরপর চুরাশি বার নানা ইতর প্রাণীর দেহ ধারণ করার পরে তিনি সর্বশেষ দেবাদিদেবে পরিণত হলেন।

মার্কোপোলো কিন্তু শাক্যমুনির কাহিনী বলেছেন পরম শ্রদ্ধাভরে; এতে অবজ্ঞার লেশমাত্রও নেই। তিনি একথাও বলেছেন যে খ্রীষ্টান হয়ে জন্মগ্রহণ করলে 'সাগামনি' খ্রীষ্টানদেরও পরমপূজ্য সাধুসন্ত বলেই গণ্য হতেন।

এবার আবার কোলবার্টের কথায় ফিরে আসা যাক।

কোলবার্ট তাঁর ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নূতন করে ঢেলে

সাজলেন ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্মের চৌষট্টি বছর পরে। তাঁর আদর্শ হল ডাচদের বাণিজ্য সমিতির মত federated বা সংযুক্ত সমিতি, ইংরেজদের মত unitary বা একীভূত সমিতি নয়। সমিতির মূলধনের এক পঞ্চমাংশ দিলেন রাজকোষ থেকে।

কোম্পানির প্রথম চারটি জাহাজ ফরাসীর বন্দর ব্রেষ্ট থেকে রওনা হল ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ। এবারেও তাদের প্রথম লক্ষ্য হল মাদাগাস্কার, কিন্তু এবারেও সে অভিযান ব্যর্থ হল।

কোলবার্ট এতে দমলেন না। একজন ধুরন্ধর লোকের নেতৃত্বে আবার নৌবহর পাঠালেন। এবার দলের কর্তা হলেন ক্যারণ। তাঁর সহকারী হয়ে আসলেন মাকারা। ক্যারণ জাতে ফরাসী, কিন্তু তিনি ডাচদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করেছিলেন বহুদিন। লোকটি করিতকর্মা। প্রথমে ডাচ কোম্পানির পাচকরূপে বহাল হয়ে শেষ পর্যন্ত তার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

মাকারা জাতে আর্মেনিয়ান। পেশা তাঁর সওদাগরি, কিন্তু তাঁর পূর্ব ইতিহাসটা কিছু অগৌরবের, জেল-কয়েদের গন্ধ আছে। তা যাই হোক দুজনেই কর্মকুশল। হয়ত সে কারণেই ক্যারণ ও মাকারাতে বনিবনাও হল না। এই বিরোধই হল ফরাসীর পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ।

কোলবার্ট শুধু অভিযাত্রীর দল পাঠিয়েই স্থির রইলেন না ; সঙ্গে সঙ্গে পারশ্যে ও হিন্দুস্থানে দুজন রাজদূতও পাঠালেন, আর তাদের সঙ্গে দিলেন একজন ফরাসী ভিষক্। দিল্লীর সিংহাসনে তখন বাদশা আওরংজেব। তিনি ফরাসীকে সুরাটে কুঠি তৈরি করবার অনুমতি দিলেন। হিন্দুস্থানে প্রথম কুঠি তৈরি করলেন ক্যারণ ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে

শুধু হিন্দুস্থান কেন, সারা জগতের মধ্যেই সুরাট তখন বন্দরগুলির অন্যতম। ডাচ ও ইংরেজ সেখানে বহুকাল পূর্বে প্র হয়েছে। তাদের ব্যবসা জমজমাট। ক্যারণ তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাঁর ব্যবসার জাল বিস্তারের চেষ্টা করলেন। পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের বহু এলাকায়ই তাঁর কুঠি নির্মাণের ইচ্ছা হল বটে, কিন্তু আপাতত মালাবারের গোলমরিচ সংগ্রহের

দিকে দৃষ্টি দিয়ে লংকা ও দূরপ্রাচ্যের দ্বীপগুলির বাণিজ্যব্যবস্থা দেখতে বের হলেন।

ইতিমধ্যে ক্যারণ কোলবার্টকে স্পষ্ট করে লিখলেন যে, এদেশে বাণিজ্য করতে হলে আশপাশে কোথাও এমন একটি ঘাঁটি তৈরি করা প্রয়োজন যার উপর হিন্দুস্থানের রাজরাজড়ার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। মাদাগাস্কারে সে ঘাঁটি যখন তৈরি করা সম্ভব হল না, তখন লংকা থেকে ডাচদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে আস্তানা গাড়তে পারলে ভাল হয়। কোলবার্ট ক্যারণের পরামর্শ গ্রহণ করে অ্যাড-মিরাল লাহের অধীনে এক বিরাট নৌবাহিনী সুরাটে পাঠিয়ে দিলেন।

ক্যারণের ধারণা ছিল যে, এই প্রকাণ্ড নৌবাহিনীর দুর্জয় রূপ দেখে ইউরোপের যে তিনটি বণিকসঙ্ঘ প্রাচ্যে বাণিজ্য করছে তারা তো আতঙ্কিত হবেই, এমনকি দেশীয় রাজরাজড়ার দলও বুঝতে পারবে ফরাসী জাতির পরাক্রম কত বেশি। ফরাসী বণিকদের রক্ষা করবার জন্য যে তাদের রাজশক্তি সর্বতোভাবে নিয়োজিত রয়েছে একথা জানতে পারলে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের পথ সুগম হবার সম্ভাবনা।

এত বড় একটা নৌবহর দেখে পোর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজ এই তিন দলের মনেই কিন্তু সত্যি বিষম ত্রাস উপস্থিত হল। তারা ভাবল, ফরাসী তাহলে এবার আসরে নামল, আর নামল ভালো করেই। হীনবল পোর্তুগীজ রুদ্ধ আক্রোশে গজগজ করতে লাগল, অর্বাচীন ইংরেজ আশঙ্কায় দিন গুণতে শুরু করল। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ ডাচ এই নবাগত শত্রুকে ছলে, বলে ও কৌশলে বিপর্যস্ত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

ফরাসীর বিরাট নৌবহর লংকার পথে নোঙর করল কালিকটে। এখানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল। জামোরিন তখন ডাচদের সঙ্গে অনবরত কলহে বিব্রত। তিনি তাঁর রাজ্যে ফরাসীদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করে দিতে চাইলেন এই শর্তে যে তারা তাঁকে মালাবার থেকে ডাচ বিতাড়নে সাহায্য করবে। ফরাসী রাজী হল বটে, তবে তারা কালিকটে তখনি ডাচদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে সম্মত হল না, কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল লংকা।

লংকায় এসে ফরাসী প্রথম দখল করতে চাইল গ্যালে বন্দর। এখানে বিশেষ কিছু সুবিধা হল না, তাই এর পরে আক্রমণ করল ট্রিংকোমালি। লংকার বাণিজ্যে সেকালে ছিল ডাচের একাধিপত্য; পোর্তুগীজদের উৎখাত করে তারা সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু কাণ্ডির রাজা তাদের উপর বিষম নারাজ কারণ কালিকটের জামোরিনের মত তিনিও তাদের অত্যাচারে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত। তাই তিনিও ফরাসীর সাহায্যে ডাচদের বিধ্বস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি সৈন্য বা আহার্য কোনো কিছু দিয়েই ফরাসীদের সাহায্য করতে পারলেন না। লাহের অদূরদর্শিতার ফলে তাঁর নৌবহরে যথাযোগ্য খাদ্য মজুদ ছিল না; ক্যারণের পরামর্শ ছিল লংকায় তা সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু লংকায়ও খাদ্যাভাব। সেকালে সে অভাব পূরণ হত মাদ্রাজ ও বাংলার চালে। এদিকে খবর পেয়ে, ডাচদের মালাবারের সর্দার দুর্দান্ত গোয়েন্স তাঁর নৌবহর নিয়ে লংকার ডাচদের সাহায্যের জন্য এসে গেলেন।

বিশেষ করে এই খাদ্যাভাবের ফলেই ফরাসী নৌবহর ট্রিংকোমালিতে একটা ছোটোখাটো ঘাঁটি বেঁধে, হিন্দুস্থানের পূর্ব উপকূলের দিকে চলে গেল।

লংকায় ফরাসী নৌবহরের ক্ষতি হল অপরিমেয়। অনেক সৈন্য হত হল; খাদ্যাভাবে কিছু পালিয়ে গিয়ে ডাচের দল বৃদ্ধি করল। ট্রিংকোমালির ঘাঁটিও ডাচেরা অচিরে দখল করে নিল। ফলে, লংকায় ফরাসীর নাম আর বজায় রইল না।

ফরাসীর তুলনায় ডাচেরা তখন হীনবল। তবু লংকায় তারা যে শুধু ঢুকতেই পারল না তা নয়, এখানে তাদের শক্তিক্ষয়ও হল অভাবিত। ঐতিহাসিকেরা কেউ বলেছেন এটা লাহের অদূরদর্শিতার ফল, কেউ বলেছেন ক্যারণের বিশ্বাসঘাতকতার। কারণ হয়ত দু-ই।

এরপর কোল্‌বার্ট ক্যারণকে ডেকে পাঠান। কিংবদন্তী এই, ক্যারণ বেশ কিছু ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন, বলা বাহুল্য সদুপায়ে নয়। কিন্তু সে ঐশ্বর্য-সম্ভোগ তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি, কারণ ফ্রান্সে ফিরে যাবার পথে লিসবনের কাছে জাহাজডুবি হয়ে তিনি মারা যান।

এদিকে লাহের দল মাদ্রাজ উপকূলে এসে প্রথমে আতিথ্য

গ্রহণ করল দিনেমারদের ট্রেন্‌কুইবারের কুঠিতে। তারপর এসে নোঙর করল মাদ্রাজের ময়লাপুরে—সেণ্ট্ টোমে। এই সেণ্ট্ টোমেই বাধল এক জটিল ঝগড়া আর, তার তাল সামলাতে গিয়েই ফরাসী নৌবহর পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ল।

সেণ্ট্ টোমের প্রতিষ্ঠা করেছিল আর্মেনিয়ানরা। পরে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বন্দরটি দখল করে পোর্তুগীজেরা। এখানে পাওয়া যেত পাকা রং আর 'চিকন্' কাপড়; এ দুয়েরই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর। সেণ্ট্ টোম ওরফে ময়লাপুর ছিল গোলকুণ্ডার রাজার এলাকায়। রাজা সাহেব পোর্তুগীজদের উৎপাতে অস্থির হয়ে তাদের সে বন্দর থেকে উৎখাত করে একজন সেনাপতি সেখানে মোতায়েন করে রাখেন।

ধূর্ত আর্মেনিয়ান ও বোম্বেটে পোর্তুগীজদের সংস্পর্শে এসে এদেশের লোকেরা সকল বিদেশী বণিকদেরই বড় সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে; কোনো কুমতলব ছাড়া যে তারা এদেশে ঘোরাফিরা করে না, এ ধারণা তাদের বদ্ধমূল হয়। দেশের লোকের মানসিক অবস্থা যখন এমনিতর বিরূপ, হে সাহেব তখন এতবড় একটা নৌবহর নিয়ে এদেশে পৌঁছলেন এবং, পৌঁছেই, খাদ্য সংগ্রহের জন্য চারিদিকে লোক পাঠালেন। বলা বাহুল্য আহার্য বিশেষ কিছু মিলল না। একে নিদারুণ খাদ্যাভাব, তারপর পোর্তুগীজ পাদরীর দল এসে সেণ্ট্ টোমে খ্রীষ্টানদের দুঃখ কাহিনী নিবেদন করে লাহেকে উত্তেজিত করে তুলল। ফলে ফরাসী সেণ্ট্ টোম দখল করে বসল। কিন্তু এই বিজিত বন্দর রক্ষার জন্য লাহের বিরাট বাহিনীকে এখানেই পড়ে থাকতে হল, কারণ দিন কয়েকের মধ্যেই রাজা সাহেব সেণ্ট্ টোম অবরোধ করে বসলেন। রসদের অভাবে হে সাহেব আবার বিষম ফাঁপরে পড়লেন। শুধু তা-ই নয়, এই গোয়ার্তুমির জন্য তাদের গোলকুণ্ডা রাজের এলাকার মসুলীপট্টম কুঠির কাজকর্মও রসাতলে গেল।

এদিকে ময়লাপুরের অবরোধও চলল বহুকাল ধরে—প্রায় আট মাস। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত। এদিকে মহাশত্রু ডাচের হল পোয়াবারো।

গোলকুণ্ডার রাজার সাথে তাদের দহরম খুব বেশি। তাই তাদের পক্ষে ফরাসীকে ঘায়েল করার একটা অভাবিত সুযোগ এসে গেল। মিন্‌মিনে ইংরেজ পাশেই বসে মাদ্রাজে, কিন্তু তাদের কাছে কোন সাহায্যের আশা বৃথা। মুখোমুখি ঝগড়া না করলেও তারা যে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করবে না—খানিকটা গোলকুণ্ডার ভয়ে আর খানিকটা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য—তাতে আর সন্দেহ কি? কাজেই বেকুফ সেনাপতি হে ময়লাপুরে বসে হাঁ করে দিন গুনতে লাগল।

কিন্তু দিন গুনলেই আর বিপদ কেটে যায় না, আহার্যও মিলেনা। কাজেই খাদ্যের অভাবে ফরাসী বোম্বেটেগিরিতে লেগে গেল। ময়লাপুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা ইংরেজ ও দিনেমারদের খানকয়েক মালভর্তি জাহাজের খাদ্য লুটে নিল। সে লুটের মালে চলল দিন কয়েক।

কিন্তু তাতে কি ক্ষুধা মেটে? ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে কিন্তু ফরাসীরা প্রমাণ করল যে তারা পরম স্ফূর্তিবাজ ও কল্পনাপ্রবণ জাতি। কল্পনার রসে রঙ্গিন হয়ে তারা ভাবতে লাগল যে আশপাশ থেকে সুন্দরী খ্রীষ্টান মেয়েরা তাদের কাছে নানারূপ আহার্যের সওগাত পাঠাচ্ছে! এ নিয়ে তারা কত কবিতাই না রচনা করল—কত কাল্পনিক প্রেমের কাহিনীই না লিখে ফেলল! সে সব কবিতা ও কাহিনীর মূলকথা—

পরদেশী সব বঁধু পাঠায় প্রণয়োপহার,
ফুলের তোড়া নয়, রুটি আর রঙ্গিন সুরার ভাঁড়!
খাদ্যাভাবে নইলে প্রেমের জোয়ার যে যায় থামি
কে না জানে, ফুলের চেয়ে মাংস বেশি দামী?

গোলকুণ্ডারাজ পরে সে অবরোধ তুলে নিলেন সত্য, তবু তাঁর বিষ দৃষ্টি ও ডাচদের অবিরত অনর্থ সৃষ্টির ফলে অবরোধ থেকে রেহাই পেয়েও ফরাসী ময়লাপুরে একেবারে কোনঠাসা হয়ে রইল। সাহায্য লাভের কোনো প্রত্যাশা ছিলনা; না দেশ থেকে, না সুরাট থেকে। কাজেই শেষ পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে ক্ষয় ক্ষতি হতে হতে ফরাসী নৌবহরের ভরাডুবি হল এই ময়লাপুরেই। ফলে অ্যাডমিরাল লাহেকে হার মেনে সুরাটে ফিরে যেতে হল।

এর কিছু আগে শের খাঁ লোদীর সঙ্গে ফরাসীদের বন্ধুত্ব হয়েছিল; তবে অর্থহীন বন্ধুত্ব নয়, ফরাসীদের কাছ থেকে তিনি মোটা সুদে বেশ কিছু ধার নিয়েছিলেন। লোদী ছিলেন বিজাপুর রাজার প্রতিনিধি; পণ্ডিচেরি তাঁর এলাকার বন্দর। তিনি ফরাসীদের সেখানে কুঠি করতে বলেছিলেন। নানা কারণে, বিশেষ করে টাকার অভাবে, ফরাসী এ কাজ এতদিন করে উঠতে পারে নি। কিন্তু ময়লাপুরে এই দুর্বিপাকের ফলে তাদের এ কাজ আর ফেলে রাখা সমীচীন বলে মনে হল না; ফরাসীর হাতে পণ্ডিচেরির পত্তন হল ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

সেকালে দূর প্রাচ্যের দ্বীপগুলিতে ডাচদের পরাক্রম এত প্রবল ছিল যে ফরাসী বণিকেরা তাদের কাছেও ঘেঁষতে পারত না। তাই তারা করত চোরা কারবার। অর্থাৎ, ডাচদের ফাঁকি দিয়ে অন্যান্য বণিকেরা যে সব পণ্য নিয়ে আসতে পারত, তা-ই তারা কিনে নিত। ক্যারণের হয়ত ইচ্ছা ছিল, অ্যাড্‌মিরাল লাহের নৌবহর নিয়ে সে বাজারে ভয় দেখিয়ে, বা দরকার হলে লড়াই করে একটু স্থান করে নেবেন। কিন্তু তাঁর মনের আশা মনেই রইল।

করোম্যাণ্ডাল উপকূলে, অর্থাৎ মাদ্রাজে, ফরাসীর ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ কিছু ছিলনা। শুধু সুতী কাপড় সংগ্রহ করে মজুদ রাখাই ছিল মাদ্রাজ ও মসুলীপট্টম কুঠির কাজ। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাজ সেন্ট্‌ টোমের অবরোধের কালে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য মজুদ রাখার জন্যই পণ্ডিচেরির সৃষ্টি হল।

এরপরে ফরাসী বাংলাদেশে এসে জুটল নেহাত ভাগ্যক্রমে।

লাহে যখন ময়লাপুরে ছলে, বলে, কৌশলে আহার্য সংগ্রহে ব্যস্ত, তখন পথভুলে তাঁর দুখানা জাহাজ উড়িষ্যার উপকূলে বালাসোর বন্দরে গিয়ে পড়ে। সেখানে যেতেই সেই যূথভ্রষ্ট জাহাজ দুখানাকে ডাচেরা দখল করে বসল; এ-ই ছিল সেকালের রেওয়াজ।

জাহাজের কাপ্তান তাঁর অভিযোগ জানাতে সোজা চলে গেলেন বাংলার রাজধানী ঢাকায়। সেখানে শায়েস্তা খাঁ তখন মোগল রাজপ্রতিনিধি। তাঁর বিচারে ডাচেরাই দোষী বলে প্রতিপন্ন হল; কাপ্তান তাঁর জাহাজ দুখানা ফেরত পেলেন।

বাংলায় সেকালে ব্যবসা বাণিজ্য ছিল বড় জমজমাট। পোর্তুগীজ, ডাচ্ ও ইংরেজ তিনটি দলই সেখানে ফলাও করে কারবার করছে। ফরাসী ভাবল, তারাই বা কি দোষ করেছে? কিছুকাল চেষ্টার ফলে কাপ্তান সাহেব বাংলায় বাণিজ্য করবার ফরমান পেলেন ও সেকালের বাংলার বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্রে—ঢাকায়, বালাসোরে, হুগলীতে (চন্দননগরে) ও কাশিমবাজারে—কুঠি তৈরি করবার বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু এ সব গঞ্জে ফরাসীর কুঠি তখনই তৈরি হল না; হল বছর পনেরো পরে। কারণ, সুরাটে তখন ফরাসীর নিতান্ত অব্যবস্থা আর, স্বদেশেও নানাকারণে কোলবার্টের এদিকে নজর দেবার সময় ছিল না। পণ্ডিচেরির কুঠি নূতন; তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যই তখন সে প্রতিষ্ঠান অপরের সাহায্যপ্রার্থী। তাই সেখান থেকেও কোনো সাহায্যের আশা ছিল না।

বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যে ফরাসী তাই বেশি এগিয়ে যেতে পারল না। অষ্টাদশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছর তো তাদের অবস্থা ছিল বিষম নড়নড়ে; ডাচেরাই ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত। তারপর মাদ্রাজ থেকে ডুপ্লে এসে কিছু সুব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু অচিরেই হল পলাশী নাটকের অভিনয়। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীর সমস্ত আশা ভরসাই মুকুলে শুকিয়ে গেল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পণ্ডিচেরির প্রতিষ্ঠা হল ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে এদের বাণিজ্য ক্রমে মসুলীপট্টম্, কালিকট, মাহে ও কারিকলে ছড়িয়ে পড়ল। বাংলায় প্রথম কুঠি হল বালাসোরে, তারপর চন্দননগরে ও কাশিমবাজারে। কিন্তু কোথাও তাদের ব্যবসা তেমন ফুলে ফেঁপে উঠল না।

এদিকে ইউরোপে অষ্ট্রীয়ার রাজসিংহাসন নিয়ে খণ্ড যুদ্ধ শুরু হল ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে। এ বিবাদে ফরাসী যোগ দিল ইংরেজের বিপক্ষে। এদেশে সেই সাগর পারের দাবানলের স্ফুলিঙ্গ আসতে বছর ছয়েক দেরি হল; তারপর হিন্দুস্থানেও শুরু হল ফরাসী ও ইংরেজের প্রবল বিগ্রহ।

পণ্ডিচেরির ফরাসী ঘাঁটির অধ্যক্ষ ছিলেন ডুপ্লে। তিনি

করিতকর্মা লোক। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাদ্রাজে ইংরেজের কুঠি দখল করতে ছুটলেন। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল মাদাগাস্কারের পাশের দ্বীপ মরিসাসের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ বের্দোনে।

মাদ্রাজ জয় হল বটে, কিন্তু হায়দারাবাদের নিজামের প্রতিনিধি, আর্কটের নবাব, তাঁর নিজের এলাকায় এ সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ফরাসীর উপর হলেন ক্রুদ্ধ। তিনি ফরাসীকে শায়েস্তা করবার জন্য মাদ্রাজে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। হয়ত ইংরেজ ও ডাচের প্ররোচনা ছিল এর মধ্যে।

ডুপ্লে কিন্তু এতে ভয় পেলেন না। শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে তিনি নবাবী সৈন্যকে অমিত বিক্রমে আক্রমণ করলেন। নবাবী সৈন্য সে আঘাত সহ্য করতে পারল না; তারা পরাজিত হল।

ডুপ্লে ধুরন্ধর লোক। হিন্দুস্থানের নৌবল যে ইউরোপের জাতিগুলির নৌবলের তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর তা তিনি খুব ভাল ভাবেই জানতেন। কিন্তু এদেশের স্থূল-সৈন্যরূপ রাজহস্তীর দ্বারা যে শুধু শোভাযাত্রাই চলে, যুদ্ধযাত্রায় যে তার মূল্য নিতান্তই তুচ্ছ একথাও তিনি এবার স্পষ্ট করে বুঝলেন। এই অচিন্তিতপূর্ব মূল্য-বোধই পরবর্তীকালে ইংরেজ ও ফরাসীর ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত করল।

ফরাসী ও ইংরেজ দু-ই পোর্তুগীজদের কাছ থেকে এ তথ্যটি শিখেছিল যে এদেশে দক্ষ সিপাহী গড়বার মত মানুষের অভাব নেই; এখন তারা সে কথাটি কাজে লাগাতে চেষ্টা করল।

ডুপ্লের বুদ্ধি ব্যবসাদারী। তিনি ভাবলেন, দেশ থেকে ব্যবসার মূলধন না এনে, এদেশেই সে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এ অর্থ সংগ্রহের প্রকৃষ্ট পন্থা, এদেশে সিপাহী তৈরি করে ভাড়া খাটানো। এদেশে তো রাজা রাজড়াদের মধ্যে ছোটখাটো যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই রয়েছে। কাজেই সৈন্যের চাহিদাও যথেষ্ট।

তিনি এ কাজে অচিরেই হাত দিলেন, কিন্তু দেশে কর্তৃপক্ষকে একথা বললেন না। হয়ত ভেবেছিলেন, এমন একটা সুষ্ঠু কল্পনাকে

সার্থক করে তুলতে পারলে, দেশে সবাইকে তাক লাগিয়ে বাহবা ও যশ পাবেন অপরিমিত। হয়ত বা অন্য কোনো মতলব ছিল। তা যা-ই হোক, এই সীমাহীন আত্মবিশ্বাস আর অসংগত ও অসংযত রাজনীতি চর্চাই তাঁর কাল হল।

ফরাসী ও ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপলক্ষে ফরাসী ও আর্কটের নবাবের যে বিচিত্র বিরোধের সৃষ্টি হল, তা-ই ইতিহাসে প্রথম কার্ণাটিক যুদ্ধ নামে প্রখ্যাত। এ বিরোধ ঘটেছিল ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বাংলাদেশে পলাশীর যুদ্ধের মাত্র বছর দশেক আগে।

যুদ্ধ হিসাবে প্রথম কার্ণাটিক যুদ্ধের মর্যাদা নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু দিগ্‌দর্শন হিসাবে এর মূল্যের সীমা নেই। এই যুদ্ধের ফলে পাশ্চাত্য বণিকদের চোখের সুমুখ থেকে যেন একটা ভারী পর্দা সরে গেল। এতদিন তারা হিন্দুস্থানের শাসনতন্ত্র, রাজাধিরাজ ও রাজন্যবর্গের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে প্রকৃত শ্রদ্ধা পোষণ করত। কিন্তু সামান্য একটু পরীক্ষায় এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে পাশ্চাত্যের জনকয়েক শিক্ষিত সেনা দিয়েই হিন্দুস্থানের একটা গোটা সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে ও অনায়াসে পরাস্ত করা চলে।

এবার আবার ডুপ্লের কথায় ফিরে আসা যাক।

ডুপ্লে কিন্তু নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লেন। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইংরেজ ও ফরাসীর সশস্ত্র বিরোধের প্রথম পর্ব শেষ হল। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনীর আয়লা-শাপেলে (যার আধুনিক নাম আচেন) সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। তার ফলে, পরের বছরই ইংরেজ আবার মাদ্রাজের ঘাঁটি ফিরে পেয়ে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করল। কিন্তু ডুপ্লে পণ্যব্যবসা অপেক্ষা সৈন্যব্যবসায়ে বেশি মত্ত হয়ে পড়লেন।

এদিকে ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের নৌশক্তি ক্রমাগত বেড়ে যেতে লাগল আর, দেখতে দেখতে তা হল ফরাসীর নৌবলের চেয়ে বহুগুণ প্রবল।

পাশ্চাত্যে আবার ইংরেজ-ফরাসীর লড়াই শুরু হল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের বছব খানেক আগে। এবার প্রাচ্যে তার ছোঁয়াচ এল খুব তাড়াতাড়ি। তখন ইংরেজ ফরাসীর তুলনায়

মহাবলী কারণ, বিরাট নৌবহরের জোরে দেশ থেকে সৈন্য নিয়ে আসা তাদের পক্ষে হল সহজ। ফরাসীর সে সুবিধা ছিল না।

এরপরে হল পলাশীর অভিনয়। তার ফলে, ইংরেজেরা রাতারাতি ফরাসীদের ডিঙিয়ে বহুদূর চলে গেল। ডুপ্লে দক্ষিণাপথের রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়ে ক্রমাগত অথই জলে হাবুডুবু খেতে লাগলেন; সৈন্যভাড়া দিতে গিয়ে কোথাও কিছু লাভ, কোথাও বা কিছু লোকসান হল। তারপর ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে দেখলেন যে ইংরেজ তখন প্রচণ্ড সাবালক হয়ে গেছে। একদিকে তাদের নৌবহর ফরাসীর নৌবহরের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী, অন্যদিকে বাংলার সিংহাসনের কোণ জুড়ে বসে তাদের দেমাক, মর্যাদা, ঐশ্বর্য ও বীর্যের অন্ত নেই।

ইংরেজ যতটা এগিয়ে যেতে লাগল, ফরাসী ততটাই পিছিয়ে পড়ল। হিন্দুস্থানের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সবগুলি ঘাঁটিই একে একে ইংরেজেরা দখল করে নিল আর, ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের বছর তিনেক পরে, ফরাসী সূর্য ভারত সমুদ্রে ধীরে ধীরে অস্তমিত হয়ে গেল। তখন হিন্দুস্থানের আকাশে জেগে রইল একমাত্র বহ্নিমান জ্যোতিষ্ক, ইংরেজ।

এবার এই ফরাসী পর্বের সালতামামি করা যাক।

হিন্দুস্থানে ফরাসী এসেছিল ইংরেজের বহু পরে। কিন্তু ফরাসীরাই ছিল সেকালে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি। কোলবার্টের মত ধুরন্ধর বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তাদের কর্ণধার। তবু তাদের ইংরেজকে ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে অসম্মানে বিদায় নিতে হল কেন?

এর কারণ আমাদের আখ্যায়িকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

অ্যাড্‌মিরাল লাহের এত বড় নৌবহরের ভরাডুবির জন্য দায়ী ক্যারণ ও লাহে দুজনই। ক্যারণ আগে ছিলেন ডাচদের তাঁবেদার; ফরাসীদের কর্তা হয়েও হয়ত পূর্বস্মৃতি ভোলেন নি। হয়ত অর্থমূল্যে তিনি ফরাসীর সর্বনাশের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। তারপর, অ্যাড্‌মিরাল লাহের যে বিবেচনার বহর বেশি ছিল না তা-তো দেখা গেছে পদে পদেই। মাদাগাস্কার, লংকা বা মাদ্রাজ কোথাও তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা বা দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নি।

ডুপ্লে যদি রাজনীতি চর্চা না করে শুধু বাণিজ্যে মনোনিবেশ করতেন, তবে হয়ত পূর্বাঞ্চলে ফরাসীরা এত সহজে হটে যেত না। মনে হয়, ডুপ্লে মনে প্রাণে ছিলেন ফ্রান্সের একটি ছোটখাটো চতুর্দশ লুই ; দেশে বা বিদেশে কারো পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেন নি।

কোলবার্ট ফরাসীদের কর্ণধার ছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে এই বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁর অখণ্ড মনোযোগ দেবার সুযোগ ঘটে নি। তারপর তিনি নিজেই অন্তর্হিত হলেন ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ অ্যাড্‌মিরাল লাহের নৌবহরেরর ভরাডুবির নয় বছরের মধ্যে।

ফরাসী মধ্যবিত্তের দল চিরদিনই তাদের এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসাকে জুয়াখেলার শামিল মনে করেছে। প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে কোম্পানির অংশ বিশেষ বিক্রি হয় নি। কাজেই সপ্তদশ শতকের শেষপাদে, অর্থাৎ কোলবার্টের তিরোধানের পরে, কোম্পানির মূলধনের ঘটল নিতান্ত অভাব। সে অভাবের কিছুটা মোচন করতে চেষ্টা করলেন ডুপ্লে, তাঁর দেশী সৈন্য ভাড়া খাটিয়ে।

ইংরেজের অবিচ্ছিন্ন নৌবহর বৃদ্ধি ফরাসীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ। আংশিকভাবে এটা অবশ্য ডুপ্লের দূরদৃষ্টির অভাবের ফল।

তারপর ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা হয়ত ক্রমশ বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিকূল হতে শুরু করেছিল বহুকাল ধরে। সে দেশের বিশ্ববিখ্যাত, মহাবিপ্লব ঘটল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। তারই পূর্বাভাস জাতীয় জীবনের সর্বস্তরেই বহুপূর্বে দেখা দিয়ে জাতির কর্মক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত করে দিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কথা, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পলাশীর যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজের যোগদান। সে ঘটনা ইংরেজের পক্ষে যে এত কল্যাণপ্রসূ ও হিন্দুস্থানের পক্ষে এমন যুগান্তকারী হয়ে উঠবে, তা কে কল্পনা করেছিল ?

॥ পাঁচ ॥

এবার ইংরেজের কথা বলার আগে বাংলা দেশের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। এ নজর দেশীর নয়, বিদেশীর চোখের।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে, ১৬৫০ বা ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরেজ প্রথম বাংলার হুগলি বন্দরে এসে তাদের কুঠি তৈরি করল। এর কিছু আগে তারা কায়েম হয়েছিল উড়িষ্যার বন্দর বালাসোরে ও হরিহরপুরে। বাংলায় পলাশীর মাঠে তাদের ভাগ্যপরীক্ষা হল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ তাদের প্রথম পদার্পণের প্রায় একশ বছর পরে। এই একশ বছরের বাংলার চিত্রই আমাদের এ অধ্যায়ের মূল কথা।

এ কালেই বাংলার রাজধানী পূর্ববঙ্গের বুড়ীগঙ্গার তীরে ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হল পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীর তীরে মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্তভূমি কাশিমবাজার; সেখানে এসে বড় বড় কুঠি তৈরি করল ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসী। এই মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারেই রচিত হল পলাশীর পটভূমিকা। তাই কাশিমবাজার ও লণ্ডনের যোগাযোগের পরিণতি-সূত্রই পথ নির্দেশ করল বাংলার তথা হিন্দুস্থানের ইতিহাসের।

পাশ্চাত্যের নানা দেশের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছাড়াও একালে অনেক বিদেশী অতিথি বাংলায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ভেষজজীবী, কেউ পর্যটক, কেউ ধর্মযাজক, কেউ জহুরী। ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন বার্নিয়ার, টেভার্নিয়ার। ওই দেশেরই লোক টেভেনো অবশ্য বাংলায় পদার্পণ করেন নি, তবে হিন্দুস্থানে এসে বাংলা সম্পর্কে পরোক্ষ সংবাদ লিখেছিলেন। ইটালিয়ান মানুচি হিন্দুস্থানে বাস করেছেন বহুকাল, প্রায় সারা জীবন। পোর্তুগীজ ম্যানরিক বিপদে পড়ে উড়িষ্যা-বঙ্গ-বিহার পরিক্রমা করেছিলেন।

ক্রমে ক্রমে এঁদের সবার কথাই বলা যাবে।

জাহাজডুবি হয়ে ম্যানরিক এসে উঠেন উড়িষ্যার বালাসোরে। সেখান থেকে মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের মধ্য দিয়ে হাজির হন

বর্ধমানে। আরো এগিয়ে আসেন মুর্শিদাবাদের রঘুনাথপুর ও জঙ্গীপুরের কাছাকাছি ভাগীরথীর তীরের বড় বন্দর মুস্থমবাজারে। সেখান থেকে জলপথে রাজমহলে রওনা হবার পরে অসুস্থ হয়ে চলে যান ঢাকায়। ঢাকা থেকে নৌকায় যান রাজমহলে; পথে বাংলার পূর্বতন রাজধানী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখে যান। রাজমহলে কিছু দিন বাস করে চলে যান পাটনায়। রাজমহলে তখন সাজাহান-নন্দন সুজার আমল।

মোটের উপর তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক গ্রামাঞ্চলে সফর করেন; মুসাফিরখানায়, এমনকি গো-শালায়ও, রাত্রি যাপন করেন আর হিন্দু গৃহস্থের পোষা ময়ূর কেটে খেয়েও মুসলমান ধর্মের সাফাই গেয়ে নারায়ণগড়ের গড়াধিপের কাছে অব্যাহতি পান।

ম্যানরিক বলেছেন, বাংলায় তখন বড় বড় শহরের মধ্যে ছিল ঢাকা, রাজমহল, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি, পিপলি ও বালাসোর বা বালেশ্বর। শহরে ও গ্রামে সর্বত্রই আহার্য ছিল পর্যাপ্ত ও সস্তা। চাল, ঘি ও দুগ্ধজাত খাদ্য ছিল ঘরে ঘরে। মুস্থমবাজার হয়ত সেই পুরাতন মকসুদাবাদ যাকে মুর্শিদাবাদ নাম দিয়ে বাংলার পরবর্তী শাসক মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এ রাজধানী বাংলার পক্ষে হল বিষম অপয়া।

মুস্থমবাজারে নানা দ্রব্যসম্ভারের প্রাচুর্য দেখে ম্যানরিক অবাক হয়েছিলেন। খাদ্যদ্রব্যের তো কথাই নেই, নানা প্রকার শস্য, চাল, ঘি, সবজি, আখ ও বহু জাতীয় খাদ্য-তেল এখানে থাকত স্তূপীকৃত। এছাড়া থাকত সুতার কাপড়, নানাপ্রকার ভেষজ, তামাক, আফিং ইত্যাদি। ম্যানরিক সেকালের পাশ্চাত্যের সব বড় বড় শহরের সঙ্গে এর তুলনা করে বলেছেন, সেখানে কোথাও তিনি নানা দ্রব্যের এত প্রাচুর্য দেখেন নি।

ঢাকা থেকে রাজমহল যেতে তাঁর চোখে পড়েছে গঙ্গার দু-ধারে শস্যশ্যামলা উর্বরা ভূমি। সে ভূমিতে নানা ফসলের সমাবেশ; অফুরন্ত ফল, গম, চাল ও শাক-সবজি। সর্বত্র বিস্তীর্ণ গোচারণ-

ভূমি ; সেখানে পালে পালে চরছে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। কিন্তু কোথাও শূকরের চিহ্ন নেই।

তিনি গৌড়ে মোগল সৈন্যের অধিনায়কের সঙ্গে আহারের যে চিত্র এঁকেছেন তা ভোজনবিলাসীর পক্ষেও স্বপ্ন।

এখানে ম্যানরিকের দপ্তর থেকে সেকালের বাংলার একটি বিচার-চিত্র তুলে ধরছি।

বর্ষাকাল। কর্দমাক্ত মাঠ ঘাট পার হয়ে, ম্যানরিক ও তাঁর দলবল বালেশ্বর থেকে নারায়ণগড়ের পথে সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলেন এক গণ্ডগ্রামে।* তাঁর পথ প্রদর্শক যুবকটি মুসলমান। সঙ্গে আরো দুতিনটি তল্পিদার। হিন্দুর গ্রাম, কোথাও ঠাঁই মিলে না। সবাই বলে, মুসলমান তবু মাত্র গরু খায়, কিন্তু ফিরিঙ্গি খায় গরু ও শুয়ার দুই-ই—তারা সর্বভূক। এ সব ম্লেচ্ছদের কে বাড়ীতে স্থান দেবে ?

তবু পরিশেষে আশ্রয় মিলল এক হিন্দু-গৃহস্থেরই গোয়ালে। নামমাত্র মূল্যে পাওয়া গেল চাল, ঘি আর নানা দুগ্ধজাত খাদ্য, কিন্তু তা খেয়ে দেহের পুষ্টি যা হল তার অর্দ্ধেক গেল গোরক্ত-বর্দ্ধিত মশকেরই পেটে। কিন্তু রক্তদান করেও সোয়াস্তি নেই, হুলের জ্বালা বড় তীব্র—নিদ্রা-দেবী চোখে আর আসন পাততে পারলেন না।

গৃহস্থের ছিল একজোড়া পোষা ময়ূর। ময়ূর হিন্দুর আহার্য-তালিকাভুক্ত নয়, বরং কার্তিকের বাহন হিসাবে পবিত্র ও পূজ্য। গৃহস্থের আদরে লালিত হয়ে এরা নিঃশঙ্ক ; তাই অভ্যাগতদেরও আদর-প্রত্যাশী হয়ে গোশালায় প্রবেশ করেছিল। সেই হল তাদের কাল।

এদিকে দারুণ বর্ষা ; মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারে না। সুযোগ পেয়ে মাংসাশী ম্যানরিকের দল নিঃশব্দে ময়ূর জোড়াটি জবাই করে সবাই মিলে সে মাংস উদরস্থ করে ফেলল। তারপর এ অপকার্য গোপনের জন্য পাখী দুটির হাড়, পালক আর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সবই পুঁতে ফেলল মাটির নীচে।

* নারায়ণগড় মেদিনীপুরের সন্নিকটে।

পরের দিন অভ্যাগতের দল বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু অতিথি-বৎসল গৃহস্থ তার ময়ুর জোড়ার অন্তর্ধানের রহস্য টের পেয়ে গেল। তার এ দুর্ভাগ্যের কথা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে সারা গ্রামের লোক তীর, ধনুক ও বর্শা হাতে ম্যানরিকের পিছনে ধাওয়া করল।

দুদলের দেখা হল মাঠের মাঝে, নারায়ণগড়ের কিছু আগে এরা তীর, ধনুক ছুঁড়ল, ম্যানরিক ছুঁড়লেন তাঁর গাদা-বন্দুক কোন পক্ষেই হতাহত হল না, কিন্তু ম্যানরিকের সঙ্গী মুসলমান যুবকটি সহসা ভূমি আশ্রয় করে মরার ভান করে বসল। মানুষ মারার দায়ে পড়ার ভয়ে গৃহস্থেরা গ্রামে ফিরে গেল বটে, তবু এদের প্রতি রাখল কড়া নজর।

এদিকে এর কিছু পরে ম্যানরিক ও তাঁর দলবল হাজির হল নারায়ণগড়ে আর সরাসরি ঠাঁই পেল সেখানকার সরাইয়ে।

সেকালে নারায়ণগড় জায়গাটি ছিল আজকালকার বড় জেলা-শহরের মত। গড়ের অধিপতি, নবাবের প্রতিনিধি, দেশের হর্তা, কর্তা, বিধাতা। বলা বাহুল্য তিনি জাতে মুসলমান; তাঁর পদবী, সিকদার।

ম্যানরিকের সরাই-বাসের খবর পেয়ে আতিথ্য-ক্ষুণ্ণ গৃহস্থের দল এসে হুজুরে নালিশ পেশ করল, এই জঘন্য অপকর্মের যথাযোগ্য বিচার চাই। সাধারণত এরূপ হীনকার্যের দণ্ড হল বেত্রাঘাত ও হস্তচ্ছেদ।

আরজি শুনে সিকদার সাহেব আসামীদের বেঁধে আনতে বললেন। হুকুম তালিম হল তৎক্ষণাৎ। দলবল সহ ম্যানরিক তখনকার মত গড়ের মধ্যে মাটির নীচে অন্ধকারময় হাজতে বদ্ধ হয়ে রইলেন।

বিচার সভায় সভাপতি হলেন সিকদার সাহেব—সপারিষদ। সবাই মুসলমান। ম্যানরিকের দলের ডাক পড়ল।

সিকদার সাহেব ম্যানরিককে প্রশ্ন করলেন, ফিরিঙ্গি তোমার পরিচয় কি?

ম্যানরিক বললেন, আমি পোর্তুগীজ বণিক; আমার কাছে

কটকের নবাব সাহেবের ফরমান রয়েছে। আমি যাব দিল্লি, বাদশার দরবারে।

ফরমান দেখে সিকদার সাহেব গলে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা কি ঘটেছিল ?

ম্যানরিক দীর্ঘ বক্তৃতা করে বললেন, ময়ূর জোড়া অবশ্য জবাই করাই হয়েছে, তবে জবাই করেছে আমার পথ-দর্শক মুসলমান যুবকটি। তা সে করবেই বা না কেন? কোরানে তো ময়ূর অখাদ্য বলে লেখে নি, বাইবেলেও এমন কোন নিষেধের কথা নেই। তারপর ঈশ্বর তো এ সব ইতর প্রাণী সৃষ্টিই করেছেন মানুষের আহারের জন্য। তাই, একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হয়ে আমার মুসলমান সঙ্গীটি এই পৌত্তলিক হিন্দুদের হাস্যকর ধর্ম-শাসন মানবেই বা কেন, আর হুজুরের মত শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলমান সুধী সে কথায় কর্ণপাতই বা করবেন কেন ?

সিকদার সাহেব স্মিতহাস্যে কেয়াবাত, কেয়াবাত বলে বক্তৃতার তারিফ করে বললেন, আল্লা ফিরিঙ্গিদের মগজভর্তি জ্ঞান দিয়েছেন। সভাসদের দল সোল্লাসে সে কথায় সায় দিল।

তারপর তিনি ফরিয়াদীদলের দিকে চাইলেন। সেখানে গ্রামের, যাকে বলা যায়, 'জন-সাধারণ' তা-ই উপস্থিত। বিচারে ধর্মের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনে করে সিকদার বললেন, ফিরিঙ্গি সাহেব, তোমার কথাটা সত্য, তবে দিল্লির বাদশা তো জয় করেছেন হিন্দুদের দেশ, তাই তিনি তাদের আশ্বাসও দিয়েছেন যে এ দেশে তারা তাদের ধর্ম ও আচার অবাধে মেনে চলতে পারবে। ময়ূর জবাই করে মুসলমানটি দেশের আইন অমান্য করেছে, তাকে দণ্ড পেতেই হবে।

শাস্তিদান তখনকার মত মুলতবী রইল।

ম্যানরিক প্রমাদ গনলেন, কিন্তু হতাশ হলেন না।

তাঁর বোধ হয় এদেশ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান হয়েছিল, তাই এবার তিনি সিকদার সাহেবের অন্তঃপুরিকাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। যোগাযোগের জন্য খোজার শরণাপন্ন হতে হল। তার অভাব ছিল না। 'পৃথিবীটা কার বশ' তা-ও প্রমাণিত হল। কর্মঠ খোজা শুধু

হারেম-আসমানে সিকদার-চন্দ্রের রোহিণী যে কোনটি তারই খোঁজ নিয়ে আসল না, তার সঙ্গে ম্যানরিকের যোগাযোগও হয়ত ঘটিয়ে দিল।

শাস্ত্রে রয়েছে, নারীর দোষ ছয়টি ; আসবপান, দুর্জন-সংসর্গ, পতি-বিচ্ছেদ, বৃথাভ্রমণ, দিবাস্বপ্ন ও পরগৃহ-বাস। সিকদার সাহেবের রোহিণীর মধ্যে এ দোষ-ষষ্ঠের কয়টি বর্তমান ছিল জানা নেই, তবে ম্যানরিকের দেওয়া পরম মনোহর ও চিত্রবিচিত্র চীনা সিল্কের থান উপহার পেয়ে তিনি তাঁর সমস্ত ছলাকলা প্রয়োগে আসামীর বেকসুর খালাসের জন্য সিকদার সাহেবের মন ভেজাতে শুরু করলেন।

কিন্তু চাকুরির মায়া বড় মায়া ; তাই ধর্মাবতার সহসা একদল গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে যেতে সাহস পেলেন না। তবে বললেন, হয়ত শুধু বেত্রাঘাত করেই আসামীকে খালাস দেওয়া যাবে।

ম্যানরিকের প্ররোচনায় এতে কিন্তু রোহিণীবিবি তাঁর মান ভাঙ্গলেন না। ফলে, শেষ পর্যন্ত আসামীকে ছেড়ে দিয়ে সিকদার সাহেবের প্রচার করতে হল যে সে হাজতের জানালা ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হয়ত যথারীতি হুলিয়াও বের করতে হল।

ম্যানরিক আরো দিনকয়েক নারায়ণগড়েই রয়ে গেলেন, নইলে হয়ত সবাই সন্দেহ করবে যে আসামীর পালানোর সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ রয়েছে।

তারপর বর্ধমানে এসে দেখা পেলেন তাঁর কীর্তিমান সহচরের। তখন সে কৃতজ্ঞতায় গলে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য পরম উদ্যোগী হয়ে উঠল ; ম্যানরিকও অচিরেই ধর্মের প্রসার করে হিন্দুস্থানে খ্রীষ্টের মহিমা বৃদ্ধি করলেন।

ম্যানরিকের কিছু আগে বাংলায় এসেছিলেন ইংরেজ পর্যটক ব্রুটন্। তিনি বাঙালীর মেধার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এই বলে যে এ জাতির নৈপুণ্য অসাধারণ। ললিতকলা বা শিল্প-কলা যাতেই হোক না কেন, যে কোনো কারুকার্য এদের চোখের সামনে মেলে ধরলে এরা অচিরেই তার সার্থক অনুকরণ করতে পারবে।

ফরাসী পর্যটক টেভেনো বাংলায় পদার্পণ করেন নি, কিন্তু হিন্দুস্থানের নানা প্রদেশে সফর করেছেন। পরোক্ষ অভিজ্ঞতায়

বলেছেন, বাংলা উর্বর তাই সে দেশের লোক বাস করে অনায়াসলব্ধ আরামে। বন্দরের মধ্যে ফিলিপটন বা পিপলি, সপ্তগ্রাম (হুগলি), কাশিমবাজার, পাটনা ও চট্টগ্রাম পরম ঐশ্বর্যের আগার। বাংলায় ফসল ফলে পর্যাপ্ত ; নানা গঞ্জে শস্য, চিনি, চাল, আদা, বড়মরিচ, সুতী ও সিল্কের কাপড়ের বিপুল সমাবেশ। ফলও ফলে বহু জাতীয় ; এর মধ্যে রয়েছে তরমুজের মত বড় বড় আনারস।

টেভেনোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পশ্চিম ভারতের, তবে বাংলার মসলিন তিনি দেখেছিলেন। এই মসলিন দিয়ে তৈরি হত ধনীদের পাগড়ি। এর পঁয়ত্রিশ 'এল' বা সাঁইত্রিশ গজের ওজন ছিল মাত্র আউন্স চারেক!

ফরাসী জহুরী টেভার্নিয়ার হিন্দুস্থানে এসেছেন বহুবার। এদেশ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। বাংলায় তিনি বহু সফর করেছেন। হিন্দুস্থানের সেকালের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর কথা সত্যি খুব মূল্যবান।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিবনের রোমান রাজত্বের অবক্ষয় ও পতন একখানা বিশ্ববিখ্যাত উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি বলেছেন, রোমান সম্রাটেরা হীরা ক্রয় করতেন হিন্দুস্থান থেকে। টেভার্নিয়ার ভেবেছিলেন, সে হীরা বাংলার। তাই, হীরকের খোঁজে গিয়েছিলেন বাংলায়, রাঁচির নিকটে লোহারডগায়, উড়িষ্যার সম্বলপুরে। কোথায় ছিল সে হীরার খনি? হীরাকুঁদে?

ঢাকার কথা বলতে গিয়ে টেভার্নিয়ার বলেছেন, ঢাকা মস্ত বড় শহর ; লম্বায় দু' 'কসের' বেশি। এক 'কস্' পাঁচ হাজার হাত। এখানে ছুতোর মিস্ত্রীর সংখ্যা অগণিত। তারা নানাজাতীয় নৌকা তৈরির কাজে নিপুণ।

ঢাকার কথা বলতে গিয়ে তিনি ঢাকাই মসলিনের কথাও বলেছেন। মসলিনকে বলা হত 'আব-ই-রওয়ান্' বা চলন্ত জলধারা। তাঁর সামনে একবার উটপাখীর ডিমের আকারের একটি কৌটা খোলা হল ; দেখা গেল, তার মধ্যে রয়েছে একটি পাগড়ি যা লম্বায় ষাট হাত! সে কাপড় এত সূক্ষ্ম যে হাতে নিয়ে তাঁর কোনো স্পর্শবোধই হল না।

কাশিমবাজারে বছরে বাইশ হাজার গাঁট সিল্ক তৈরি হয়। প্রতিটি গাঁটের ওজন একশ পাউণ্ড, অর্থাৎ সবশুদ্ধ মোটামুটি ছাব্বিশ হাজার মন। এর ছয় সাত হাজার গাঁট নেয় ডাচেরা, জাপানে চালান দেবার জন্য। সম পরিমাণ মাল যায় মোগল রাজত্বের চারিদিকে। বাকি দশ বারো হাজার গাঁট দিয়ে কাশিমবাজারেই কাপড় তৈরি হয়।

কাশিমবাজারের সিল্ক প্যালেষ্টাইন বা সিসিলি দ্বীপের সিল্কের মত সাদা নয়। তবে কলা গাছের ক্ষার দিয়ে সহজেই একে সাদা করা হয়। সুতীর কাপড় সাদা করা হয় লেবুর রসে ভিজিয়ে।

পাটনায় পাওয়া যায় অপর্যাপ্ত সল্টপিটার আর বাংলার সর্বত্র নীল। বাংলার নীলের দাম পশ্চিম হিন্দুস্থানের নীলের দামের চেয়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ কম। এদেশে আরো একটি রং পাওয়া যায়, তার নাম লাক্ষা। লাক্ষা থেকে যে শোভন সিঁদুর বর্ণের রং তৈরি হয়, তা দিয়ে রাঙানো হয় সুতীর কাপড়। ডাচেরা লাক্ষা চালান দেয় পারশ্যে। হুগলি, ঢাকা ও পাটনায় পাওয়া যায় অপর্যাপ্ত চিনি।

ভেষজজীবী বার্নিয়ার একটু বিশদ বর্ণনার, হয়ত কারো কারো মতে, একটু অতিশয়োক্তির পক্ষপাতী। তিনি বাংলার প্রশস্তি গেয়ে বলেছেন, বাংলা যাঁরা দেখেন নি তাঁরা হয়ত মিশরকেই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুজলা ও সুফলা দেশ বলে মনে করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিশরের চেয়ে বাংলা সুফলা।

বাংলায় চাল জন্মে প্রচুর। দেশের ও আশপাশের দাবি মিটিয়েও প্রচুর চাল রপ্তানি হয় মাদ্রাজে, লংকায় ও ভারতমহাসাগরের মলডাইভ দ্বীপপুঞ্জে। বাংলার চিনি বিক্রি হয় গোলকুণ্ডায়, কর্ণাট রাজ্যে এমনকি আরব ও পারশ্যের বাজারে বাজারে।

পোর্তুগীজের সহায়তায় বাংলা সুস্বাদু মিষ্টান্ন ব্যবসায়ে অগ্রণী।

বাংলার সাধারণ ফল হল আম, লেবু, আনারস, হরীতকী ও আদা। সবচেয়ে সুস্বাদু আম পাওয়া যায় বাংলাদেশে, গোলকুণ্ডায় ও গোয়ায়। বাঙালী এসব ফল সংরক্ষণ করতেও জানে। গমও জন্মে প্রচুর। দেশের সাধারণ খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে তা দিয়ে

সরস ও সস্তা বিস্কুট তৈরি হয়; সে বিস্কুট সবচেয়ে বেশি কেনে বিদেশী জাহাজের মাঝিমাল্লারা।

এদেশের সাধারণ লোকেরাও ভাতের সঙ্গে তিন চার রকম ব্যঞ্জন খেয়ে থাকে। সঙ্গে থাকে ঘি। ভাল মুরগী পাওয়া যায় টাকায় গোটা বিশেক। ভেড়া ও পাঁঠা সর্বত্রই সহজলভ্য ও সস্তা। বাজারে বাজারে নানা জাতীয় মাছের সমাবেশ, তাজা ও শুঁটকী।

ধর্মের ব্যাপারে বাংলা উদার ও নিরপেক্ষ। জেস্যুয়িট ও অগাষ্টিন পাদরীদের এদেশে গির্জা রয়েছে। তাঁদের ধর্মানুষ্ঠানে কেউ বাধা দেয় না। এক হুগলিতেই আট দশ হাজার খ্রীষ্টান বাস করে।

এদেশে একদিকে আহারের যেমন অভাবিত প্রাচুর্য, অন্যদিকে মহিলাকুলও তেমনি সৌন্দর্যে সুকুমার ও আপ্যায়নে মনোহর। কাজেই পোর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজ (ফরাসী ও দিনেমার তখনো এখানে এসে পৌঁছে নি) বাংলার বড় অনুরক্ত। এর ফলে তাদের মধ্যে একটি প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে; সেটি এই যে বাংলায় ঢুকবার পথ শতাধিক, কিন্তু সেখান থেকে বেরোবার পথ একটিও নেই!

বাংলার তৈরি সুতার ও সিল্কের কাপড়ের প্রাচুর্য দেখলে অবাক হতে হয়। মিহি ও মোটা, রঙিন ও সাদা এত কাপড় আর একসঙ্গে কোথাও দেখা যায় না।

বাংলা দেশ থেকে ভাঁড়ে ভাঁড়ে ঘি সমুদ্রপথে নানাদেশে চালান যায়।

দেশের সর্বত্র সভ্য ও রুচিবান লোকের ঘন বসতি। বিস্তৃত মাঠ শস্যশ্যামল; ধান, আক, শাকসবজি, সর্বপ্রকার ফসলের অফুরন্ত ভাণ্ডার। মাঝে মাঝে ছোট ছোট তুঁতে গাছ, তার মধ্যে অজস্র রেশমীপোকা। এগুলি বাংলার জগদ্বিখ্যাত রেশমের সূতিকাগৃহ।

দেশের প্রাকৃতির দৃশ্য সর্বাপেক্ষা মনোরম হয়ে উঠেছে সুন্দরবনের ছোট ছোট দ্বীপগুলির মধ্যে। এ দ্বীপগুলি প্রায় ছয় সাত দিনের জলপথ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে যেগুলি সমুদ্রের কোল ঘেঁষে আছে, তাদের মধ্যে আরাকানের বোম্বেটে জলদস্যুদের অজস্র অত্যাচারের চিহ্ন; একদা যে এদেশে ঘন বসতি ছিল এখন তা হয়ে পড়েছে শুধু অরণ্য আর অরণ্য, হিংস্র শ্বাপদকুলের আবাসস্থল।

প্রথমে শস্ত্রজীবী পরে ভেষজজীবী ইটালিয়ান মাম্নুচি মোগল রাজত্বের শেষাঙ্কের দর্শক ছিলেন। তিনি বাংলার যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা-ও তার সমৃদ্ধিরই বর্ণনা। সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই মোগল সম্রাট সব চেয়ে বেশি রাজস্ব পেতেন তার অঙ্ক ছিল বছরে চার কোটি টাকা। দক্ষিণ ভারতের পরম ঐশ্বর্যশালী ছুটি সুবা থেকে অর্থাৎ গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর থেকে, এর চেয়ে মাত্র কিছু বেশি রাজস্ব আদায় হত।

বাংলার ঐশ্বর্য ছিল চারটি উদ্ভিজ্জ বস্তু—এক, কার্পাসজাত কাপড় দুই, নীল; তিন, আফিং আর চার, রেশম।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট তাঁর বাংলার ইতিহাস বইখানা ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে উৎসর্গ করে বলেছেন, বাংলায় বছরে যে শস্য জন্মে তা দিয়ে দেশের দুবছরের খাদ্য সংস্থান হতে পারে। তাই, বাংলাকে বলা চলে পূর্বাঞ্চলের শস্যাগার। বাংলার লোকেরা ধুরন্ধর; সর্বশিল্পে পারদর্শী। অন্য কোনো দেশ থেকে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু বাংলা থেকেই নানারূপ চারু ও মহার্ঘ জিনিস পৃথিবীর নানাদেশে রপ্তানি হয়।

অর্থাৎ বাংলা যে কোম্পানির পক্ষে কত বড় সম্পদ সেকথা তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। এই ধান্যপ্রাচুর্যের কথা বলেছেন আরো অনেকে। একজন বলেছেন, বাংলায় বছরে ধানের ফসল হয় তিনবার এত বিভিন্ন প্রকার ধান সেখানে জন্মায় যে প্রত্যেকটি প্রকারের মাত্র একটি করে ধান নিলেও তা দিয়ে একটি বড় কলসী ভরে যায়। একালে একথা বিশ্বাস করবার মত কেউ আছেন কিনা সন্দেহ।

এবার আমরা আরও দুজন বিদেশী অতিথির কথা বলে সেকালের বাংলার পরিচয় আরো একটু পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করব। আমাদের কথা যে কালের এঁরা দুজনই সেকালেরই শেষপাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। একজন ক্লাইভের বন্ধু স্ক্রেকটন, অন্যজন ঐতিহাসিক অর্মি।

বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য ছিল উদ্ভিজ্জ সম্পদ দিয়ে: রেশম, কার্পাস সুতা, চাল, চিনি, আফিং ও নীল। কিছু কিছু পাটের চাষও ছিল, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে। এই উদ্ভিজ্জ বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পও অবশ্য

কিছু গড়ে উঠেছিল। সাধারণ গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজস-পত্র, চাষ আবাদের উপযোগী সাজ সরঞ্জাম, ছুতোর মিস্ত্রী প্রভৃতির যন্ত্রপাতি সবই প্রায় প্রতি গ্রামেই তৈরি হত। মোটামুটি গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ম্ভর। কিন্তু শিল্প ক্রমে বেড়ে উঠল রেশম ও কার্পাসের অবলম্বনে। প্রথমটি পশ্চিমবঙ্গে, দ্বিতীয়টি পূর্ববঙ্গে।

এর পূর্বে তো বটেই, এমনকি অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগেও বাংলা হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশের অনেক মালের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরেও নানা দ্রব্যসম্ভার পাঠাত। মাদ্রাজে যেত চাল, পাট, পাটের দড়ি, খাদ্যতেল ও সল্টপিটার। সল্টপিটার পাওয়া যেত পাটনায়; পাটনা তখন ছিল বাংলার অন্তর্ভুক্ত। নুন ও চিনি যেত দিল্লি ও আগ্রা। চিনি, আফিং, নানা প্রকার শস্য ও সুতীর কাপড় যেত আরবে, পারশ্যে। নীলের চাষ তখন হ্রাস পেয়েছে; তার কারণ অন্যত্র বলা হয়েছে। এছাড়া পাশ্চাত্যের বণিকেরা আরো অনেক জিনিস নিয়ে যেত; সেকথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটের উপর সেকালে বাংলা ছিল সর্বদেশীয় বণিকের তীর্থক্ষেত্র। পাশ্চাত্যের নানা দেশীয় বণিকের দল ছাড়াও এখানে পারশ্য, আরব, এবিসিনিয়া (আফ্রিকা) ও তুর্কীস্থান থেকে সওদাগরেরা আসত। আর আসত ইহুদী ও আর্মেনিয়ানরা। সমগ্র প্রাচ্যে বাংলাই ছিল সেকালে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র।

বলাবাহুল্য এ কেন্দ্রের প্রধান পণ্য ছিল রেশম ও কার্পাস-জাত দ্রব্য। বাংলার জাতীয় শিল্পও ছিল বস্ত্রবয়ন। মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ ও পিতলের বাসনপত্র, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, ঢাকার সূচী-কর্ম ও শঙ্খ শিল্প, ঢাকা ও কটকের বিবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার, দেশে ও বিদেশে পরম আদরণীয় হয়েছিল বটে, তবে বাংলার বস্ত্রের মর্যাদার তুলনায় সে গৌরব হীনপ্রভ।

ঢাকার অপূর্ব শঙ্খশিল্পের জন্য কাঁচা মাল অর্থাৎ শঙ্খ জোগাত কে? জোগাত ডাচেরা; এ কারবার ছিল তাদের একচেটিয়া। সমুদ্র থেকে শঙ্খ তোলা হত মান্নার উপসাগরে। এ উপসাগর হল মাদ্রাজের দক্ষিণ উপকূলের বন্দর তুতিকোরিণ ও লংকার উপকূলের বন্দর মান্নারের মধ্যে। সেখান থেকে তারা সব শঙ্খই চালান দিত বাংলায়।

কখনো কখনো তারা শঙ্খ নিয়ে আসত পারস্য উপসাগর থেকে। সে মালের কদর ছিল বেশী আর সেখানে শঙ্খ সংগ্রহ করা যেত সার বছর ধরে।

ডাচেরা ছিল মান্নার উপসাগরের একচ্ছত্র সম্রাট। এখানে শুধু শঙ্খ নয়, ঝিনুক তুলে মুক্তাও সংগ্রহ করা হত—প্রতি বছর মা থেকে মে মাস পর্যন্ত। হাজার হাজার ডুবুরী এ কাজ করত; এর সবাই ছিল মৎস্যজীবী। সাগরাধিপতি ডাচ অর্থের বিনিময়ে এদে এ কাজ করবার অনুমতি দিত। এজন্য তারা খ্রীষ্টানদের কাছে খাজন নিত জনপ্রতি বারো টাকা; হিন্দুদের কাছে আঠারো টাকা আর মুসলমানদের কাছে চব্বিশ টাকা।

ডাচ পাকা ব্যবসায়ী জাত। তারা গাছেরও খেত আবার তলারও কুড়াত; এ সময়ে ডুবুরীদের কাছেই চাল, ডাল, নুন, মাছ ইত্যাদি বিক্রি করে আবার আরো দু পয়সা ঘরে তুলত।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এ বস্ত্র শিল্পের রূপ দ্বিবিধ; কার্পাস ও রেশম। কার্পাস-শিল্প ছিল বাংলার পূর্ব রাজধানী ঢাকা—কেন্দ্রিক রেশম, পরবর্তী রাজধানী মুর্শিদাবাদের সম্পদ। মুর্শিদাবাদের কথ পরে আসবে; এখন কার্পাস-শিল্পের কথাই বলা যাক। বাংলার রেশম-শিল্পের অস্তিত্ব এখনও বা কিছু বজায় আছে, কিন্তু কার্পাস-শিল্পের চিহ্ন রয়েছে এখন মাত্র ইতিহাসের পাতায়।

কার্পাস-শিল্পের পরম গৌরব মসলিন বা আব-ই-রওয়ান্ বাণিজ্যের দপ্তরে এর পুরানো নাম ছিল, 'বিয়েটিলহা'। কথাটা বোধ হয় পোর্তুগীজ শব্দ 'বিয়েটা' (Beata) বা সন্ন্যাসিনী থেকে এসেছে 'nun' বা সন্ন্যাসিনীরা পরত ওড়না, আর মসলিন ছিল ওড়নার পক্ষে পরম উপযোগী। এ কাপড়ের সূক্ষ্মতার পরিমাপ কল্পনাগত মসলিন ছাড়া মোটা কাপড়ও অবশ্য অনেক রকম তৈরি হত; সাদা ও রঙিন। এ সব কোরা কাপড়ের কিছুটা অংশ সাদা করা হত বাংলায়ই, আবার কিছুটা বা হিন্দুস্থানেরই অন্যান্য বন্দরে বিশেষ করে পশ্চিম উপকূলের বন্দর ব্রোচে। এই মোটা সুতী কাপড়েরই কিছুটা অংশ কালিকট বন্দর থেকে 'ক্যালিকো' নাম নিয়ে চলে যেত দেশ-দেশান্তরে। ইংলণ্ডে এই ক্যালিকোর প্রথম আমদানি হয় ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে

রঙিন ক্যালিকোর পরিচ্ছদ পরিধান করে রাণী দ্বিতীয় মেরি নূতন ফ্যাসানের প্রবর্তন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের ঘরে ক্যালিকোর মর্যাদা রাতারাতি বেড়ে যায়। রঙিন ক্যালিকোর পরিচ্ছদ, পরদা শয্যা-আরবণী, কুশন ইত্যাদিতে দেশ ছেয়ে যায়। এর ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের ক্ষতি হয় অসামান্য। তাই ক্রমে আইন করে ইংলণ্ডে ক্যালিকোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। পরে এর আমদানি হত শুধু অন্যদেশে রপ্তানির জন্য, বিশেষ করে হল্যাণ্ডের বন্দর আমষ্টারডামে

এবার মসলিনের কথা বলা যাক।

মসলিন তৈরি হত ঢাকায়, সোনারগাঁয় ও ধামরাই-এ। সোনারগাঁ ও ধামরাই ঢাকা থেকে বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে; সোনারগাঁ পূবে, ধামরাই উত্তরে।

মসলিনের সুতা হাতে কাটত সাধারণত অল্পবয়সী হিন্দুমেয়েরা; এদের বয়স ছিল আঠারো থেকে ত্রিশের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি কমে যেত বলে আরো বেশি বয়সের মেয়েরা এত সূক্ষ্ম সুতা হাতে কাটতে পারত না। বস্ত্র বয়ন করত পুরুষেরা। বয়নের সাজ সরঞ্জাম ছিল অতি সাধারণ। সর্বত্রই এ কাজ করত হিন্দুরা শুধু সোনারগাঁয়ে মুসলমানেরাও একাজ করত।

মসলিনের সুতা কিন্তু কখনো চরকায় কাটা যেত না; সবই তৈরি হত হাতে। এর চেয়ে মোটা সুতা তৈরি হত চরকায়। মোটা কাপড় বেশী তৈরি করত হিন্দু যুগীরা আর মুসলমান জোলারা। তারাও বাস করত ঢাকারই আশপাশে।

মসলিনের জন্য কার্পাস পাওয়া যেত কোথায়? ঐ ঢাকারই সন্নিকটে। এখন যাকে ভাওয়াল পরগণা বলা হয় তা জুড়ে পূর্বে বহুবিস্তৃত কার্পাসের চাষ ছিল। ঢাকার অদূরে 'কাপাসিয়া' গ্রাম সে কার্পাস তুলার স্মৃতি বহন করে রয়েছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানের কালে, সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে, মসলিন দিল্লিতে বাদশাহের অন্তঃপুরে স্থান পায়। হয়ত নূরজাহান তাঁর পূর্ব স্বামী শের আফগানের সঙ্গে বাংলায় ঘর করতে এসে প্রথম মসলিনের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর কালে একখানা সরেস মসলিন শাড়ির দাম ছিল শ চারেক টাকা।

এমন যে শিল্প যা এখন অলৌকিক বলেই মনে হয়, তা লুপ্ত হয়ে গেল কেন? এর কারণ বহুবিধ। হয়ত কিছুটা হল ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী তুলে নিয়ে যাওয়ার ফলে, কিছুটা পূর্ব-বঙ্গে পোর্তুগীজ ও মগের অত্যাচারে, কিছুটা নবাবদের সস্নেহ দৃষ্টির অভাবে, কিছুটা বিদেশী বণিকের ষড়যন্ত্রের পরিণামে। কিন্তু যে পুরুষানুক্রমে অর্জিত অভিজ্ঞতা, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও শিল্পানুরক্তির মধ্যে এর জন্ম হয়েছিল আধুনিক জগতে মানব-সমাজ কি তা আর ফিরে পাবে? না পেলে, মসলিনেরও আর পুনর্জন্ম হবে না।

সেকালে চাষের কথা বলতে গিয়ে স্ক্রেফটন বলেছেন যে তখন জলসেচের ছিল খুবই সুব্যবস্থা। এজন্য বাঁধ দিয়ে উচ্চস্থানে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হত। শায়েস্তা খাঁর আমলে, অর্থাৎ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছু পরে, টাকায় আট মন মোটা চাল পাওয়া যেত। এমনকি ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দেও মুর্শিদাবাদে টাকায় সাড়ে সাত মন চাল বিক্রি হয়েছে।

আধুনিক অর্থবিদ্যা বিশারদরা বলেছেন, এই অপার সুলভতা দেশের আর্থিক সংগতির ক্ষীণতারই ইঙ্গিত। এ নিয়ে হয়ত বাদানু-বাদ চলতে পারে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সেকালে দেশের লোক দুবেলা পেটভরে খেতে পেত, আর পরনেও তাদের যথাযোগ্য কাপড় ছিল। অবশ্য প্রভূত অর্থ ছিল দেশের জনকয়েক জমিদার, ব্যাঙ্কার ও বণিকের হাতে। তাঁরা অবশ্য পুঁজি করতেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত, তবে দেশের লোককে একেবারে নিরাহারে মেরে ফেলে নয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দল অবশ্য তখনো জন্মগ্রহণই করে নি।

বিদেশী পর্যটকদের চোখে সেকালে বঙ্গজননী এমন অপরূপ রূপেই প্রতিভাত হয়েছিলেন। বাংলা যে তখন অন্নাভাব ও বস্ত্রা-ভাবের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না একথা সবাই সমস্বরে বলে গেছেন। তারপর, সেকালের বাংলার রাজস্বই যে ক্ষীয়মাণ মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান বল ও ভরসা ছিল এ কথা তো ইতিহাস-বিশ্রুত। অবশ্য শায়েস্তা খাঁর আমলেই বাংলাদেশ থেকে প্রথম রাজস্ব আদায় হতে শুরু হয়। এর পূর্বে এখান থেকে নগদ রাজস্ব পাওয়া

যেত না ; পাওয়া যেত উপঢৌকন হিসাবে কয়েকটি হাতি ও কিছু শিল্প দ্রব্য।

বাংলার এই পরম ঐশ্বর্যের লোভেই ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ ও দিনেমার ফলাও করে এদেশে তাদের কারবার শুরু করেছিল। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র বাংলাদেশ থেকেই ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মোট সাড়ে আঠারো লক্ষ টাকার পণ্য দেশে চালান দেয় ; আজকালকার হিসাবে এ মালের দাম কয়েক কোটি টাকা। এ থেকেই বাংলার সম্পদের একটা পরিমাণ আন্দাজ করা যাবে।

এবার সেকালের বাংলার ঐশ্বর্যের প্রতীক মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের কথা বলা যাক। সঙ্গে সঙ্গে আসবে সমকালীন লণ্ডনের কথা।

পূর্বতন মক্‌সুদাবাদ বা পরবর্তী কালের মুর্শিদাবাদের বাজার জমজমাট হতে শুরু করে সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগেই। দেশটি খুবই পুরনো ; সপ্ত শতকে, অর্থাৎ এখন থেকে তেরো চৌদ্দ শ বছর আগে, এর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ। সেকালের চীনের প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েনসাং-এর বিবরণেও এর উল্লেখ রয়েছে। সেকালে এ শহরের পরিধি ছিল সাত মাইল। কর্ণসুবর্ণ নগরটি ছিল গৌড়ের অর্থাৎ বাংলার রাজা শশাঙ্কের রাজধানী।

মুর্শিদাবাদের গা ঘেঁষেই কাশিমবাজার, সৈদাবাদ ও কালিকাপুর। এগুলি প্রকৃতপক্ষে একই শহরের বিভিন্ন অংশ মাত্র। ইংরেজ এসে কুঠি করল কাশিমবাজারে, ফরাসী সৈদাবাদে, আর ডাচ কালিকাপুরে, ১৬৫৮ থেকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ কলকাতা শহরের পত্তনের প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বছর আগে।

মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের প্রধান পণ্য রেশম। কুঠিগুলি ফ্যাক্টরি ; সেখানে রেশমের সুতা ও কাপড় তৈরি করা হত। এগুলি আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পূর্বপুরুষ। ডাচের কুঠিতে কাজ করত প্রায় আট শ লোক, ইংরেজের কুঠিতেও লোকের সংখ্যা অনুরূপ ; ফরাসীর কিছু কম। কর্মীর সংখ্যা বিবেচনা করেই কুঠির কাজের পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক

বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা

রেনেলের মানচিত্র অনুসারে

১৭৭৯

অযোধ্যা
বে তি য়া
ত্রি হু ত
গণ্ডক নং
গঙ্গা নং
পাটনা
চুনার
শোন নং
গয়া
পা লা মৌ
হাজারীবাগ
গঙ্গা নং
ভাগলপুর
রাজমহল
মালদহ (গৌড়)
জঙ্গীপুর
কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদ)
ভাগীরথী
কাটোয়া
বর্ধমান
কৃষ্ণনগর
কালনা
বিষ্ণুপুর
হুগলি
চুঁচুড়া
চন্দননগর
শ্রীরামপুর
চন্দ্রকোণা
বারাসত
বাঁকিবাজার
বরাহনগর
কলিকাতা
মেদিনীপুর
হরিহরপুর
পিপলি
বালাসোর
হুগলি নং
সু ন্দ র ব ন
স্ত ন্দ র গ ড়
সম্বলপুর
ব্রহ্মপুত্র নদ
যমুনা নং
ব্রহ্মপুত্র নদ
শ্রীভূমি
ধামরাই
টোক
ঢাকা
সোনারগাঁ
পদ্মা নং
ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম
গঙ্গা নদীর মোহনা
A. Dutta

আর্মি বলেছেন, মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে বাংলাই ছিল সর্বশীর্ষে। পাশ্চাত্যের সকল বণিক-সঙ্ঘেরই সবাপেক্ষা বেশি মূলধন খাটত এ দেশে আর তার বেশির ভাগই নিয়োজিত ছিল রেশমের কাজে। তাই, ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসী সকলেই দাদন ও স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির সূত্রে বাংলার সাথে এত জড়িত হয়ে পড়েছিল যে এদের কারোর এ দেশ থেকে বাণিজ্য-পাট গুটাতে হলে সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের সমস্ত কারবারই নষ্ট হয়ে যাবার কথা। তাই, আমরা যে যুগের কথা বলছি সেকালে বাংলাই ছিল পাশ্চাত্য বণিকদের একমাত্র ভরসাস্থল আর বাংলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার তারপর কলকাতা। এই ভরসার ফলে, ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে, জব চার্ণকের আমলে, যখন ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে দু লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড, তার এক লক্ষ চল্লিশ হাজারই পড়ল মুর্শিদাবাদের ভাগে।

বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে, অর্থাৎ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পনের ষোলো বছর, মুর্শিদাবাদের 'দোগানা'য় বা শুল্ক বিভাগের দপ্তরে গড়পড়তা সাড়ে সাতাশি লাখ টাকার রেশম উৎপাদনের কথা দেখা যায়। এ হিসাব থেকে বিদেশী বণিকদের উৎপাদন বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ, হয় তাদের কোনো শুল্ক লাগত না, নয় তারা শুল্ক দিত হুগলিতে। এদের উৎপাদন অন্তত সাধারণ উৎপাদনের অনুরূপ ধরে নিলেও, বাংলায় বছরে রেশম তৈরি হত প্রায় পৌনে দু কোটি টাকার। এ কালেই ইংরেজের হিসাবের খাতায় দেখা যায় কাঁচা রেশমের দর ছিল সাড়ে চার টাকা সের। কাজেই বাংলায় সত্তর আশি হাজার মন রেশম তৈরি হত বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। বাংলার ধান ও বাংলার রেশম বাঙালীকে, মাত্র দু-তিন শ বছর আগে, সমগ্র হিন্দুস্থানে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী করে রেখেছিল।

অর্থনীতিক ব্যাপারে বাংলার নবাবের কর্ণধার ছিল ব্যাঙ্কার জগৎশেঠ; মুর্শিদাবাদে নবাবের পরেই ছিল এর আভিজাত্য। জগৎশেঠ কিন্তু কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, এটা এই ধনাগারপতি শ্রেষ্ঠীদের উপাধি বা সাধারণ নাম। মোগল দরবার থেকে এ উপাধি দেওয়া

হয়েছিল। এর অর্থ জগৎ, অর্থাৎ সারা জগতের শ্রেষ্ঠী। নবাবের সমস্ত আর্থিক কারবার চলত জগৎশেঠের গদিতে, এখন যেমন আমাদের দেশের গভর্ণমেন্টের সকল কারবার চলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। এই সংস্থার অধিপতি ছিলেন যোধপুরের নগর পরগণার এক রাজস্থানী পরিবার। শুধু মুর্শিদাবাদেই নয়, এঁদের কারবার পাটনায় ও দিল্লিতেও ছিল। সেখানেও এঁরা পাটনার নবাব ও দিল্লীর বাদশাহের ছিলেন কোষাধ্যক্ষ।

জগৎশেঠ শুধু ব্যাঙ্কারই ছিলেন না, মুর্শিদাবাদে নবাবের টাঁকশালের সমস্ত ভারও ছিল তাঁরই উপরে। পূর্বে রাজমহল, ঢাকা ও পাটনায় টাঁকশাল ছিল, ক্রমে এ সব বন্ধ হয়ে একমাত্র টাঁকশাল হল মুর্শিদাবাদে। দেশে ছিল রৌপ্যমান, অর্থাৎ রূপার টাকাকে প্রমাণ বলে ধরে নিয়ে সকল জিনিসের মূল্য নির্দ্ধারিত হত।

জগৎশেঠ রূপা কিনে নিয়ে টাঁকশাল চালাতেন। অন্যান্য প্রদেশের টাঁকশালে তৈরি টাকা, বিদেশীদের আমদানি সোনা রূপা সবই তাঁরই কাছে নিয়ে আসতে হত। তিনিই এ সকলের মূল্য নির্ধারণ করতেন। এসবের বিনিময় হার ঠিক করে দিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তাঁর বছরে দালালিই মিলত আট নয় লাখ টাকা। বর্গির হাঙ্গামার কালে, ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর বাড়িতে একবার হানা দিয়ে বর্গিরা লুঠ করেছিল দু কোটি টাকা। কিন্তু সমুদ্রে বারি বিন্দুর অভাবের মতই, তাঁর এ ক্ষতির কথা তিনি বিন্দুমাত্রও অনুভব করতে পারেন নি।

এ ছাড়া, নবাব, জমিদার দেশী ও বিদেশী বণিকদের ধার দিতেন চড়া সুদে।

'জগৎশেঠ'কে কেউ তুলনা করেছেন 'ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডে'র সঙ্গে, কেউ করেছেন সেকালের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী 'রথচাইল্ডে'র সঙ্গে। অর্থের বলে তাঁর যে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল তার তুলনা হয় না। ইনি পলাশীর রণরঙ্গে পরোক্ষ নায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। রাজশক্তি তো বটেই, দেশী ও বিদেশী সকল বণিক সম্প্রদায়ই এঁর সঙ্গে সর্বদা মিতালি করে চলত। মুর্শিদাবাদের মহিমাগঞ্জে জগৎশেঠদের অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনো বিদ্যমান।

এ কুলের শেঠকে ইংরেজ-বিদ্বেষী নবাব মীরকাশিম মুঙ্গেরে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারেন, এঁর ইংরেজ-প্রীতির জন্য।

ভাগীরথীর তীরে মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের বিস্তৃতি ছিল মাইল দুই। সেকালে এখানে ছিল লক্ষাধিক লোকের বাস। রাস্তা ছিল অপ্রশস্ত। বেশির ভাগ বাড়িই পাকা। বসতি এত ঘন যে পাশা-পাশি সব পাকা বাড়িগুলির ছাদ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে সারা শহর পরি-ক্রম করে আসা যেত।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ এ শহর সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছিলেন। তিনি বলেছেন, আয়তন, লোকসংখ্যা ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে লণ্ডনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের তুলনা চলে। কিন্তু এ তুলনায় একটু বৈষম্য থেকে যায়। মুর্শিদাবাদের মত লণ্ডনে এত অধিক সংখ্যক ঐশ্বর্যশালী লোক নেই, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট বিত্তশালীর সংখ্যা লণ্ডনের ধনীদের চেয়ে অনেক বেশি। অবশ্য ধনকুবের ইহুদী রথ-চাইল্ড তখনো লণ্ডনে এসে তাঁর ব্যবসা শুরু করেন নি ; করেছিলেন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের তখন সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়েছে আর, লণ্ডনের যে স্বর্ণকারের দল এতদিন দেশের সর্বকার্যের, এমন কি রাজকার্যেরও, মূলধন জোগাত, তারাও তখন লণ্ডনে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। কাজেই মধ্যমণি জগৎশেঠের কথা বাদ দিলেও, মুর্শিদাবাদে সেকালে যে আরো মহাবিত্তশালী লোকের অভাব ছিল না তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

এদিকে ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মূল কেন্দ্র ছিল লণ্ডনে। তাদের জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কারখানাও ছিল সেখানে। কোম্পানির ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কাজ অভাবিতরূপে বেড়ে যেতে লাগল। হিন্দুস্থানের সঙ্গে ব্যবসায়ে লাভের মাত্রাও ক্রমাগতই বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, কাঁচা রেশম লণ্ডনে এনে তা দিয়ে লণ্ডনের স্পিটলফিল্ডস পাড়ায় কাপড় তৈরি করে বণিকেরা নানা দেশে রপ্তানি করতে শুরু করল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান লাভের ফলে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে লণ্ডনের মূর্তিও হল পরিবর্তিত। লোক সংখ্যা বাড়তে লাগল, ব্যবসায়ীদের হাতে জমল

প্রচুর অর্থ। ইংল্যাণ্ডের অন্য সকল বন্দরের প্রভা ম্লান করে দিয়ে লণ্ডন সমগ্র ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য-জগতের কেন্দ্রস্থল ও মধ্যমণি হয়ে উঠল। এ সকলই সম্ভব হল হিন্দুস্থানের, বিশেষ করে বাংলার, সঙ্গে সম্পর্কের ফলে।

আধুনিক লণ্ডনের রূপ দেখে তার সপ্তদশ শতকের মূর্তির কল্পনা করা যাবে না। সেকালের লণ্ডন ছিল অর্ধেক শহর, অর্ধেক গ্রাম। সাধারণ লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। এমনকি শহরের মধ্যেও বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের অফিস ও বাসস্থান তৈরি হত সরু কাঠের উপর সামান্য চুন ও সুরকির পলস্তারা দিয়ে। মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের ঘরবাড়ি যে এর চেয়ে ভালো ছিল তাতে সন্দেহ নেই, এর চেয়ে স্বাস্থ্যকর তো বটেই।

এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য সেকালে লণ্ডনে প্লেগের আক্রমণ হল বহুবার। সে আক্রমণের প্রকোপ এত তীব্র যে সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভেই লণ্ডনের হাজার ত্রিশেক লোক মারা গেল। দ্বিতীয়বার প্লেগ দেখা দিল বিশ-বাইশ বছর পরে। সে বারেও এর চেয়ে কম লোক মারা গেল না।

এর পরে দেশের আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের রূপ বদলাতে শুরু করল এবং প্লেগের প্রকোপও কমে আসল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে হল এক বীভৎস অগ্নিকাণ্ড। শহরের বাড়ি ঘরের অবস্থার কথা তো আগেই বলা হয়েছে; সেখানে আগুন একবার লাগলে তা নিভানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। দমকলের সৃষ্টি অবশ্য তখনো হয় নি। আগুন প্রথম লাগল ঠিক শহরের মধ্যস্থলে ব্যবসায়ীদের পাড়ায় আর তা জ্বলল পাঁচ দিন ধরে। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ঘরবাড়িই হল ভস্মীভূত; নিশ্চিহ্ন হল নব্বুইটি গির্জা। সেন্টপলস ক্যাথিড্রেল এর মধ্যে প্রধান। অগ্নিদাহের পরে যে নবরূপে এ গির্জা দেখা দিল তা ইংলণ্ডের সেকালের বর্ধমান ঐশ্বর্যেরই প্রতীক।

লণ্ডনের মত, ইংরেজের কলকাতা শহরও ধ্বংস হয়েছিল ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ে। এর আগে কলকাতার বাড়ি ঘর ছিল বেশির-ভাগই কাঁচা অর্থাৎ বাঁশ, শণ ও বেতের তৈরি। এই বিপর্যয়ের ফলে

সৃষ্টি হল সব পাকাপোক্ত অট্টালিকার। তখন থেকেই কলকাতার রূপ-পরিবর্তনের শুরু হল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আশাতিরিক্ত লাভের ফলে লণ্ডনের ব্যবসায়ীর দল তখন এতই বিত্তশালী হয়েছে যে এ অগ্নিদাহের বিপুল ক্ষতিকেও তারা ক্ষতি বলেই মনে করতে পারল না। এই ভস্মীভূত, অশোভন ও সহজদাহ্য গৃহের বদলে তারা পাকা ইমারত গড়ে তুলল। লণ্ডনের রূপ এবার আরো বদলে গেল।

বাংলার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করে, মুর্শিদাবাদ-কাশিম-বাজারের কথা মনে রেখে, পলাশীর যুদ্ধের পরে ক্লাইভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক সভার সভাপতিকে বলেছিলেন, পলাশীর যুদ্ধ জয় করে আমার নিজের আর বিশেষ কি লাভ হয়েছে? সত্যকথা বলতে কি, অর্থের দিক থেকে আমি নিজের আত্ম-সংযমের কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই। আমি যে কি অবস্থায় পড়েছিলাম তা একবার চিন্তা করে দেখুন। একটা মহা ঐশ্বর্যশালী দেশের নবাব সহসা আমার তাঁবেদার হয়ে গেল। লণ্ডনের চেয়ে ধনে ও জনে অধিকতর সমৃদ্ধ একটি নগরী পড়ল আমার পদতলে, আর সেখানকার বড় বড় ধনপতির দল আমার একটু কৃপাভিক্ষার জন্য একে অন্যের প্রতিযোগিতা করতে শুরু করল।

ক্লাইভের কথাটা কিন্তু বিন্দুমাত্রও অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট নয়। ইচ্ছা করলেই ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের সমস্ত ঐশ্বর্য লুট করে নিতে পারতেন, যেমন করেছেন নাদির শা বা আবদালীর দল হিন্দুস্থানের অন্যত্র। তিনি নাকি এত বড় একটা কাজের জন্য মাত্র দু লক্ষ পাউণ্ড পারিতোষিকেই মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অন্যত্র দেখা যায়, পলাশীর প্রহসনে ইংরেজ অভিনেতাদের, অর্থাৎ ক্লাইভ, ড্রেক, ওয়াটস প্রভৃতির ভাগে পড়েছিল বার লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ডের কিছু বেশি, আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষতি পূরণ করা হয়েছিল আঠারো লক্ষ পাউণ্ড দিয়ে। টাকার অঙ্ক যাই হোক সেটা যে অপরিমিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ক্লাইভের বন্ধু স্ক্রেফটন ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। তিনি বলেছেন, এই প্রাপ্তির ফলে শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা হিন্দুস্থানেই ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পরবর্তী

তিন বছর ফলাও করে বাণিজ্য করেছে দেশ থেকে এক আউন্সও সোনা, রূপা না এনে। এর পূর্বে বছরে অন্তত দশ লক্ষ টাকার সোনা, রূপা তাদের দেশ থেকে এদেশে নিয়ে আসতে হত, কারণ এদেশে তাদের কোনো মালই বিশেষ বিক্রি হত না।

ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা শেষ হল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, আর কোম্পানির পরিসমাপ্তি ঘটল আরো পঁচিশ বছর পরে—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। এ কোম্পানির মূলধন ফিরিয়ে দিতে হল তাদের অংশীদারদের। কে দিল সে টাকাটা? হিন্দুস্থানীরা! তা কত টাকা? মোটামুটি, প্রতি পাউণ্ড দশ টাকা হারে, একান্ন কোটি টাকা। এ টাকাটা পাঁচ বছর পরে সুদশুদ্ধ দাঁড়াল সাতানব্বুই কোটি টাকায়!

এই ন্যায়নীতিই চিরদিন বজায় রইল এক নির্বোধ, অসহায় নাবালক ও তার নিরঙ্কুশ অছির মধ্যে। সে অছির অছিলার অন্ত ছিল না।

কিন্তু ক্লাইভ আরো সুদূরপ্রসারী শোষণের ব্যবস্থা করলেন। তিনি হিন্দুস্থান ও লণ্ডনের মধ্যে যে রাজস্ব-ঠিকাদারি ও বাণিজ্য-ব্যবস্থা কায়েম করলেন তার ফলে অচিরেই ইংলণ্ড হিন্দুস্থানের সর্বৈশ্বর্যে ভূষিত হল। দৈন্য ও সমৃদ্ধির এই পরস্পর স্থান পরিবর্তন সহসা কারো চক্ষু ধেঁধে দেবার মত নয়। চোখে পড়লেও, এর কদর্যতা এত তীব্র ও মর্মস্পর্শী হবে না যেমন হবে নাদির শার কথা। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি; নইলে ইংলণ্ডের তথা লণ্ডনের পরম ঐশ্বর্য দেখে তার মুর্শিদাবাদের কথা মনে পড়ে না কেন? মুর্শিদাবাদের কাহিনী তো প্রাচীন ইতিহাস নয়, মাত্র দু শ বছর আগের কথা।

আরো মনে পড়ে না তার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মর্মান্তিক ঘটনা যা ঘটেছিল পলাশীর অভিনয়ের মাত্র তেরো বছর পরে। বাংলার মত এমন একটা মহা ঐশ্বর্যশালিনী দেশ যেন জাদু মন্ত্রে নিমিষে ভিক্ষুকের রাজ্যে পরিণত হয়ে গেল। বাংলার চাষ গেল, ব্যবসা গেল, অন্তর্হিত হল গোলা ভরা ধান আর গোহালভরা গরু। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লোক সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশও অর্থাৎ দু কোটি মানুষ লুপ্ত হয়ে গেল।

বাংলার লক্ষ্মী ইংরেজের বাণিজ্য জাহাজে চড়ে শ্বেতদ্বীপ যাত্রা করলেন!

॥ ছয় ॥

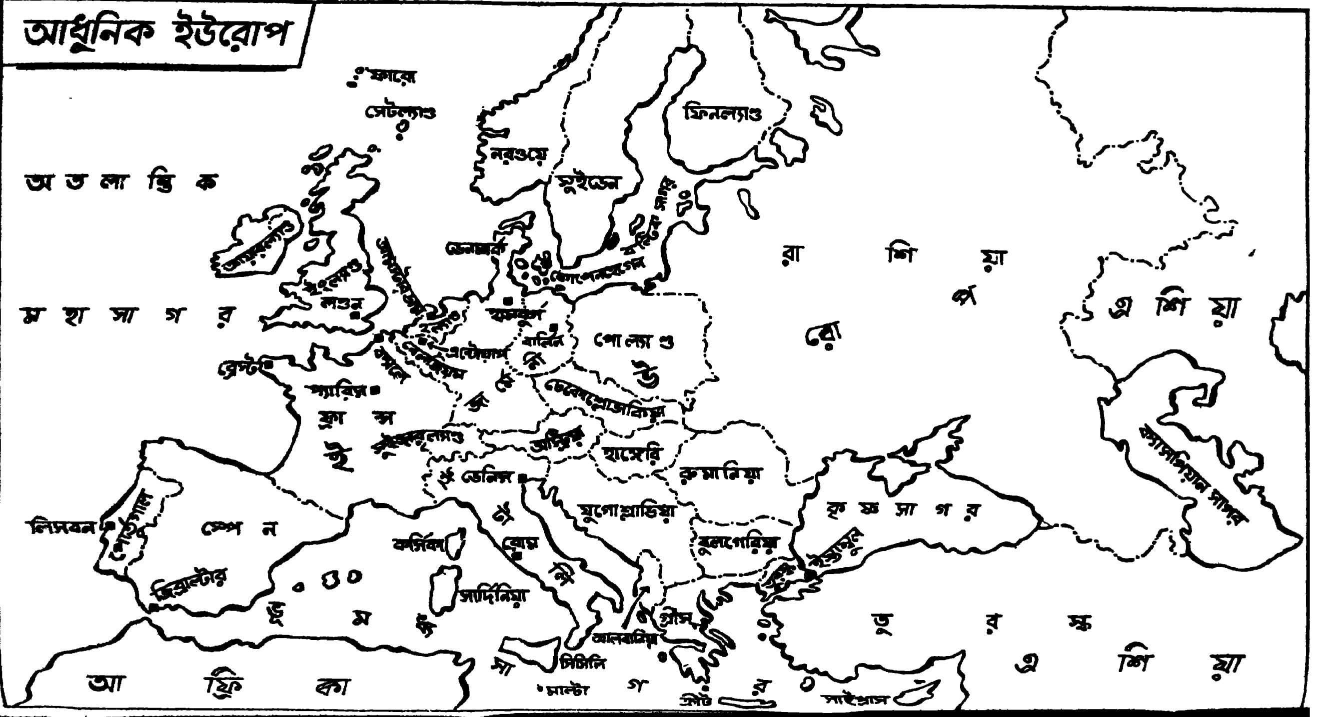
সর্বশেষ এল এবার ইংরেজের কথা।

নেপোলিয়ান বলেছেন, ইংরেজেরা দোকানদারের জাত। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নেপোলিয়ান অষ্টাদশ শতকের মানুষ; তাঁর সময়ে তবু ইংরেজের দেশে চাষ-আবাদের কাজ ভালোভাবেই চলত। এরপর ইংলণ্ডে চাষের সর্বনাশ হল উনবিংশ শতকের শেষপাদে, বিশেষ করে আমেরিকা থেকে অবাধ শস্য আমদানির ফলে। চাষের পাট গুটিয়ে পরবর্তীকালে ইংরেজ পুরোপুরি ব্যবসাদারের জাত হয়ে দাঁড়াল।

ইংরেজের আদিম ব্যবসা পশমের। মেষপালন ছিল তাদের জাতীয় কর্ম। বহুকাল থেকে তাদের অর্থ ও সামর্থ্য একাজেই বেড়ে উঠেছিল। চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে মেষপালন চলত সর্বত্র; ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, জমিদার, ধর্মযাজক সকলেই পশম তৈরি করে বিক্রি করত। এমনকি কারো মেষপালের সংখ্যা ছিল সহস্র, কারো দশ সহস্র, কারো তারো বেশি। সাধারণ চাষী গৃহস্থেরাও সমবায় পদ্ধতিতে মেষপালন করে পশম তৈরি করত।

সারা ইউরোপে ইংল্যাণ্ডের পশমের কদরও ছিল অসামান্য। দশম ও একাদশ শতকে ইউরোপের মধ্যে ফ্ল্যাণ্ডার্সে, অর্থাৎ বেলজিয়ামে ও ইটালিতে পশমের কাপড় বোনা হত সব চেয়ে সরেস; এসব কাপড় ইংল্যাণ্ডের পশমেই তৈরি হত। অন্যদেশের পশমে এত ভাল কাপড় তৈরি করা যেত না। এই ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে একদল তাঁতি গিয়ে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করতে শুরু করে। তাদের কাছে কাপড় বোনা শিখে ইংরেজেরা এতে দক্ষতা লাভ করে। এর ফলে ইংরেজের আর্থিক সমৃদ্ধি বেড়ে যায়।

ইউরোপের সকল দেশে, বিশেষ করে ইটালিতে ও বেলজিয়ামে, পশম চালান দেবার জন্য ইংরেজেরা তাদের ঘাঁটি তৈরি করে প্রথম ইংল্যাণ্ডের মধ্যেই। তারপর সে ঘাঁটি তুলে নিয়ে যায় ফ্ল্যাণ্ডার্সে; পরে ফ্রান্সের ক্যালেতে। ক্যালে ছিল তখন ইংল্যাণ্ডের অধিকৃত রাজ্য।


আধুনিক ইউরোপ
ফারো
সেটল্যাণ্ড
অতলান্তিক মহাসাগর
নরওয়ে
সুইডেন
ফিনল্যাণ্ড
ডেনমার্ক
কোপেনহেগেন
রাশিয়া
এশিয়া
ইউরোপ
লণ্ডন
হামবুর্গ
বার্লিন
পোল্যাণ্ড
ব্রেস্ট
প্যারিস
ফ্রান্স
চেকোশ্লোভাকিয়া
অস্ট্রিয়া
হাঙ্গেরি
রুমানিয়া
ভেনিস
যুগোশ্লাভিয়া
কৃষ্ণ সাগর
ক্যাস্পিয়ান সাগর
লিসবন
পোর্তুগাল
স্পেন
কর্সিকা
রোম
ইতালি
বুলগেরিয়া
জিব্রাল্টার
সার্দিনিয়া
ভূমধ্য সাগর
গ্রীস
আলবানিয়া
সিসিলি
তুরস্ক
আফ্রিকা
মাল্টা
ক্রীট
সাইপ্রাস

ইংরেজ ইউরোপের বাজারে বাজারে পশমের যোগান দিত বটে, কিন্তু নিজের দেশে অন্যের মাল আমদানি করত বুঝে শুনে। ইংরেজ হুঁশিয়ার ব্যবসায়ী জাত; এ ব্যাপারে তাদের কড়াকড়ি ছিল অসাধারণ। চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি দেশে যে নৌ-আইন পাশ হয় তাতে বিদেশী জাহাজের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের বন্দরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হল। কিন্তু আইন পাশ হলেও, এ ব্যবস্থা তখনই বলবৎ করা সম্ভব হল না, কারণ ইংরেজের বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যা তখন ছিল নগণ্য।

কাজেই ষোড়শ শতক পর্যন্ত ভেনিস বন্দর থেকে ইটালির বণিকের দল জাহাজ বোঝাই করে নানা দ্রব্যসম্ভার নিয়ে আসত। সে মাল বিক্রি করে তারা ফিরে যেত ইংল্যাণ্ডের পশম নিয়ে।

ভেনিসের সাথে সেকালে হিন্দুস্থানের তথা সমস্ত প্রাচ্য জগতের বাণিজ্য যে পথে চলত, তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভেনিস থেকেই প্রাচ্যের মসলা প্রথম ইউরোপের সর্বদেশের গৃহভাণ্ডারে এসে পৌঁছে।

আর একটা ব্যাপারে ইংরেজ ছিল স্বাবলম্বী। 'সাইলক' অর্থাৎ ইহুদীর দল তখন শুধু ভেনিসে নয়, সারা ইউরোপেই, ব্যবসা বাণিজ্যের মূলধন জোগাত। তারা যে সবাই নির্মম ও অত্যাচারী ছিল তা নয়, তবে সর্বদেশেই কুসীদজীবীর প্রতি জনসাধারণ ছিল বিরূপ। বিশেষ করে বিধর্মী ইহুদীদের প্রতি খ্রীষ্টানদের ছিল চিরন্তন বিদ্বেষ। তা যাই হোক, এরা অর্থবলে ছিল বলীয়ান কাজেই বাণিজ্য জগতে তো বটেই, অন্য ব্যাপারেও, এদের প্রভাব ছিল প্রবল। ইংরেজ কিন্তু প্রথম থেকেই এ বিষয়ে সাবধান হয়ে গেল। বিদেশী, বিধর্মীদের কাছে হাত পাততে তাদের শুধু লজ্জাবোধই হল না, এদের কবলে পড়লে দেশের অকল্যাণ হবে বা হতে পারে এ আশঙ্কাও তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল। ফলে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ড দেশ থেকে ইহুদী বিতাড়ন করলেন। তার ফল দেশের পক্ষে হল শুভ। আর্থিক ব্যাপারে ক্রমশ ইংরেজ স্বাবলম্বী হয়ে উঠল। দেশের বাণিজ্যের ও রাজার অর্থের প্রয়োজন মিটাতে লাগল লণ্ডনের নানা সমবায় সমিতি ও ব্যবসায়ী, বিশেষ করে একদল স্বর্ণকার।

প্রকৃতপক্ষে সেকালে লণ্ডনের এই স্বর্ণকারেরাই ছিল দেশের ব্যাঙ্কার। এদের কথা বলতে গিয়ে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে একজন ইটালিয়ান পর্যটক বলেছিলেন, লণ্ডনের একটি মাত্র রাস্তায় আমি বাহান্নটি স্বর্ণকারের দোকান দেখেছি। এদের সব দোকানে এত প্রচুর ও মনোজ্ঞ রৌপ্যপাত্র সজ্জিত রয়েছে যে দেখে মনে হল, ইটালির মিলান, রোম, ভেনিস ও ফ্লোরেন্স এই চারটি বন্দরের সমস্ত রূপার জিনিস একত্র করলেও এর সঙ্গে তুলনায় হবে নিষ্প্রভ। ইটালির এই চারটি বন্দরই ছিল সেকালের ইউরোপের সর্বৈশ্বর্যের প্রতীক।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ইংরেজের ব্যবসা বাণিজ্য এমনি বাঁধাধরা খাতে চলছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতক থেকে কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল। ইংরেজেরা আর শুধু পশম তৈরি করেই ক্ষান্ত রইল না; সমবায় সমিতি গড়ে তারা পশমের কাপড় বুনতে শুরু করল। দেশে তাঁতও বসাল অনেক। কাঁচা পশম বেচে যা লাভ হত তার চেয়ে বেশি লাভ হতে লাগল পশমের কাপড়ে। তার উপর তাঁত বুনে দেশের অনেক লোকের হল খাদ্য সংস্থান। দু-চারখানা করে বাণিজ্য জাহাজও বাড়ল। সে সব শ বা দু শ টনের জাহাজে চড়ে অধ্যবসায়ী ব্যবসায়ীর দল আশপাশে নূতন নূতন কাপড়ের বাজার খুঁজতে শুরু করল। কিন্তু মোল্লার দৌড় তখনো মসজিদ পর্যন্ত; তারা কেউ আর ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে পারল না। ক্রীটদ্বীপ পর্যন্তই তাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে একদা ইংরেজের পশমের বড় আড়ত ছিল ক্যালেতে। ইংরেজ তখন ছিল ক্যালের মালিক। কিন্তু এই মালিকানা স্বত্ব বেশিদিন টিকল না। ইংরেজ ও ফরাসীতে বহু কাল ব্যাপী অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল। এক ফাঁকে ক্যালে ইংরেজের হাতছাড়া হয়ে ফরাসীর হাতে চলে গেল। ফলে, ইংরেজ তার আড়ত তুলে নিয়ে এল ডাচের রাজ্যে, এণ্টোয়ার্পে। এণ্টোয়ার্প তখন ইউরোপের নামজাদা বন্দর; পূর্ব ও উত্তর ইউরোপের সিংহদ্বার। কিন্তু রাজ্যটা ছিল স্পেনের; দেশের শাসক বা গভর্নর ছিল ডাচ। এর সঙ্গে লাগল ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের বিবাদ। এসব কথার কিছুটা ডাচ পর্বে বলা হয়েছে।

এ বিবাদের কারণ যাই হোক, এর ফলে ইংরেজের কাছে এণ্টোয়ার্পের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। এখান থেকে তাড়া খেয়ে ইংরেজ গেল জার্মেনীর হ্যামবুর্গে, কিন্তু সেখান থেকেও অচিরেই তাদের হটে আসতে হল।

এদিকে যে কারণে এণ্টোয়ার্প বন্দরের মর্যাদা ক্রমে কমে আসছিল আর আমষ্টারডাম বন্দরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছিল তা বলা হয়েছে ডাচের কাহিনীতে। কিন্তু আমষ্টারডামও তো ডাচেরই রাজ্য; কাজেই সে বন্দরেও ইংরেজের ঠাঁই হল না। এ ছাড়া, অনেক দেশই ইংরেজের পশম নিতে রাজী হলেও, ইংল্যাণ্ডে তৈরি পশমের কাপড় কিনতে রাজী হল না।

ফলে ইংরেজ হল বিপর্যস্ত। দেশে অনেক তাঁত বন্ধ হয়ে গেল, বহু লোকের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হল, সারা বণিক সমাজের মনে দেখা দিল দারুণ হতাশা। বিধি সদয়, তাই এই নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরেজ সহসা দেখতে পেল একটা আশার আলোক, একটা নূতন বাণিজ্য-পথ।

এই পথের সন্ধান এনে দিলেন পোর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা। হিন্দুস্থানের মসলার বাজার আবিষ্কার করে তিনি পোর্তুগালে ফিরে এলেন ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর মসলার বাণিজ্যে অতি অল্পদিনেই পোর্তুগালের বরাত ফিরে গেল। এ খবর সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না।

রানী এলিজাবেথ তখন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে। তাঁর রাজত্বকাল মোটামুটি ষোড়শ শতকের শেষার্ধ। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সে কাল বড় সুসময়। তখন দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি ছিল অখণ্ড; দেশবাসীর সর্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টা করত রাজশক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে। দেশের নানা ব্যক্তিগত শিল্প ও বাণিজ্য একালেই খণ্ডতার বন্ধন এড়িয়ে সর্বজনীন যৌথ কারবারে পরিণত হল।

যে মহাকবি সেক্সপীয়র ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজি ভাষাকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখে গেছেন তাঁর জন্ম হয় একালেই। একালেই একদল নির্ভীক ও দুঃসাহসী অভিযাত্রীর জন্ম হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে; তাঁরা তাঁদের বীর্য ও অধ্যবসায়ের জোরে নব নব দেশ আবিষ্কার

করে একাধারে মানুষের জ্ঞান বর্ধন ও ইংরেজের অশেষ উপকার সাধন করে গিয়েছেন। এই পথিকৃৎদের দলে ছিলেন ড্রেক, ফ্রোবিসার, হকিন্স ও র‍্যালে। এঁদের নাম ইংরেজ কখনো ভুলবে না।

ইংল্যাণ্ড একটি দ্বীপ মাত্র; এদেশের চারদিকেই সমুদ্র। তবু দেশবাসীর মনে ছিল পরম সমুদ্রভীতি। সে ভীতি কিন্তু জনকয়েক দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীর নিরুদ্দেশ যাত্রার ফলে দূর হল না; হবার কথাও নয়। অথচ এই সহজাত ত্রাস দূর না হলে ইংরেজ যে কিছুতেই বহির্জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না একথাটা স্পষ্ট করে বুঝলেন এলিজাবেথ। তাই তিনি ও তাঁর সহকারীরা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। জলভীতি দূর করবার জন্য দেশের লোককে তাঁরা, টেনে হিঁচড়ে হলেও, জলে নামাতে চেষ্টা করলেন।

বণিকদের দিলেন উৎসাহ; নানা দেশের নানা বন্দরে যাতায়াতের যতটা সম্ভব সুব্যবস্থা তাঁরা করে দিলেন। আর করলেন দেশের জেলেদের দিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরানোর চেষ্টা। তাঁরা ভাবলেন, মাছ ধরতে গেলেই অন্তত একদল লোকের সমুদ্রভীতি ক্রমশ দূর হয়ে যাবে। তারপর এদের দিয়ে কি বাণিজ্য জাহাজ, কি যুদ্ধ জাহাজ দুয়ের কাজই ভালোভাবে চলবে।

কিন্তু মৎস্যজীবীদের জীবিকার্জনের জন্য প্রয়োজন মৎস্যাশী জনের, অথচ ইংল্যাণ্ডে মৎস্যভক্ত বড় বিশেষ কেউ ছিল না। সর্বসাধারণের দৈনন্দিন খাদ্য ছিল মাংস। কিন্তু মাছের প্রচলন একান্ত দরকার; এজন্য দেশে নূতন আইন তৈরি করতে হল। সে আইনে মাংস খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল। 'লেন্ট' অর্থাৎ ইষ্টারের পূর্বে চল্লিশ দিন, শুক্রবার, এমনকি বুধবারেও, মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হল। নিষিদ্ধকালে মাংস খেয়ে অনেকে দণ্ড পেল বটে, কিন্তু মাছ ক্রমশ ইংরেজের হেঁশেলে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসল। ফলে, মৎস্যজীবীর দলও বেড়ে চলল।

রানী এলিজাবেথের এই দূরদর্শিতার ফলে ইংল্যাণ্ডে যে একদল দুর্দান্ত ধীবর জাতির সৃষ্টি হল, তারাই পরবর্তীকালে ইংরেজের জাহাজে পাল তুলে দেশ-দেশান্তরে অমৃতভাণ্ডের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে ভেনিসের জমজমাট বাজার তখন ভেঙে যাবার যোগাড় হয়েছে। উটের পিঠে চাপিয়ে যে মাল আনা হয় তার দাম পড়ে অনেক বেশি ; ওদিকে জাহাজ ভরে পোর্তুগীজেরা সেই সব মালই এনে সস্তাদরে বাজারে বাজারে ফেরি করে বেড়ায়। মালের মধ্যে সেরা অবশ্য মসলা।

এসব খবর ডাচেরাও জানে। তারাও পাকাপোক্ত ব্যবসায়ী। তাদেরও কোনো কোনো দল তখন দু-চারখানা জাহাজে মসলা বোঝাই করে নিয়ে আসতে শুরু করেছে দূর প্রাচ্যের দ্বীপ সুমাত্রা ও জাভা থেকে। সে মাল তারা যোগানও দিচ্ছে ইংল্যাণ্ডে। চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে মালের দাম বাড়াতে কমাতে ডাচেরা বড় ওস্তাদ। সহসা ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্মের পূর্ব বৎসর, তারা ইংল্যাণ্ডে গোলমরিচের দর পাউণ্ড প্রতি তিন শিলিং থেকে ছয় এমনকি আট শিলিং পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল। এতে ইংল্যাণ্ডের বাজারে বাজারে শোরগোল পড়ে গেল। লণ্ডনের মেয়রকে সভাপতি করে বণিকদের এক সভা বসল। সেখানে এই স্থিরীকৃত হল যে এরূপ অসঙ্গত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করার একমাত্র পন্থা হল মূল মসলার বাজারের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সরাসরি কারবার।

তাই ইউরোপের কাপড়ের বাজার যখন ইংরেজের কাছে প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হল আর সুষ্ঠু জীবনধারণে অপরিহার্য বস্তু মসলা যখন দেশে হয়ে উঠল অগ্নিমূল্য, তখন তাদের কাছে এল দেশান্তরের ডাক। ইংরেজ সংকল্প করল, পোর্তুগীজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, হিন্দুস্থানের বাজারে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করবে।

এদিকে রানী এলিজাবেথের আকাঙ্ক্ষাও ছিল অনুরূপ। কাজেই রাজা ও প্রজার মনের মিলের মধ্য দিয়ে যে বাণিজ্য-সমিতি গড়ে উঠল তার নাম হল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তার প্রতিষ্ঠা হল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। রানী এলিজাবেথ এই কোম্পানির সূতিকাগারেই এর কপালে জয়তিলক এঁকে দিলেন ; ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী এর জাহাজের পালে ভর করে দিগ্বিজয়ে বের হলেন।

কোম্পানির কাজ শুরু হল আমাদের হাটুরে নৌকার পদ্ধতিতে।

লণ্ডনের সব বড় বড় বণিকেরাই এ সমিতিভুক্ত হল, অবশ্য কাজকারবার চলত তাদের প্রতিভূদের দিয়ে। ছোটো খাটো বণিকদের সে দলে স্থান ছিল না। দশ জনে মিলে মিশে একখানা জাহাজ ভাড়া করা হত, মাঝি-মাল্লার দলও ঠিক হত। তারপর সকলের মাল বোঝাই হয়ে জাহাজ যেত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল প্রদক্ষিণ করে ভারত মহাসাগরে।

যার মাল তারই দায়িত্ব ; একের মাল নষ্ট হলে অন্যের কিছু যায় আসে না। তার লাভ, লোকসান, ঝড়তি-পড়তির ফলভোগ সে একাই করবে। শুধু হাটুরে জাহাজটার ভাড়া তার অংশমত গুনে দিতে পারলেই হল।

এ পদ্ধতির যে একেবারে ব্যতিক্রমও ছিল না, তা নয়। সকলের মাল একই জমাখরচভুক্ত করে যৌথ পদ্ধতিতেও কেউ কেউ কাজ-কারবার করত। তারপর বাণিজ্যের শেষে দেশে ফিরে গিয়ে, হিসাব-নিকাশ করে, হিস্যামত মুনাফা ভাগ করে নিত।

কিন্তু বাণিজ্যে যে শুধু মুনাফাই হবে তার স্থিরতা কি ? সমুদ্র-পথে ভয় ছিল পদে পদে। পালের জাহাজ ; সাগরে ঝড়ের দোলায় কখন বিপথে ভেসে যাবে তার স্থিরতা নেই। ডুবে যেতেই বা কতক্ষণ ? তারপর সারা পথে ছড়িয়ে রয়েছে পোর্তুগীজ আর ডাচের জাহাজ। বাগে পেলে তারা মালপত্র লুটতরাজ করে হয়ত জাহাজখানাই ডুবিয়ে দেবে। সমুদ্রপথে জোর যার মুলুক তার ; রানী এলিজাবেথের দোহাই দিয়ে বাঁচবার কোনো উপায় নেই।

এ ছাড়া, জাহাজে পানীয় জলের অভাব, কখনো কখনো আহার্যেরও। এ সকল বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে, ফাঁড়া কাটিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে, ব্যবসায় মুনাফা করা বড় সহজ কথা নয়। তবে মসলার ব্যবসায়ে লাভ অপরিমিত, এই যা ভরসা।

প্রথম কয়েক চালানে অবশ্য তাদের মুনাফা মন্দ হল না। সাধারণত শতকরা বিশ থেকে ত্রিশ টাকা।

হাটুরে নৌকার পদ্ধতিতে যখন কাজ কারবার হত তখন কোম্পানিকে বলা হত আইন-বদ্ধ কোম্পানি, কারণ সব হাটুরেকেই

তখন একটা সাধারণ আইন মেনে চলতে হত। এ ব্যবস্থায় কাজ অবশ্য ভালোভাবে চলত না, তবু এ নিয়মই বজায় রইল পঞ্চাশ বছরেরও বেশি।

পাকা সমবায় সমিতি গড়ে উঠল ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ কোম্পানির সাতান্ন বছর বয়সে। তখন মূলধনের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হল, বাণিজ্যের আইন কানুন তৈরি হল, বৎসরান্তে হিসাব-নিকাশ শেষ করে মুনাফার অংশ অংশীদারদের হিস্যামত বণ্টন করে দেবার পুরোপুরি ব্যবস্থা হল। তবে তখনো লণ্ডনের ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ীরাই রইল কোম্পানির অংশীদার; সাধারণ লোকের পক্ষে এই কোম্পানির অংশ ক্রয় করা সম্ভবপর হল না। এ নিয়ে পরে অনেক বাদানুবাদ ও বিসংবাদের সৃষ্টিও হল।

সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করে কোম্পানির বেশ উন্নতি হল। মুনাফা হতে লাগল শতকরা বিশ থেকে চল্লিশ টাকা। তিন চার বছরের মধ্যেই অংশীদারদের মূলধনের টাকা মুনাফায় ঘরে এসে গেল। কোম্পানির অংশের মূল্য বছরের পর বছর বেড়ে গিয়ে পঁচিশ বছরের মধ্যে পাঁচ গুণ হয়ে দাঁড়াল। মূলধন আর বাড়াবার দরকার হল না, কারণ তখন কোম্পানির মর্যাদা এত বেড়ে গেছে যে দরকার মত অল্প সুদে ধার পাবার আর কোনো বাধা রইল না। ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখনো কিন্তু হয়ে রইল জন কয়েক সৌভাগ্যশালী বণিকের একচেটিয়া ব্যবসা।

রানী এলিজাবেথ কোম্পানির আঁতুড় ঘরেই তার জন্মপত্রিকা লিখে দিয়েছিলেন। দেশের প্রতিনিধি হয়ে একদল বণিক ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে যাবে। সেই স্বল্পজ্ঞাত দেশের পথ এত বিপৎ-সংকুল ও দুর্গম যে প্রাণ হাতে নিয়েই তাদের অগ্রসর হতে হবে। তারপর বিদেশে কোনো বিপদে আপদে পড়লে তাদের দেশ থেকে কোনো সাহায্য পাবার আশা রইল না। কাজেই, বিদেশে আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা বণিকদের নিজেদেরই করতে হবে। বাণিজ্যপোতে রাখতে হবে যথাযোগ্য যুদ্ধের সরঞ্জাম।

ফলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্মপত্রিকায় যে তিনটি শর্ত লেখা হল তা এই ঃ

প্রথম, একমাত্র এই কোম্পানিই ইংল্যাণ্ড থেকে প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করতে পারবে ; অর্থাৎ তাদের ব্যবসা হবে একচেটিয়া।

দ্বিতীয়, কোম্পানি তার কর্মচারীদের কার্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযোগ্য নিয়ম কানুন তৈরি করতে পারবে। ইচ্ছামত তাদের শাস্তিবিধানও করতে পারবে।

তৃতীয়, 'উত্তম + আশা' অন্তরীপের অপর দিকে, অর্থাৎ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পার হয়ে গেলেই, বিদেশীর সঙ্গে কোম্পানির ইচ্ছামত সন্ধি-বিগ্রহ করবার ক্ষমতা থাকবে।

ফলকথা, রানী এলিজাবেথ কোম্পানির ললাটে অবাধ স্বাধীনতার জয়টিকা এঁকে দিলেন। আর, তা না দিয়ে উপায়ও ছিল না। শ্বাপদসংকুল অরণ্যে যে শিশুকে রক্ষকহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হবে, তাকে সর্বব্যাপারে স্বাধীন না করে দিলে তার প্রতি অবিচার করা হয়। পোর্তুগীজ ও ডাচ উভয়েই ইংরেজের পরম শত্রু ; আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় ছাড়া এই নির্মম, মদমত্ত ও দুর্দান্ত বৈরীদ্বয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু কেবল জন্মপত্রিকায় স্বাধীনতার জয়চিহ্ন এঁকে দিলেই তো কেউ আর স্বাবলম্বী হতে পারে না ; এর জন্য চাই নিজের শক্তিসংগ্রহ। দেশের প্রতিবেশ এই শক্তিসংগ্রহের বিশেষ অনুকূল ছিল।

বহুকাল পশমের ব্যবসা করে লণ্ডনের বণিকের দল তখন পরম বিত্তশালী হয়ে ওঠেছে। এরাই হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মালিক ও কর্ণধার। বাণিজ্যের আরো পসার করে প্রভূততর অর্থোপার্জনের জন্য তারা উন্মুখ হল। দেশের লোকের চিন্তাও হল বহির্মুখী। ইংল্যাণ্ডের, তথা ইউরোপের, বাইরে যে একটা বিরাট জগৎ বর্তমান সেখানে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবার স্বপ্ন তাদের মনে জাগ্রত হল। তারপর, দেশের একদল লোকের সমুদ্রভীতিও চিরতরে দূর হয়েছিল ; তাদের চোখে ইংল্যাণ্ড-দ্বীপের সীমা রেখা সপ্তসমুদ্র অতিক্রম করে দূর দিগন্তে প্রসারিত হল।

কোম্পানির জন্মের পূর্বে ইংরেজ বণিকেরা যে সকল জাহাজে চড়ে ক্রীট দ্বীপ বা ইউরোপের অন্যান্য বন্দরে যাতায়াত করত তা আকারে ছিল নিতান্তই ছোট। এসব জাহাজে মাল ধরত

এক শ থেকে তিন শ টন। কিন্তু হিন্দুস্থান বা দূর প্রাচ্যের দ্বীপ-গুলিতে এত ছোট জাহাজ নিয়ে যাতায়াত করা চলে না। ছোট ছোট জাহাজে মালের ভাড়াও বেশি পড়ে। কাজেই কোম্পানিকে বড় বড় জাহাজের বন্দোবস্ত করতে হল। সর্বপ্রথম ইংরেজ যে জাহাজে হিন্দুস্থানে তাদের মাল নিয়ে এল তাতে বোঝাই হত ছয় শ টন। ষষ্ঠ বারে তারা এল এগার শ টনের জাহাজে চড়ে।

সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে, অর্থাৎ কোম্পানির জন্মের বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যেই, কোম্পানির হিন্দুস্থানগামী জাহাজের সংখ্যা হল প্রায় ত্রিশ। তা ছাড়া অবশ্য ছোটোখাটো জাহাজও ছিল বহু। কিন্তু সেগুলি বেশি দূরে যেত না। এর মধ্যে কিছু জাহাজ ঝড়ে ডুবে গেল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করল ডাচ-বোম্বেটেরা। কাজেই কোম্পানিকে বছর বছর নূতন জাহাজ তৈরি করতে হত। এ সব জাহাজ তৈরি হত ইংল্যাণ্ডের 'ওক্' কাঠে। এ কাঠ খুব মজবুত; তাই এ সব জাহাজের পরমায়ু ছিল ত্রিশ থেকে ষাট বছর পর্যন্ত।

কোম্পানির এই একটানা বাণিজ্যপ্রসারের ফলে ইংরেজের জাহাজ তৈরির কাজ চলল নিরবচ্ছিন্নভাবে। এতে সমগ্র জাতির যে কল্যাণ হল তা অভাবিত। এই সূত্রে ইংরেজের নৌবল ক্রমে দুর্জয় হয়ে উঠল। ইংরেজ দোকানদারের জাত; দস্যুতা অপেক্ষা ব্যবসায়ে তাদের মন ছিল বেশি। প্রতিযোগী পোর্তুগীজ ও ডাচের বাণিজ্যনীতি ছিল জোর জবরদস্তি। কাজেই ইংরেজ প্রথম দিকে এদের কাছে হেরে গেলেও, ক্রমশ তাদের সামর্থ্য ও সাফল্য বেড়ে যেতে লাগল। ফরাসী যখন এল, তখন হিন্দুস্থানে তাদের বাণিজ্য-বৃক্ষের মূল অনেকটা দৃঢ় হয়ে গেছে।

ইংরেজের এই নবলব্ধ সামর্থ্যেরই একটা বিশিষ্ট অংশ হল নৌ-বহর। রানী এলিজাবেথের লেখা জন্মপত্রিকার জোরে এগুলি হল বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ধর্মী। অর্থাৎ এগুলি মালবাহী ও যুদ্ধ জাহাজ এই দ্বিরূপেই ব্যবহার করা যেত। ফলে, ইংরেজের বাণিজ্য-জাহাজের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল, জাতির জলযুদ্ধের শক্তিও ততই বেড়ে গেল। এ কাজ চলল এত দ্রুতগতিতে যে প্রতিযোগিতায় ইউরোপের

অন্যান্য জাতি ইংরেজের অনেক পিছনে পড়ে রইল। পরবর্তীকালে ইংরেজের এই অভাবিত, পরোক্ষ সামর্থ্য লাভই হল তাদের বিজয়-গৌরবের প্রধান কারণ। সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদেও ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় নৌবহরের শক্তি ছিল অকিঞ্চিৎকর। এ কালেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বছর খানেকের মধ্যে তাদের জাহাজ তৈরির জন্য ব্যয় করল তিন লক্ষ পাউণ্ড। সমগ্র রাজকীয় নৌবহরের মূল্য তখনও এর চেয়েও কম ছিল! কোম্পানির নৌবহর তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হলেও, একে ইংরেজের জাতীয় বিভব বলেই গণ্য করা যায়। এর জোরেই ইংরেজ ইউরোপের মধ্যে অনন্য হয়ে জলপথে প্রায় অপরাজিত হয়ে ওঠল।

ইউরোপের কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই সেকালে এত দ্রুত এত পোক্ত নৌবহর তৈরি করা সম্ভবপর ছিল না। তার প্রধান কারণ অর্থাভাব, দ্বিতীয়, লোকাভাব। অর্থাভাব তখন প্রায় সকল দেশেই, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে। রানী এলিজাবেথ তো পদে পদে ব্যয়-সঙ্কোচ করেই তাঁর জীবন কাটিয়ে গেলেন; রাজস্ব বাড়িয়ে রাষ্ট্রের অর্থাভাব দূর করবার প্রবৃত্তি বা সাহস তাঁর কোনোকালেই হল না। কিন্তু যে জাতের মানুষ তৈরি না করলে কোম্পানির পক্ষে তাদের নৌবহর বৃদ্ধি করা অসম্ভব হত, রানী মৎস্য-ব্যবসার প্রসারের মধ্য দিয়ে সে জাতের মানুষই সৃষ্টি করে গেলেন। উপ-মাতা হিসাবে এলিজাবেথ তাই কোম্পানি তথা ইংরেজের কাছে চিরবরেণ্য হয়ে রইলেন।

॥ সাত ॥

কপালে রানী এলিজাবেথের জয়তিলক নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির জাহাজ প্রথম এসে নোঙর করল দূর প্রাচ্যের মসলাদ্বীপে, হিন্দুস্থানে নয়। মসলা ছিল সেকালের সেরা মাল, তাই ইংরেজের প্রথম দুটি অভিযানের সবগুলি জাহাজই মসলাদ্বীপ থেকে মসলা নিয়ে লণ্ডনে ফিরে গেল। হিন্দুস্থানের দিকে তারা দৃষ্টি দিল না, দেবার ইচ্ছাও ছিল না। সে প্রয়োজন জরুরী হল অন্য কারণে; মসলাদ্বীপে ডাচদের হাতে বেদম মার খেয়ে। ডাচ-পর্বে সে কথা বলা হয়েছে।

দূর প্রাচ্যের দ্বীপ আমবয়নায় ছিল ইংরেজের বড় ঘাঁটি। সেখান থেকে প্রথম প্রথম লবঙ্গের চালান আসত লণ্ডনে। ঐতিহাসিক ক্যারিংটন্ লিখেছেন, কোম্পানির হিসাবের খাতায় দেখা যায় যে এক চালান মাল সে দেশে তিন হাজার পাউণ্ডে খরিদ হয়ে লণ্ডনে প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার পাউণ্ডে বিক্রি হয়েছিল! আমবয়না হাতছাড়া হয়ে যাওয়া যে ইংরেজের পক্ষে বড় মর্মান্তিক বিপর্যয় তা এ হিসাব থেকেই বোঝা যাবে।

তৃতীয় অভিযানে, ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে, তাদের একখানি জাহাজ এসে নোঙর করল সুরাটে। হিন্দুস্থানের মাটিতে সেই হল ইংরেজ বণিকের প্রথম পদার্পণ। অলক্ষ্যে ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু দৃশ্যমান জগতে তারা হয়ে রইল পোর্তুগীজের দৃষ্টিবিষ।

জাহাজের কাপ্তান ছিলেন উইলিয়াম হকিন্স। তিনি তুর্কী ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারতেন।

দিল্লির সিংহাসনে তখন জাহাঙ্গীর বাদশা পাকা হয়ে বসেছেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসএর কাছ থেকে হকিন্স বাদশার কাছে একখানা সুপারিশপত্র এনেছিলেন। তাই সুরাট থেকে তিনি সোজা দিল্লি চলে গেলেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করলেন বটে, কিন্তু হকিন্স বুঝতে পারলেন, সে আদর নিতান্তই মৌখিক শিষ্টাচার; ইংরেজের বাণিজ্যের এতে কোনো সুবিধা হবে না। বাদশার দরবারে খ্রীষ্টান জগতের প্রতিনিধি হয় বসে রয়েছে

পোর্তুগীজের সারথি জেস্যুয়িট পাদরীর দল, একেবারে জাহাঙ্গীরের পিতা আকবরের কাল থেকে। তাঁরা পোর্তুগীজ ছাড়া অন্য কোনো খ্রীষ্টান জাতিকে এদেশে বাণিজ্য করতে দেবার পক্ষপাতি নন।

হকিন্স এ দরবারে কিছুদিন আনাগোনা করে রিক্ত হস্তে সুরাটে ফিরে গেলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজার সুপারিশ সত্ত্বেও মোগল বাদশার কোনো বন্দরে ইংরেজকে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার ফরমান দেওয়া হল না। এ কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে পোতুগীজ-পর্বে। এই হকিন্সই বলেছিলেন, হিন্দুস্থান যেন রূপায় রূপায় মোড়া হয়ে গেল; বাইরের সব জাতিই এখানে কেবল রূপা দিয়েই জিনিস কেনে; তাদের মাল এখানে বিক্রি হয় না। হিন্দুস্থানীরা সে রূপার তাল রাখে মাটিতে পুঁতে, বের করে না।

দেখে শুনে ইংরেজ প্রমাদ গনল। তারা স্পষ্টই বুঝতে পারল যে মোগল বাদশার দরবারে পোর্তুগীজদের এত প্রভাব বজায় থাকতে হিন্দুস্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য করার আর আশা নেই। তাই তারা ডাচের অনুসরণ করে, ছলে, বলে ও কৌশলে, তাদের পথের এই বিষদুষ্ট কাঁটাটি তুলে ফেলবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

কথা আছে, ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর চেয়ে আসামীর মর্যাদা বেশি। অর্থাৎ শক্তি, তা অন্যায়ের পরিপোষক হলেও, সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে। কথাটা যে সত্য তা প্রমাণ হতে দেরি হল না। বছর দুই পরে সুরাটের কাছেই সমুদ্রবক্ষে পোর্তুগীজ ও ইংরেজের শক্তিপরীক্ষা হল। দু দলই দুর্ধর্ষ ও নির্মম; কিন্তু পোর্তুগীজের তখন পড়ন্ত অবস্থা, ইংরেজের তেজ নবীন। পোর্তুগীজ নিজেদের পূর্ব মর্যাদা রক্ষা করতে পারল না, ইংরেজকে পথ ছেড়ে দিতে হল। দিল্লির বাদশা বিজয়ী দলকে স্বাগত জানালেন। এ অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তিনি প্রমাণ করলেন যে খ্রীষ্টান জগতের কারো প্রতি তাঁর কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সুরাটে পাকাপাকি ভাবে ব্যবসা করবার ফরমান পেল। তাদের কুঠিও তৈরি হল সে বন্দরে।

কিন্তু পোর্তুগীজের সঙ্গে ইংরেজের অহি-নকুল সম্পর্ক এখানেই শেষ হল না। সুরাটের কাছেই আবার এ দু দলে যুদ্ধ বাধল বছর

দুই পরে। এবারও ইংরেজ জয় লাভ করল। কিন্তু এ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জয় লাভ করেও তাদের কারবারের বিশেষ কোনো সুবিধা হল না, কারণ হিন্দুস্থানের ব্যবসাক্ষেত্রে শতাধিক বছরের অভিজ্ঞ পোর্তুগীজের তুলনায় তারা তখনো শিশু মাত্র। পোর্তুগীজের প্রকাণ্ড কুঠির পাশে তাদের ক্ষুদ্র আস্তানা হয়ে রইল নিতান্তই অশোভন, অক্ষমতার প্রতীক। কিন্তু তারা এ কথা কখনো ভুলল না যে তাদের হতাশ হলে চলবে না, কারণ হিন্দুস্থানের ব্যবসা ছাড়া তাদের আর উপায়ান্তর নেই। এর পরে তাদের অবস্থাটা সম্যক্ বুঝে নিতে আসলেন স্যর টমাস রো, ইংল্যাণ্ডের রাজার প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে। সে কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

ইংরেজেরা তাদের জাহাজে পশমের কাপড় বোঝাই করে এদেশে ফেরি করতে এল। কিন্তু হিন্দুস্থান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পোশাক, পরিচ্ছদ, আবহাওয়া প্রভৃতির সন্ধান তারা রাখত না। ইংরেজ এসে দেখল, এদেশ নিতান্তই গরমের দেশ। তারপর সমুদ্র-উপকূলের আশে-পাশে তো শীতঋতুতেও গরম কাপড়ের প্রয়োজন হয় না। তাই, পণ্য হিসাবে এদেশে গরম কাপড়ের গৌরব বেশি নেই।

অল্পস্বল্প গরম কাপড় বিক্রির জন্য এতদূর সাগর পাড়ি দেওয়া সঙ্গত কিনা এ নিয়ে দেশে বাদানুবাদ হল অনেক। অবশ্য সেটা ব্যবসার গোড়ার দিকের কথা, কারণ তখনো হিন্দুস্থানে বাণিজ্যের পূর্ণ রূপটি কারো মনেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু কোম্পানির ব্যবসায়ে দেশের প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ লাভ প্রথম থেকেই এত বেশি হল যে রানী এলিজাবেথ এ সব কথায় কর্ণপাতও করলেন না। তার উপর তিনি কোম্পানির কাজের আরো একটু সুবিধা করে দিলেন। সেটি এই যে, পশমের কাপড়ের সঙ্গে কোম্পানিকে কিছু কাঁচা মুদ্রাও হিন্দুস্থানে নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন। শুধু শর্ত রইল এই যে স্বর্ণ ও রৌপ্যে কোম্পানি যে অর্থ দেশের বাইরে নিয়ে যাবে, দেশে ফিরে আসবার সময় তা দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ ব্যবস্থার ফলে কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের একটা বিশেষ অসুবিধা দূর হয়ে গেল। এর আগে একমাত্র গরম

কাপড়ই ছিল কোম্পানির মূলধন অর্থাৎ বিদেশে এ মাল বিক্রি হলে তবেই তা দিয়ে সে দেশের মাল খরিদ করতে পারা যেত। তাই, দূর প্রাচ্যে বা হিন্দুস্থানে তাদের মূলধনের ছিল বিশেষ অসচ্ছলতা। এখন তাদের অর্থসংগতি অনেক বেড়ে গেল। ফলে, ইংরেজেরা এবার ইচ্ছামত পণ্য সংগ্রহ করে সে মাল ইউরোপের বাজারে বাজারে ফেরি করে, চার পাঁচ গুণ মুনাফা করতে লাগল। পূর্বে তারা মাল নিয়ে আসত শুধু ইংল্যাণ্ডের চাহিদা মেটাবার জন্যই; এখন তাদের ব্যবসা-বৃত্তের পরিধি বহুগুণ বিস্তৃত হয়ে গেল। ব্যবসাটা যেন প্রায় গোড়া থেকেই অন্তর্বাণিজ্য না হয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়ে উঠল।

কোম্পানির বয়স বছর বিশেক হতে না হতেই বছরে প্রায় লক্ষাধিক কাঁচা পাউণ্ড নিয়ে এই সার্বজাতিক ব্যবসা চলতে লাগল। এতে নিজেদের দেশের চাহিদা মিটিয়েও দেশে মুনাফা আসতে লাগল পাঁচ ছয় লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ষাট সত্তর লক্ষ টাকা। বাণিজ্যান্তরে এরূপ অভাবিত লাভের ফলে বাণিজ্যের মূল পণ্য পশমের কথা ও সে সম্পর্কে পূর্বতন বাদানুবাদ দেশের লোক বিস্মৃত হয়ে গেল।

তাই, রানী এলিজাবেথের আশীর্বাদে কোম্পানির ঐশ্বর্য, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দিনের পর দিন ধাপে ধাপে বেড়ে গেল।

প্রথম যুগে ইংরেজেরা পূর্বাঞ্চল থেকে নিয়ে যেত তিনটি জিনিস। সল্টপিটার অর্থাৎ পোটাসিয়াম্ নাইট্রেট্, কাঁচা সিল্ক, ও মসলা, বিশেষ করে গোলমরিচ। এ তিনটি মালেরই চাহিদা ছিল এত বেশি যে কোম্পানি প্রয়োজন মত মাল যোগান দিয়ে উঠতে পারত না। কাজেই এতে লাভের অঙ্ক ছিল আশাতিরিক্ত।

সেকালে ইউরোপের ঘরে ঘরে মসলা ছিল অপরিহার্য বস্তু; সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পোটাসিয়াম্ নাইট্রেট্ দিয়ে তৈরি হত বারুদ। ইউরোপের প্রায় অখণ্ড খণ্ডযুদ্ধে অগ্নিবৃষ্টির জন্য বারুদের প্রয়োজন ছিল ক্রমবর্ধমান। আর, সিল্কের তো কথাই নেই; ইউরোপের বিত্ত ও ঐশ্বর্য যত বাড়তে লাগল, সিল্কের চাহিদাও তত বেড়ে গেল। কিন্তু সিল্কের কথা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্কেরও সৃষ্টি হল।

ইংল্যাণ্ডে প্রথম সিল্ক আসত তুরস্ক থেকে। সে বাজারে ইংরেজের পশমের কাপড়ও বেশ কিছু বিক্রি হত। তাই তুরস্ক থেকে ঘরের টাকা ব্যয় করে সিল্ক কিনে আনতে হত না। এদিকে হিন্দুস্থান থেকে সিল্ক আনতে হত পুরোপুরি কাঁচা টাকা ব্যয় করে। কাঁচা টাকা ব্যয় করার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, কিন্তু তুরস্কের সিল্ক না কিনলে যে সেখানে কোম্পানির পশমের কাপড়ও বিক্রি হবে না; তার কি করা যায়?

কিন্তু কোম্পানির অপরিমিত মুনাফার ফলে তখন ইংল্যাণ্ডের অবস্থা ফিরে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ গৃহিণীর রুচিরও হয়েছে বিপুল পরিবর্তন। তুরস্কের কাঁচা সিল্কের সুতা দিয়ে লণ্ডনের স্পিটল-ফিল্ডস পাড়ায় যে কাপড় তৈরি হত তা তখন হয়ে উঠল অপাংক্তেয়, কারণ হিন্দুস্থানের অর্থাৎ বাংলার সিল্ক তখন তাদের মনোহরণ করে বসেছে! সে সিল্ক না হলে তাদের চলবে না। কাজেই তুরস্কে পশমের কাপড় বিক্রির মুনাফার কথাটা আর বেশিদূর অগ্রসর হল না।

ক্রমে কোম্পানি পূর্বাঞ্চল থেকে আরো অনেক জিনিস দেশে নিয়ে এল। এর মধ্যে চা, কফি আর চীনের পোর্সেলিনের বাসন-কোসনই প্রধান।

ইংল্যাণ্ডে হিন্দুস্থানের চা ও কফি এসে ঢুকল সপ্তদশ শতকের তৃতীয় পাদে। তখন রাজা দ্বিতীয় চার্লস ছিলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে। ইংরেজের জাতীয় পানীয় ছিল 'বিয়ার' ও 'এল' দু-ই মৃদু আসব। জল বেশি কেউ পছন্দ করত না; পরিষ্কৃত জল সচরাচর পাওয়াও যেত না। চায়ের স্বাদে ও গন্ধে ইংরেজ গৃহিণী মোহিত হয়ে গেলেন; ফলে, ইংল্যাণ্ডে চায়ের সম্মান প্রায় রাতারাতি বেড়ে গেল। সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারে 'বিয়ারে'র পাশে হল তার স্থান।

চা প্রথম ছিল ইংরেজের শখের পানীয়, কিন্তু শখানেক বছরের মধ্যে এর প্রচলন বেড়ে গেল অভাবিতরূপে। এর অবাধ ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে, চাষীর খামারবাড়িতে, এমনকি দরিদ্রের কুটিরেও। ক্রমে চা হয়ে উঠল ইংরেজের জাতীয় পানীয়।

ইংরেজ কবি কাউপার এর প্রশস্তি গেয়ে যা লিখলেন তার মর্ম হচ্ছে :

"নেই কো চায়ে মাদকতা
শুধুই মধুক্ষরা,
সঞ্জীবনী সুধার ধারা,
পরম শ্রান্তিহরা।"

কফির স্থান হল পানাগারে। রানী অ্যানির আমলে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে, লণ্ডন শহর 'কফি হাউসে' অর্থাৎ কফি পানাগারে ছেয়ে গেল। বড় বড় রাস্তার তো কথাই নেই, অলিতে গলিতেও হল শত শত 'কফি হাউসে'র সৃষ্টি। এরাই হল ইংরেজ জাতির পরবর্তীকালের অগণিত 'ক্লাবে'র বা সামাজিক মেলামেশার প্রতিষ্ঠানের পূর্বপুরুষ।

চীন দেশের পোর্সেলিনের বাসন ইংল্যাণ্ডে দেখা দিয়ে তার রূপের জোরেই ইংরেজ গৃহিণীর মন কেড়ে নিল। ইংল্যাণ্ডে জনসাধারণের বাসন বলতে তখন ছিল 'পিউটার', সেগুলি টিন আর সীসায় মিলিয়ে তৈরি। অবশ্য রূপার থালা ব্যবহার করত বিত্তশালীরা, কিন্তু সে আর কজন? পোর্সেলিনের পাশে পিউটারের কদর্যতা এত স্পষ্ট হয়ে উঠল যে লোকে সাধ্যাতিরিক্ত মূল্যেও দু একখানা করে পোর্সেলিন কিনতে লাগল। পোর্সেলিন অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করে বিপুল লাভ করল ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানি, দু-ই।

পোর্সেলিন দিয়ে প্রথম প্রথম চলল শুধু ঘর-বাড়ি সাজানো; গৃহস্থালীর কাজে এগুলি বহাল হল অনেককাল পরে। কিন্তু পোর্সেলিনকে যিনি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জনসাধারণের নাগালে নিয়ে আসলেন তাঁর নাম যশিয়া ওয়েজউড। এই ইংরেজ কর্মবীর চীনা বাসনের কারখানা খুললেন নিজের দেশে। ফলে পিউটার ক্রমে ইংরেজের ঘর থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল, আর তার স্থান দখল করল পোর্সেলিন। ওয়েজউড অমর হয়ে রইলেন পোর্সেলিনের নামান্তরে।

কিন্তু রানী এলিজাবেথের পরম আশীর্বাদ লাভ করেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিদেশে তো বটেই, এমনকি দেশেও, মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যকে

এড়াতে পারে নি। কোম্পানির বয়স যখন মাত্র বছর তিনেক, তখন রানী এলিজাবেথ দেহরক্ষা করলেন। তাঁর পরে সিংহাসনে বসলেন প্রথম জেমস, পরে প্রথম চার্লস। কোম্পানির বয়স যখন সাঁইত্রিশ বছর তখন প্রথম চার্লস 'কোর্টিন এসোসিয়েসন' নামে এক নূতন কোম্পানি গড়ে তুলে তাকে পূর্বাঞ্চলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিলেন। ফলে কয়েক বছর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'প্রাণ রাখিতে প্রাণান্তের' মত অবস্থা হল; ব্যবসা-বাণিজ্য গেল প্রায় রসাতলে।

কোম্পানির জীবনে সাঁইত্রিশ থেকে সাতান্ন—এই বিশ বছর অমনিতর নানা ভাগ্যবিপ্লব চলল। অবশেষে ফাঁড়া কেটে গেল ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিজ্ঞপ্রধান ক্রমওয়েলের আমলে। তখন আবার এ কোম্পানিকেই বিদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু ইংরেজের প্রধান, এমনকি একমাত্র অবলম্বনই, তখন হিন্দুস্থান; দূরপ্রাচ্যের দ্বীপগুলি তো ডাচদেরই করায়ত্ত। তাই এই পরম আশ্রয়কেই তারা মনেপ্রাণে আঁকড়ে রইল।

এবার স্যর টমাস রো-র কথা বলা যাক।

স্যর টমাস মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের দরবারে দ্বিমূর্তিতে এসে দেখা দিলেন। একদিকে তিনি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস-এর রাজদূত, অন্যদিকে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট বা প্রতিনিধি। তিনি এদেশে বছর তিনেক কাটিয়ে, অনেক দেখেশুনে, কোম্পানি পরিচালনার যে নীতি লিপিবদ্ধ করে রেখে গেলেন তার মূল কথাটা এই যে, যদি এদেশে বাণিজ্য করতেই হয় তবে এদেশের রাজা-রাজড়া বা দেশবাসীদের সঙ্গে কোন ঝগড়াঝাঁটি করা চলবে না।

তিনিও হকিন্সের পদাঙ্কানুসরণ করে সক্ষোভে বলতেন, ইউরোপের রক্তমোক্ষণের ফলেই এশিয়ার পুষ্টি সাধন হচ্ছে—সামাল! সামাল! ইউরোপের সব সোনা-রূপাই এসে গেল এশিয়ায়!

শতাধিক বছর ইংরেজ স্যর টমাসের এ বিধান মেনেই লাভবান হয়েছে। বহুকাল পরে ক্লাইভ সে অনুশাসনের অন্যথা করেছেন ভাগ্যলক্ষ্মীরই প্ররোচনায়। আর তাই বহু শতাব্দী ধরে হিন্দুস্থানের মাটিতে

আলাউদ্দীন খিলজী, সেকেন্দর লোদী, আওরংজেব ও মুর্শীদকুলী খাঁর দল যে হিন্দু-বিদ্বেষ রূপ পাপবীজ বপন করে চলেছিলেন, তার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফলে, সে বিধান অমান্য করেও, লাভবান হয়েছে ইংরেজ।

ক্লাইভের পূর্বেও একবার ভাগ্যদেবীর আদেশে নয়, দুষ্টগ্রহের তাড়নায়, স্যর টমাসের অনুশাসন লঙ্ঘন করেছিলেন কোম্পানির অধ্যক্ষ স্যর যশিয়া চাইল্ড। তার ফলে কিন্তু কোম্পানির হিন্দুস্থানের কারবার রসাতলে যাবার যোগাড় হয়েছিল। সে কথা পরে বলা যাবে।

ইংরেজ সুরাটের মূল কুঠি আগেই তৈরি করেছিল, তারপর তারা ছোট ছোট ঘাঁটি তৈরি করল আগ্রায়, আহমদাবাদে ও ব্রোচে। কিন্তু তবু তাদের কাজ-কারবার আশানুরূপ বেড়ে উঠল না।

পোর্তুগীজের তখন পড়ন্ত অবস্থা। ব্যাটাভিয়ায় রাজত্ব করে ডাচদের তখনো হিন্দুস্থানের দিকে তেমন নজর নেই। ইংরেজ ভাবল পোর্তুগীজকে বিপর্যস্ত করবার এই মহাসুযোগ; সে সুযোগ সার্থক করতে পারলে তাদের বাণিজ্যের বড় একটা অংশ হাতে এসে যাবে।

ইংরেজ তাই পোর্তুগীজকে উৎখাত করে দিল পারস্যের বিখ্যাত বন্দর অরমুজ ওরফে বাসারো থেকে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর তারা কুঠি তৈরি করল মাদ্রাজের মসুলিপট্টমে ও ডাচদের কুঠি পুলিকটের কাছে আমরাগাঁয়ে। কিন্তু পূর্ব উপকূলে এসব ছোট ছোট কুঠি তৈরি করলেও তাদের মূল বাণিজ্য তখনো রইল পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে।

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে হল নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। এর ফলে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য স্বভাবতই পূর্ব উপকূলের বাজারে বাড়তে লাগল। কুঠি তৈরি হল মাদ্রাজে। তারপর আরো প্রায় দশ বছর পরে, ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে, তারা বাংলার হুগলি ও কাশিমবাজারে এসে জুটল। বাংলা তখন পোটাসিয়াম নাইট্রেট, আফিং, সুতী ও রেশমের কাপড়ের জন্য বহু খ্যাতি লাভ করেছে।

ইংরেজ বাংলায় এসে বসল বটে, কিন্তু তাদের এদেশে কায়েম হতে লাগল বেশ কিছুদিন। মাঝখানে কোম্পানির অধ্যক্ষ স্যর যশিয়া চাইল্ডের হঠকারিতার ফলে শুধু বাংলায় নয়, সারা হিন্দুস্থানেই

ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারেই নষ্ট হতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইংরেজের ভাগ্য চরম সুপ্রসন্ন হল বাংলায়ই, আর তাদের পরম ঐশ্বর্যলাভও ঘটল এদেশেই—তবে তা ব্যবসায়ে নয়, রাজনীতিক দ্যূতক্রীড়ায়। কাজেই এবার বাংলার সে যুগের শাসন-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

বাদশা সাজাহানের আমলে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুজা প্রায় সতেরো বছর সুবা বাংলার শাসক ছিলেন। হয়ত আরামে ও স্ফূর্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশা সাজাহান অসুস্থ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সুজার সহোদরদের মধ্যে অন্য তিনজন যাঁর যাঁর নিজের এলাকায় সরাসরি সম্রাট্ হয়ে বসলেন, তখন সুজাও নিজেকে বাংলার একচ্ছত্র সম্রাট্ বলে ঘোষণা করলেন। দিল্লির মসনদ নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল বছর চারেক। পরিশেষে সকল কলহের নিষ্পত্তি করলেন মক্কাশ্রয়ী আওরংজেব। অন্য তিন ভ্রাতার মধ্যে দারা ও মুরাদ গেলেন পরলোকে; সুজাকেও বাংলা ছেড়ে আরাকানের পথে মহাপ্রস্থান করতে হল। আওরংজেবের সেনাপতি মীরজুমলা বাংলার রাজধানী ঢাকায় প্রভুর প্রতিভূ হয়ে জাঁকিয়ে বসলেন।

মীরজুমলার দেহান্তের পর এলেন শায়েস্তা খাঁ, তারপর বাংলার শাসক হলেন স্বনামধন্য, 'বৈকুণ্ঠ'-রচয়িতা মুর্শীদকুলী খাঁ; তিনি ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন মুর্শিদাবাদে। এদিকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরংজেবের দেহান্তের পর দিল্লির সিংহাসনে বসলেন একদল ক্ষণিকের অতিথি। কারো কারো উদয়াস্তের মধ্যে ফাঁক রইল না বললেই চলে, কেউ-বা দু-পাঁচ বছর রাজগিতে বহাল রইলেন। কিন্তু তাঁদের সবাই ছিলেন নির্বীর্য; তাই বস্তুতঃ মুর্শীদকুলী খাঁ হয়ে রইলেন বাংলার স্বাধীন নবাব। দিল্লির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রইল শুধু রাজস্ব দেবার।

মুর্শীদকুলী খাঁর পরে এলেন তাঁর জামাতা। তারপর তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ। আলিবর্দী খাঁ ছিলেন সরফরাজের পিতৃবন্ধু আর বিহারের উপশাসনকর্তা। তিনি সহসা বন্ধুপুত্রকে আক্রমণ ও পরাজিত করে সুবা বাংলার নবাব হয়ে বসলেন ১৭৪০

দিল্লির সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক তখন শুধু কিছু রাজস্বপ্রাপ্তির ; কোন্ নবাব রইলেন বা মরলেন সেটা ছিল গৌণ কথা। ফলে অচিরেই দিল্লির বাদশা আলিবর্দীকে বাংলার নবাব বলে মেনে নিলেন।

আলিবর্দী কিন্তু আরামে নবাবি করতে পারলেন না। বছর দুয়ের মধ্যেই বর্গীর দল, অর্থাৎ মারাঠা দস্যুর দল, বাংলায় হানা দিল। নয়-দশ বছর তাদের অত্যাচারে বাংলাদেশ চরম বিপর্যস্ত হল। নিরুপায় আলিবর্দী বছরে বার লক্ষ টাকা মুক্তিমূল্য দিয়ে বর্গীপ্রধান রঘুজীর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। বাংলার সেকালের বার্ষিক রাজস্ব প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ধরে এই পণের টাকাটা স্থির করা হয়েছিল। এটি তার চতুর্থাংশ, তাই একে বলা হয় 'চৌথ'।

অর্থমূল্যে শান্তি ক্রয় করে আলিবর্দী তা ভোগ করলেন মাত্র পাঁচ বছর। তিনি লোকান্তরিত হলেন ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, পলাশীর রণরঙ্গের মাত্র এক বছর দুমাস পূর্বে। তাঁর দেহান্তের পর বাংলার মসনদে বসলেন তাঁর তেইশ বছরের তরুণ দৌহিত্র সিরাজদ্দৌল্লা।

ইতঃপূর্বে ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পোর্তুগালের রাজকন্যা বিয়ে করে যৌতুক পেলেন হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলের ক্ষুদ্র বন্দর বোম্বাই। সে বন্দরটি তিনি দান করলেন ইংরেজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে। কোম্পানি সুরাট থেকে তাদের প্রধান ঘাঁটি স্থানান্তরিত করল বোম্বাইয়ে। সেটা অবশ্য ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা ; দিল্লির মসনদে তখন আওরংজেব।

সেকালে ইংল্যাণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধার ছিলেন লণ্ডনের স্বর্ণকার ও ব্যাঙ্কার স্যর যশিয়া চাইল্ড। স্যর টমাস রো-র অনুশাসনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি হিন্দুস্থানের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সে দেশের রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে সখ্য রাখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কিছু জমিদারি সংগ্রহ করে তার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারের স্বপ্ন তিনি দেখলেন। তাই তাঁর আদেশে সহসা কোম্পানির বোম্বাইয়ের অধ্যক্ষ হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলে জোর-জবরদস্তি করে অনেকগুলি দেশী জাহাজ আটক করলেন, আর করলেন পূর্ব উপকূলের চট্টগ্রাম বন্দর ছিনিয়ে নেবার উদ্যোগ।

ফলে মোগল সৈন্য এসে বোম্বাইয়ের কুঠি ঘেরাও করল ; সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য হল বিপর্যস্ত। চট্টগ্রামের বন্দর দখল করার কল্পনা তো আকাশ-কুসুম হয়েই রইল। অপর পক্ষে, মোগল সম্রাটের রোষে পড়ে ইংরেজকে বাংলার হুগলি থেকে পালিয়ে মাদ্রাজে আশ্রয় নিতে হল।

তারপর অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে বছর তিনেক পরে ইংরেজ বাংলায় ফিরে আসার অনুমতি পেল। তখন জব চার্ণক ছিলেন বাংলায় ইংরেজ বণিকদের নেতা। তিনি বাংলায় ফিরে এসে আর হুগলিতে গেলেন না ; আধুনিক কলকাতা শহরের ভিত্তি স্থাপন করলেন ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে।

ইংরেজ এবার বাংলায় বাণিজ্য করবার অনুমতি পেল বছরে মাত্র তিন হাজার টাকা করের পরিবর্তে। মাল আমদানি ও রপ্তানির জন্য আর কোন শুল্ক দিতে হত না। ফোর্ট উইলিয়মকে কেন্দ্র করে এবার ইংরেজ বাংলায় কায়েম হয়ে বসল।

এর পর থেকে ইংরেজের বাণিজ্য-নাটকে দৃশ্যপটের দ্রুত পরিবর্তন শুরু হল। সে পরিবর্তন যুগান্তকারী হয়ে উঠল বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লার আমলে।

সিরাজদ্দৌল্লা নবাব হবার কিছুকাল পরেই ইংরেজের বাংলা দেশের দুনম্বর ঘাঁটি কাশিমবাজারের কুঠি দখল করলেন ; তারপর দখল করলেন তাদের কলকাতার প্রধান কুঠি। এর কারণ ছিল।

বিদেশী বণিকের মানদণ্ডের আঘাতে যে দেশী রাজার মস্তক চূর্ণ হতে পারে, এ ধারণা নবাব আলিবর্দীই তাঁর দৌহিত্রের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ধারণাটা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ ছিল নিজামের দরবারে—হায়দারাবাদে ও মাদ্রাজের আর্কটে। সে দু-রাজ্যের কাহিনী সারা হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সেকালে দক্ষিণাপথে ইংরেজ ও ফরাসী দু দলই তাদের সৈন্য ভাড়া খাটিয়ে অর্থোপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ; ব্যবসা ছিল গৌণকর্ম।

এমন সময় ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পলাশীর অভিনয়ের নয় বছর আগে, হায়দারাবাদের ,নিজামের, অর্থাৎ রাজার, দেহান্ত হল।

সেকালের যা রীতি, তাঁর লোকান্তরের পরেই নিজামের মসনদ নিয়ে বিপুল হাঙ্গামা বাধল তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে। একজন আশ্রয় করলেন ইংরেজকে, অন্যজন ফরাসীকে। ফরাসী জয়লাভ করল। এ যজ্ঞের পৌরোহিত্যে ফরাসী দক্ষিণারূপে যে ঐশ্বর্য লাভ করল তা পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ যে প্রণয়োপহার পেয়েছিল তার চেয়ে কম নয়। একথা বলেছেন বহু ঐতিহাসিক।

তারপর আর্কটের নবাবি নিয়ে লাগল বিষম দাঙ্গা। এবারও বিরোধী দলের একদিকে ইংরেজ, অন্যদিকে ফরাসী। এবারের অক্ষক্রীড়ায় ইংরেজের হল জয়। এ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় একজন অতি দক্ষ ও সাহসী ইংরেজ সৈন্যের সন্ধান পাওয়া গেল; তাঁর নাম রবার্ট ক্লাইভ। পরবর্তীকালে তাঁর ভাগ্যের সঙ্গেই হিন্দুস্থানে ইংরেজদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ল।

বৈশ্য-ক্ষত্রিয় ইংরেজ ও ফরাসী যে দক্ষিণাপথে মূলত ক্ষত্রিয়-বৈশ্য হয়ে উঠেছিল, এ খবর আলিবর্দী ভালভাবেই জানতেন। আর তিনি এটাও জানতেন যে তাঁর মসনদের আশেপাশে শত্রুর অভাব নেই। দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে হৃদ্যতা তো নেই-ই, রয়েছে প্রবল বিদ্বেষ। এদের মধ্যে বিভেদ শুধু সামাজিক নয়; এতে রাজ-নীতিক ভেদবুদ্ধিরও অন্ত নেই। মহানন্দময় 'বৈকুণ্ঠ'-বাসের ফলে হিন্দু জমিদাররা যে নবাবের উপর নিস্ফল আক্রোশে ফুলে উঠছিল, জনসাধারণও যে মুসলমানের অকথ্য অত্যাচারে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ— এসব তথ্য সেকালে ছিল এত স্পষ্ট যে তা বিদেশী ইংরেজদের চোখও এড়ায় নি। পলাশীর যুদ্ধের বছর তিনেক আগে কর্নেল স্কট নামে একজন ইংরেজ সেনানী মুর্শিদাবাদে কিছুদিন বাস করে এ কথা বলেছেন যে এক্ষণে বিদেশীরাও যদি বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করে, তবে দেশের হিন্দুরা তাদের সাহায্য করবে।

কথাটা সত্য। সেকালের হীনবল হিন্দুশক্তির বিড়ম্বনার কথা সমসাময়িক সাহিত্যেও অল্লাধিক প্রতিফলিত হয়েছে। সে বেদনা যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার বেশি আশা করা অসমীচীন, কারণ দেশের অবস্থা সেকালে যে কোনো প্রকার বিক্ষোভ প্রদর্শনের পক্ষে ছিল বিষম প্রতিকূল। একদিকে সরফরাজ খাঁর হত্যাকারী নিরঙ্কুশ

আলিবর্দী ছিলেন আত্মরক্ষার ব্যাপারে পরম সচেতন। অন্যদিকে দেশের উচ্চস্তরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জাতীয় চরিত্রের হল চরম অধোগতি ; সে নীচতা প্রকাশ পেল কামজ ও কোপজ ব্যসন এবং লাম্পট্যের অবাধ প্লাবনে। তারপর, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের তখনো সৃষ্টিই হয় নি। তাই, সে যুগের বিক্ষোভের চিত্র সম্ভোস্ফুরিত সাহিত্যে আর কতটুকু পাওয়া যাবে? এই বিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে দেশবাসীর চিরন্তন সমাজ-জীবনে যে সকল মর্মান্তিক ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়েছে তার শোভন ও সার্থক প্রকাশই বা এখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কতটুকু ঘটেছে ?

তবু, বিক্ষুব্ধ সমাজ-মনের চিত্র সেকালের সাহিত্যে যতটুকু ফুটে উঠেছে এখানে তারই একটু আভাস দেওয়া যাক।

আমাদের কথা যে কালের তারো পূর্বযুগের সাহিত্যে, মুসলমান রাজত্বে, হিন্দুর ক্রমবর্ধমান বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনার কথা আরো স্পষ্ট। তার অবশ্য কারণ রয়েছে। কিন্তু তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে বিপর্যস্ত সমাজ-মনের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাবে।

পলাশীর যুদ্ধের সমসাময়িক বিখ্যাত কবি তিনজন : গঙ্গারাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ। গঙ্গারাম পূর্ববঙ্গের ; ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের। রামপ্রসাদের লেখায় সমাজমনের এদিককার ছায়ার আভাসমাত্রও নেই, যদিও যুগধর্মে তাঁর মত ভাবশুদ্ধ সাধক কবিও বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কামজ ব্যসনকে অবলম্বন না করে পারেন নি। গঙ্গারামে ও ভারতচন্দ্রে কিন্তু সমাজ-মনের বিক্ষোভের প্রতিচ্ছবি রয়েছে।

গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' পলাশীর যুদ্ধের পাঁচ-ছয় বছর আগের লেখা। এটি বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামার বা মারাঠা আক্রমণ ও অত্যাচারের ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস। কাব্য অপেক্ষা তথ্যানুগ ইতিহাস হিসাবে এর মূল্য সমধিক।

গঙ্গারাম এই মারাঠা আক্রমণকে স্বাগত করেছেন গীতার 'যদা যদা হি ধর্মস্য' মন্ত্র দিয়ে। তাঁর মতে দেশকে জঘন্য কামাচারের প্লাবন থেকে মুক্ত করতে এসেছে হিন্দু মারাঠা। এ অবাধ লাম্পট্য

ও দুর্নীতি অসংযত মুসলমান রাজত্বেরই স্বাভাবিক পরিণাম। এর ফলে বাংলার হিন্দুর প্রাণ ওষ্ঠাগত; এর শেষ না হলে হিন্দুধর্ম লুপ্ত হবে। তাই 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁর প্রধান আজ্ঞাবহ নন্দীকে এই দুষ্কৃতজনের বিনাশের জন্য মারাঠার রাজা শাহুর কাছে যেতে বলেছেন। এবার মূল গ্রন্থ থেকেই কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাক।

"নন্দীকে ডাকিয়া শিব বলিছে বচন।
দক্ষিণ শহরে তুমি যাহ ততক্ষণ॥
শাহু রাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।
অধিষ্ঠান হৈয় যাইয়া তাহার দেহেতে॥
বিপরীত পাপ হৈল পৃথিবী উপরে।
দূত পাঠাইয়া যেন পাপীলোক মারে॥"

সে পাপ কি?

"রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হৈয়া।
রাত্রিদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লৈয়া॥"

নন্দীর আহ্বানে বর্গী বাংলায় এল। খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, কিন্তু বুলবুলি এর মধ্যেই সকল শস্য খেয়ে চলে গেছে! প্রশ্ন হল, খাজনা আর কি করে দেওয়া যাবে? তার উপর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদের বহু পরগনায় বছর কয়েক যে নিদারুণ অত্যাচার হল তা অবর্ণনীয়। 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এর সুস্পষ্ট ও নির্ভুল চিত্র রয়েছে। হিন্দু মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত মুসলমান-রাজ্য বাংলায় এসে, বাংলার হিন্দুর সঙ্গে মিলে মিশে দুর্গাপূজার উৎসব করে, হিন্দুত্বের বোধন করেছেন বটে, তবু এই নৃশংস অত্যাচারের দৃশ্য দেখে গঙ্গারামের কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' নীতিবাক্যকে পরম হিতকর বলে মনে হয় নি। তাই পার্বতী দেবীর রোষের ফলে তাঁর আলিবর্দী খাঁ ভাস্কর পণ্ডিতকে বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁদ পেতে হত্যা করতে পেরেছেন। এ তথ্য অবশ্য ইতিহাসানুগ। ভাস্কর পণ্ডিতকে আলিবর্দীর হিন্দু দূত গঙ্গাজল ও শালগ্রাম শিলা নিয়ে শপথ করে, আর তাঁর মুসলমান চর কোরাণ হাতে নিয়ে দিব্য করে, বারবার অভয় দিয়ে,

আলিবর্দীর দরবারে নিয়ে আসেন। সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন পলাশীর যুদ্ধের পাঁচ বছর আগে। তিনিও যবন-দমনের জন্য হিন্দুশক্তি মারাঠার শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর শঙ্করও নন্দীকে বলছেন ঃ

"আছয়ে বর্গীর রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনের করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥"

সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বর্গী বাংলায় এল। তারপর,

"কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥ (ঝি, বৌ)
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥
(বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা)

কিন্তু 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' নীতির মর্মান্তিক পরিণতি দেখেও রায় গুণাকরের কোনো অনুশোচনা হয় নি। তাই বর্গীর হাতে নিরপরাধ সজ্জনদেরও পরম লাঞ্ছনার ব্যাখ্যানে তিনি বলেছেন,

"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তব ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥"

বাংলার কবিকুলের এই বর্গীশক্তির আবাহন সমগ্র সমাজমনের সহজ আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। এর কারণ, সেকালে মারাঠার বীর্যবত্তা। হিন্দু জনগণ, বিশেষ করে বাংলার, তখন নিরঙ্কুশ ও দিল্লির বাদশার শাসনমুক্ত নবাবের অত্যাচারে এমনই বিপর্যস্ত যে দেশের জমিদারেরা পর্যন্ত স্ত্রী-কন্যার সম্মান রক্ষায় একান্ত অসমর্থ হয়ে উঠলেন। সাধারণ লোকের ধন, প্রাণ ও মান হল নবাব ও তাঁর পারিষদদের নিত্য খেলার সামগ্রী। সুন্দরী স্ত্রীর স্বামীর ও রুচিরা দুহিতার পিতার আশঙ্কা ও উদ্বেগ চরমে উঠল। তাই শক্তিহীন, অসহায় বাংলার হিন্দু তার ধর্মভাই হিন্দু মারাঠার কাছেই আশ্রয় প্রত্যাশা করল। তাদের সে আশাও ছিল পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ।

কারণ, আওরংজেবের দেহান্তের পর মারাঠাশক্তি হিন্দুস্থানে প্রায় অজেয় হয়ে দেখা দিল। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সমকালে তারা এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।* তার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমে সিন্ধুদেশের সীমানা পর্যন্ত, আবার দক্ষিণে হায়দারাবাদের সীমানা থেকে উত্তরে লাহোর পর্যন্ত। দিল্লি, আগ্রা ও মথুরাও ছিল তাদের করতলগত। অর্থাৎ মোগল রাজত্বের অবসানে পুনরায় এক অখণ্ড ও পরম শক্তিশালী হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল তাই হিন্দুর সে নিতান্ত বাস্তব-ঘেঁষা স্বপ্নটিও সত্য হয়ে উঠল না। ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের তিন-চার বছর পরে, পানিপথের মাঠে মারাঠার চিতাভস্মের মধ্যে সে আশার নির্দয় পরিসমাপ্তি ঘটল।

এই মর্মান্তিক ঘটনাটিই ইতিহাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। একপক্ষে উদীয়মান মারাঠাশক্তি, অন্যপক্ষে আফগান সর্দার আহমদ শা আবদালী, যিনি সেকালে বহুবার হিন্দুস্থান আক্রমণ ও দিল্লির ক্ষণিকের বাদশাদের পদানত করে এ দেশের অপরিমেয় সম্পদ হরণ করেছেন। তৃতীয় পানিপথের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ; শেষ হল ১৪ই জানুয়ারী, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে। শেষ যুদ্ধে আফগান পক্ষে ষাট হাজার আর মারাঠার দলে ন্যূনাধিক পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য ; এই সৈন্যদলের মৃত্যুপণ সংগ্রাম চলল সূর্যোদয় থেকে অপরাহ্ন পর্যন্ত।

হিন্দুস্থানের দুর্ভাগ্য যে, সে যুদ্ধে মারাঠার চরম পরাজয়ের মধ্যে দেশবাসীর সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে গেল। মহারাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি ঘরে প্রিয়জনের শোকে যে ক্রন্দনরোল উঠল, তার সাথে এসে মিলল সারা হিন্দুস্থানের দীর্ঘশ্বাস, বিলাপধ্বনি।

নইলে পলাশীর অভিনয়ও ক্রমে কঠোর বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে উঠত না ; বণিকের মানদণ্ডও ক্রমে রাজদণ্ডে পরিণত হত না।

এবার আবার আলিবর্দী-সিরাজের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

* মানচিত্র—হিন্দুস্থানে মারাঠাশক্তির অভ্যুদয় ১৭৬০-৬১

দেশের লোকের, বিশেষ করে হিন্দু-সমাজের, বিক্ষোভের কথা আলিবর্দীর অজানা ছিল না। তাই তাঁর স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল যে তাঁর দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শত্রুর দল, বিশেষ করে হিন্দুরা, ইংরেজের সহায়তায় রাজ্যে একটা বিপ্লব আনতে চেষ্টা করবে।

তরুণ নবাব সিরাজ মসনদে বসেই তাঁর দাদামশায়ের দূরদর্শিতার প্রমাণ পেলেন। আশপাশে ষড়যন্ত্রের যে গুঞ্জন তিনি শুনতে পেলেন তা অস্ফুট হলেও অর্থহীন নয়; তাতে হিন্দুপ্রধান ও ইংরেজ বণিকদের সুরসংযোগ তাঁর কানে ক্রমশ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। তিনি তাই প্রথমেই ইংরেজের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টা করলেন।

এদিকে মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভকে সসৈন্যে কলকাতার কুঠি উদ্ধারের জন্য পাঠানো হল। তিনি সে কুঠি পুনরধিকার করলেন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী, অর্থাৎ সিরাজদ্দৌল্লার অধিকারের মাত্র ছ-মাস পরে। সিরাজের শক্তিহীনতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল; ক্লাইভের যশ ও প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পেল। ফরাসীরা সিরাজকে সাহায্য করেছিল। তাই সুযোগ বুঝে ক্লাইভ দখল করলেন ফরাসীর চন্দননগর।

সিরাজ সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে ইংরেজকে উৎখাত করবার কল্পনা করলেন, কিন্তু সে কাজে তখনই হাত দিতে পারলেন না। এর কারণ ছিল।

আফগান সর্দার আহমদ শা আবদালী তখন চতুর্থবার হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছেন। দিল্লি, মথুরা ও বৃন্দাবন হয়ে তাঁর সুবা বাংলা-বিহারে একবার হানা দিবার ইচ্ছা ছিল। এ গুজব শুনে সিরাজ প্রমাদ গনলেন; ইংরেজের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়াটা কিছুদিনের জন্য মুলতবী রইল।

সে বোঝাপড়া অবশ্য হল, তবে অন্য ভাবে। ছ মাসের মধ্যেই, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন, পলাশীর নাটকে অভিনয় করবার জন্য তাঁর ডাক পড়ল। আটষট্টি হাজারী জেনারেল সেজে তিনি তিন হাজারী কর্নেল ক্লাইভের সঙ্গে ঘণ্টা কয়েক অভিনয় করে যথারীতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন; তারপর মীরজাফরের পুত্র মিরণের হাতে যথা-

বিধি হত হলেন। মাত্র আট শ ইংরেজ সৈন্য নিয়ে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ক্লাইভের বুক যে কেঁপে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু অভিনয়ে মুমূর্ষুরও মৃত্যুভয় থাকে না। ক্লাইভের দুঃসাহস দেখে হয়ত সিরাজের মনে পলাশী-নাটকের নেপথ্য অভিনয়ের চিত্রগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তখন তাঁর আর অন্য কোন উপায়ও ছিল না।

বাংলার সেকালের জনমত ক্লাইভকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড়া করিয়ে আলিবর্দীর দৌহিত্র সিরাজের বদলে তাঁর সেনানায়ক মীরজাফরকে মসনদে বসাল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের যুদ্ধজয় হল। কিন্তু সুদৃঢ় অবলম্বনের অভাবে জনমত আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না। মুর্শিদাবাদের হিন্দু ও মুসলমান প্রধানদের কায়েমী স্বার্থ দুর্বল মীরজাফরকে আশ্রয় না করে শরণ নিল ক্লাইভের। এতে ক্লাইভের কৃতিত্ব ছিল। সে যুগে রাজ্য নিয়ে জুয়াখেলার এই ছিল নিয়ম। এতে নূতনত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। সিরাজদ্দৌল্লা কেন যে পরবর্তী কালের বাঙালীর চোখে মহাবীর ও পরম শহীদ হয়ে উঠলেন, আর নিরীহ, নির্বীর্য ও অহিফেন-সেবী মীরজাফরের ঘাড়েই কেন যে এত অপকলঙ্ক চাপানো হল, তা বুঝা দুষ্কর। বাংলার মসনদের উপর মীরজাফরের দাবী যতখানি, তার চেয়ে তাঁর প্রভু আলিবর্দীর দাবী কি বেশী ছিল?

ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মীই যে তাদের এনে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসাল তাতে সন্দেহ নেই, তবু তাদের সে সৌভাগ্যের কারণগুলি একটু বিচার করে দেখা যাক।

প্রথম, ইংরেজের নৌবল। ইউরোপের কোন রাষ্ট্রেই এত দ্রুত ও এত সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নৌবহর তৈরি হতে পারে নি। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ জাহাজগুলি যুদ্ধ ও বাণিজ্য দু কাজেই ব্যবহার করা যেত। কাজেই সমগ্র ইউরোপের জলপথে ইংরেজ হয়ে উঠল অনন্য, অপরাজেয়।

এদিকে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাদের কোন নৌবল ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোন বাদশাই এদিকে দৃষ্টি দেন নি। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সামান্য নৌবহরের প্রয়োজন হত, তার

চাহিদা মেটাত দেশের বণিকেরা। তাদের সংঘবদ্ধ করে রক্ষা করার চেষ্টা কোন সম্রাটই করেন নি। ঐতিহাসিক অর্মি বলেছেন, এদের মধ্যে এমন সব বণিকও ছিল, যারা পাঁচ শ টনের খান-বিশেক জাহাজের মালিক। কিন্তু দেশের রাজার কল্যাণ-দৃষ্টির অভাবে সে নৌবহর ক্রমে ক্রমে অবক্ষয়িত হয়ে গেল। ঐতিহাসিক ফার্মিঞ্জার বলেছেন যে শেষে অবস্থাটা এমনি শোচনীয় হয়ে ওঠল যে হিন্দুস্থান ও আরবদেশের মধ্যে যে ব্যবসা-বাণিজ্য বর্তমান ছিল তার জন্য তো বটেই, এমন কি মক্কায় হজ করতে যাওয়ার জন্যও দেশের লোককে ইংরেজের নৌবহরেরই অনুকম্পার উপর নির্ভর করতে হত।

স্যর যশিয়া চাইল্ডের নেতৃত্বে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রবল ঔদ্ধত্যও যে আওরংজেবের মত দুর্ধর্ষ সম্রাট শেষ পর্যন্ত কেন ক্ষমা করেছিলেন তার প্রধানতম কারণ তাঁর ইংরেজভীতি। তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে বিদ্রোহী ইংরেজের পক্ষে আরবসাগরে হিন্দুস্থানী জাহাজ নষ্ট করা তো নিতান্তই সহজ ব্যাপার। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এদের দস্যুতার ফলে হিন্দুস্থানী মুসলমানের পক্ষে আরবে হজযাত্রা হবে পরম বিপৎ-সঙ্কুল, এমন কি হয়ত অসম্ভবই। মানুচি লিখেছেন, আওরংজেব মোগলের নৌশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় যে হতাশ হয়েছেন, তার কারণ এই যে দেশে সেকালে যোগ্য নাবিকের সন্ধান পাওয়া যায় নি। নাবিকের সংখ্যা ছিল নগণ্য, আর তারা ছিল কাজে অনিপুণ। অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিদেশীদের নিয়োগ করলে সেটা হত নিতান্তই অবিবেচনার কার্য।

দ্বিতীয়, ইংরেজের যৌথ প্রচেষ্টার তুলনা মেলা ভার। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য বণিক, নাবিক ও রাষ্ট্রনেতাদের এমন সংহত, সুনিয়ন্ত্রিত ও নৈষ্ঠিক প্রয়াসের উদাহরণ ইতিহাসে আর নেই বললেই চলে। এই সম্মিলিত শক্তিই ইংরেজ-বাণিজ্যের মেরুদণ্ড।

তৃতীয়, ইংরেজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন একথা বললে ক্ষতি নেই, কিন্তু এদেশে তাদের প্রতিভূদের যে দূরদৃষ্টি অন্য পাশ্চাত্য বণিকদের চেয়ে বেশি ছিল একথা অস্বীকার করবার জো নেই। বাংলাদেশই যে হিন্দুস্থানে সেকালের সর্বাপেক্ষা বড় বাণিজ্যকেন্দ্র একথা কি ফরাসীরা জানতো না? তা বুঝলে তারা বাংলায় ইংরেজের এই

ক্রমাগত ক্ষমতাবৃদ্ধিকে উপেক্ষা করে তারা দক্ষিণাপথের দিকে এত ঝুঁকে পড়ত না। প্রকৃতপক্ষে হায়দারাবাদ ও আর্কটের হাঙ্গামার শুরু থেকেই, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সতেরো বছর আগে থেকেই, ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে পড়ন্ত মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার দ্বন্দ্বে প্রতিযোগিতার রেষারেষি চলছিল। এর পূর্বে পাশ্চাত্য বণিকদের নিজেদের মধ্যে যে বাদবিসম্বাদ তা ছিল সমুদ্রপথের প্রাধান্য ও পূর্বাঞ্চলের বন্দরে বন্দরে আশ্রয় নিয়ে। ইংরেজ তার দূরদৃষ্টির ফলে বুঝেছিল যে বাংলার ঘাঁটিই তার বাণিজ্যের মূলভিত্তি, এবং নবাব-বিরোধী চক্রান্তকারীদের সঙ্গে যোগ দিলে তার সে ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।

হিন্দুস্থানে দেশী লোকের সহায়তায় প্রাধান্য লাভের উদাহরণ ইংরেজের ইতিহাসে আরো অনেক রয়েছে। ডাচ পর্যটক ষ্টেভোরিনাস (১৭৬৮-১৭৭১) বলেছেন যে পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সমকালেই সুরাটের মোগল শাসনকর্তাকে হাত করে সে বন্দরেও তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। সে বন্দরে তো অন্যান্য পাশ্চাত্য বণিকেরও ঘাঁটি ছিল; তারা সব পিছিয়ে পড়ল কেন?

দেশী লোকের কাছ থেকে পাওয়া এরূপ সহায়তার সুস্পষ্ট উদাহরণের মধ্যে দিল্লির বাদশাহ ফারুকশায়ারের কাছ থেকে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের বিখ্যাত ফরমান-সংগ্রহ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই ফরমানকে ঐতিহাসিকেরা ইংরেজের হিন্দুস্থান-বাণিজ্যের 'ম্যাগ্না-কার্টা' বলে অভিহিত করেছেন; এমন ফরমান আর কখনো কোনো বণিকই সংগ্রহ করতে পারে নি। কি মায়াবলে যে এই অমোঘ, পাশুপত অস্ত্র তাদের সংগ্রহ হল তা বোধহয় ঐতিহাসিকদের কাছেও পরম দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলে মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে এই অমোঘ অস্ত্রবলেই ইংরেজ শুধু বাংলায় কেন, সমগ্র হিন্দুস্থানেই, তাদের রাজত্বের মূলভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছিল। এ ফরমানের বলে তারা গুজরাটে ও বাংলায় নামমাত্র বার্ষিক কর দিয়ে অবাধ বাণিজ্য করবার অধিকার তো পেলই, আরো পেল শুধু কোম্পানির কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে দেশের সর্বত্র মাল আনা-নেওয়ার অধিকার। অন্য বণিকদের এজন্য দেশী সরকারের অনুমতির

প্রয়োজন হত। তারপর, এই অস্ত্রবলেই দেশী লোকদের কাছে অনাদায়ী দাদনের টাকা উশুল করবার জন্য তাদের আদালতের শরণাপন্ন হবারও প্রয়োজন হত না ; সে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করতে পারত।

হয়ত যে মন্ত্রবলে ফারুকশায়ারের কাছ থেকে এ ফরমান সংগ্রহ হয়েছিল, সে মন্ত্রবলেই আওরংজেবের নাতি, বাংলার সুবাদার, আজিম-উস-সানের কাছ থেকে সংগ্রহ হল সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার জমিদারি। এদেশে পাকা ভিত্তি স্থাপনের এমন সহজ উপায় তো আর কোনো বণিকের মগজে প্রবেশ করে নি।

সুতানটি ও গোবিন্দপুর নাম দুটি সরল ও সহজবোধ্য। কিন্তু 'কলিকাতা' নাম-রহস্যের এখনো কোন সমাধান হয় নি। এ নিয়ে ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞদের গবেষণা চলছে। 'কাল কাটা' ঘাসের কথা কলকে পায় নি ; কালীঘাটের সম্পর্কের প্রসঙ্গও নাকচ হয়েছে ; 'কলিচুনের' আড়তের কথা বিবেচিত হচ্ছে। এর সঙ্গে আর একটি মত জুড়ে দিতে দোষ কি ? কালিকট থেকে যায় বলে বাংলার তৈরী কাপড়ের নাম হয়েছে 'ক্যালিকো'। হয়ত সুতানটির সুতায় সে কাপড় যে বাজারে তৈরি হত তার নাম ক্রমে কালিকট ও ক্যালিকোর মারপেঁচে 'কলিকাতা' হওয়া কি অসম্ভব ব্যাপার ?

হুগলি ছেড়ে কলকাতা আসার মধ্যে কি ইংরেজের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না ? কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে বাংলায় ব্যবসা করতে হলে বিদেশীদের এ বন্দরে প্রবেশ না করে দেশের ভিতরে যাবার জো ছিল না। তাই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কলকাতা হয়ে রইল অনন্য। ইংরেজ তৈরি করল তাদের 'ফোর্ট উইলিয়ম' কলকাতায় ; কিন্তু ফরাসী তৈরী করল তাদের 'ফোর্ট অর্লিন্স' চন্দননগরে আবার ডাচ গড়ল তাদের 'ফোর্ট গুষ্টাভাস' চুঁচুঁড়ায়। এ সবই হল অবশ্য রাজসরকারের অনুমতি নিয়ে।

আরো কথা রয়েছে। বাংলার নবাবেরা বা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা যে সবাই কেবল রাজকার্য করতেন তা নয়, গোপনে নানা ব্যবসা করে প্রচুর অর্থোপার্জনও করতেন। এ দলে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নবাব মীরজুমলা, নবাব শায়েস্তা খাঁ, নবাব আজিম-উস-সান

আর নবাব আলীবর্দীর দাদা হাজী আহ্‌মদ। এঁরা সবাই ক্ষত্রিয়-বৈশ্য। এঁদের গোপন ব্যবসায়ের সাধারণ সহযোগী ছিল ইংরেজ, ডাচও নয়, ফরাসীও নয়—পোর্তুগীজসূর্য তো তখন প্রায় অস্তমিতই হয়েছে। ইংরেজের এ বিশেষ সমাদর কেন ছিল? ঘুষ?—ঘুষ তো ছিলই, কিন্তু কেবল প্রণয়োপহার বা উৎকোচেই কি নবাবদের বিশ্বাস উৎপাদন হত? মীরজুমলা তো ইংরেজ বণিকদের অংশীদারই ছিলেন; তাঁর নানা পণ্য যেত দেশ দেশান্তরে, বিশেষ করে পারশ্যে, ইংরেজেরই জাহাজে।

আরো একটা কথা ইংরেজ গোড়াতেই বুঝেছিল। সেটি এই যে হিন্দুস্থানীরা ধর্মব্যাপারে পরম সচেতন, এমন কি অসহিষ্ণু। ফলে তাদের কালের প্রথম যুগে তারা এদেশে নিজেদের 'সত্যধর্ম' সংস্থাপনের বিশেষ উদ্যোগ করে নি, যেমন করেছিল চরম ধার্মিক ও পরম উৎসাহী পোর্তুগীজ। ইংরেজের নবনির্মিত কলকাতা বন্দরে এই দূরদর্শিতার নিদর্শন ছিল প্রচুর।

তাই একথা বললে অন্যায় হবে কি যে ইংরেজের ভাগ্য-কুয়াশার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে তাদের পুরুষকারের আলোর রেখাও ঝলমল করে উঠেছে?

॥ আট ॥

এবার আমরা আমাদের কাহিনী শেষ করছি। কালিকটে যে পরিক্রমা শুরু হয়েছিল ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে, তারই পরিসমাপ্তি হল পলাশীতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন। শুরু করেছিল পোর্তুগীজ, শেষ করল ইংরেজ। সঙ্গে এসে যোগ দিল আরো অনেকে, কিন্তু স্বর্গের পথে যুধিষ্ঠিরের সহযাত্রীদের মত কেউ-ই আর শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারল না।

এই দীর্ঘ আড়াই শ বছরব্যাপী পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আর্থিক, ধর্ম-বিষয়ক প্রভৃতি ব্যাপারে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক, তাই তার জবাবের একটা মোটামুটি খসড়া দিচ্ছি।

প্রথমে রাষ্ট্রিক দিকটার কথাই বলা যাক। এই দীর্ঘ পরিক্রমা কিন্তু সর্বথা ছিল উপকূল-ঘেঁষা। বন্দরে বন্দরে একটু ঠাঁই করে নিয়ে, বাণিজ্য-মধু সংগ্রহ করাই ছিল বিভিন্ন বণিক-গোষ্ঠীর প্রধান কামনা। একমাত্র পোর্তুগীজেরই অর্থের সঙ্গে পরমার্থের যোগ-সাধন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই, তাদের সাথে উপকূল জুড়ে রাষ্ট্রীয় সংঘাতও হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

উত্তরাপথে মোগল সাম্রাজ্য। উপকূলের প্রধান বন্দর গুজরাটের সুরাট ও বাংলার হুগলি নদীর মোহনা-ঘেঁষা কলকাতা, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলি ; ওদিকে উড়িষ্যার বালাসোর, পিপলি ও নিম্নবাংলার চট্টগ্রাম। আওরংজেবের জীবিতকাল পর্যন্ত মোগলের দাপট ছিল। স্থলপথে তাদের সাথে পাল্লা লড়তে কোন বণিকেরই সাহস হত না। কিন্তু সাগরপথে পাশ্চাত্য বণিকেরাই ছিল মহাবলী। আওরংজেবের মত দুর্ধর্ষ সম্রাটও তাদের ভয় করতেন, কারণ তাঁর নৌবলের ছিল অত্যন্তাভাব।

সুরাটের ব্যবসায়ী আবদুল গফুরের জাহাজী কারবার ছিল ; তিনি ছিলেন অন্তত বিশখানা জাহাজের মালিক। কিন্তু সমুদ্রে

তাঁর জাহাজের উপর রাহাজানির অন্ত ছিল না। ফলে ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে একবার সুরাটে মোগল-সম্রাটের প্রতিনিধি দিয়ানত খাঁ রাহাজানির অপরাধে ইংরেজের এক লক্ষ চুরাশি হাজার টাকার, আর ডাচের চার লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকার, মাল বাজেয়াপ্ত করে আবদুল গফুরকে খেসারত দেবার হুকুম দেন। আওরংজেব প্রথমে এ হুকুম মঞ্জুর করেও পরে ভয়ে তা প্রত্যাহার করেন। তাঁর নিদারুণ আশঙ্কা ছিল যে যদি পাশ্চাত্য বণিক-গোষ্ঠী একজোটে আক্রমণ করে, তবে তাদের পক্ষে মোগল-সাম্রাজ্যের সবগুলি বন্দর নষ্ট করে দিতে আর কতক্ষণ লাগবে ?

এ আশঙ্কা আদবে অমূলক নয়। এরই বছর দুই পরে, অনুরূপ কারণেই, ডাচেরা কোচিন থেকে সাতখানা আর ইংরেজরা বোম্বে থেকে তিনখানা জাহাজ পাঠিয়ে, ভয় দেখিয়ে, সুরাট বন্দরের কাজকর্ম পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। সম্রাট এর পরে যা সিদ্ধান্ত করলেন তা এই যে যারা সমুদ্র পার হয়ে এসে এদেশে বাণিজ্য করবে, তাদের ধন, প্রাণ রক্ষার ভার তাদের নিজেদেরই নিতে হবে। এই নির্ধারণের ফলে আবদুল গফুরের দল হল নিশ্চিহ্ন, আর হিন্দুস্থানের বহির্বাণিজ্য হল পাশ্চাত্য বণিকের করতলগত।

এই হল মোগল-বন্দরের চিত্র। দক্ষিণাপথের কথা একটু স্বতন্ত্র। সে অর্ধের অভ্যন্তরে মারাঠার পরাক্রম তখন ক্রমবর্ধমান, কিন্তু উপকূল জুড়ে বহু রাজা-রাজড়া। তাই গোয়া, কালিকট, কোচিন, ট্রেনকুইবার, পণ্ডিচেরি, সেন্টটোম (মাদ্রাজ) প্রভৃতি বন্দর নিয়ে চলল বণিক-গোষ্ঠীর সাথে নানা সন্ধি-বিগ্রহ। এরা সর্বত্রই জায়গা করে নিল হয় দাপটে, নয় অর্থমূল্যে, আর বসার জায়গা পেয়ে সর্বত্রই শোয়ার জায়গার জন্য নানা ফন্দিফিকিরে মন দিল। লংকায়ও ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটল।

হীনবলেরা স্বভাবতই পরম অসূয়াপরবশ; তার উপর এসব ছোটখাটো রাজা-রাজড়াদের মধ্যে মোটেই সহানুভূতির বা একতার বন্ধন ছিল না। এই অসদ্ভাবের সুযোগে অনেক ক্ষেত্রে এক রাজার রাজ্যে ভর করে বণিকেরা অন্য রাজার রাজ্যে হানা দিত। রাজারা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে পারলেও আনন্দ

পেতেন ; অসূয়া ও বিদ্বেষের শক্তি এমনি ! ফলে প্রথমে যদিও বণিকেরা বন্দরে বন্দরে জাহাজ নোঙর করার জন্য একটু জায়গা পেলেই কৃতার্থ হত, ক্রমে বন্দরের চৌহদ্দির মধ্যে 'ফ্যাক্টরি' বা মালগুদাম তৈরি করার দাবি করে বসল, আর সে ফ্যাক্টরি, আত্ম-রক্ষার অছিলায়, ক্রমে পরিণত হল 'ফোর্টে' বা দুর্গে।

এ ছাড়া আরো একটা কথা রয়েছে। মোরল্যাণ্ড বলেছেন, পাশ্চাত্য বণিকদের একটা সাধারণ ধারণা ছিল যে সারা এশিয়ায় এটাই প্রচলিত নিয়ম যে বিদেশী বণিকদের অধিনিবেশগুলি এদেশের রাজার এখতিয়ারের বাইরে ; সেখানের বাসিন্দা বণিকদের অধিনায়কই তাদের হর্তা, কর্তা, বিধাতা। পোর্তুগীজেরা মলাক্কাতে এ নিয়মই দেখে এসেছে ; কালিকটেও, তাদের মতে, মিশরী ও আরবী বণিকদের এ ব্যবস্থাই ছিল। কাজেই পাশ্চাত্য বণিকেরাও স্বাভাবিকভাবেই স্বাতন্ত্র্য ও স্বরাজের দাবি করত।

এসব রাজা-রাজড়াদের উদ্দেশ্য ছিল বহির্বাণিজ্যের প্রসার করে রাজকোষের অর্থবৃদ্ধি। এঁদের সবারই নীতি ছিল, 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'। কিন্তু এ নীতি যে দুর্বলের পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুতুল্য, একথা বিস্মৃত হয়ে এঁরা ক্রমাগত একদল বণিকের আশ্রয় নিয়ে অন্যদল বণিকের অত্যাচার রোধ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বণিকদের মধ্যে এমন কে আছে যে তাদের আশ্রয় ভিক্ষার সুযোগ নেবে না ? ফাঁক পেলে তারা যে সবাই দেশের বিত্ত ও ঐশ্বর্য গ্রাস করবে এ পরম নগ্ন সত্য রাজাদের মগজে প্রবেশ করল না।

পূর্ব উপকূলে রামেশ্বরের মন্দিরের ঐশ্বর্য-খ্যাতি ছিল অসাধারণ। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ডাচেরা লোভ সামলাতে না পেরে সে মন্দির বিধ্বস্ত করে যুগ যুগ সঞ্চিত অর্থলাভের চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হল না। সে যুগে কি করে যে হিন্দুরা এত একতাবদ্ধ হল তা বিস্ময়ের বিষয়, তবে তারা শুধু রামেশ্বরে ডাচদের বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হল না, তাদের নানা বন্দরের ফ্যাক্টরিগুলিও ধূলিসাৎ করার ভয় দেখাল।

দিনেমার ছিল বণিকদের মধ্যে সবচেয়ে হীনবল। তারই-বা দাপট কত! ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেনকুইবারের লাগাও এক টুকরা জমিদারি

নিয়ে তারা তাঞ্জোরের রাজার সাথে লড়াই শুরু করল। তাদের সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে এসে যোগ দিল ইংরেজ।

এমনি হল কত শত খণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি। পোর্তুগীজ ও কালিকটের জামোরিনের খণ্ডযুদ্ধ তো চলল এক শ বছর। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা-রাজড়ার দুর্বলতা ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে লাভবান হল পাশ্চাত্যের বণিক-গোষ্ঠী। এমনকি সৈন্যদল ভাড়া খাটিয়েও তারা, বিশেষ করে ফরাসী ও ইংরেজ, নানা রাষ্ট্রিক বিসংবাদে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করল।

হিন্দুস্থানের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব উপকূলব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে রাষ্ট্রিক বিপ্লবের কোঠায় ফেলা যায় না। যদি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ক্ষোভের দাহ তীব্র হয়ে দাউদাউ করে জ্বলে না উঠত, যদি অসূয়া, বিদ্বেষ, অনৈক্য, বিলাসিতা ও অবিচারে দেশের মানুষ নির্জীব হয়ে না যেত, যদি আওরংজেবের রাজনীতি হিন্দু-বিদ্বেষ-বহ্নিতে ভস্মীভূত না হত, তবে হয়ত ডাচ, ইংরেজ বা ফরাসী কেউ-ই ভারতের উপকূল ভেদ করে এসে ভিতরে প্রবেশ করতে পারত না। হয়ত বা নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী কলহে তারা নিজেরাই ক্রমে হীনবল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

এবার সামাজিক রীতিনীতির কথা।

হিন্দুস্থানের সামাজিক রীতিনীতিতে সেকালে পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশি পড়েনি, পড়বার কথাও নয়। এখন যাকে আমরা ফিরিঙ্গিপনা বা ইংরেজীপনা বলি, তার তখনো জন্মই হয় নি। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে তবু কোথাও কোথাও, বিশেষ করে দক্ষিণাপথে, সাধারণ লোকের সংযোগ ঘটেছিল, কিন্তু বণিকদের কাজ-কারবার ছিল রাজ-দরবারের ও হাট-বাজারের লোকের সঙ্গে। গো-খাদক, এমন কি শূকর-খাদক, বলে তো হিন্দুরা তাদের 'শতহস্তেন' দূরে থাকত। বরং বিদেশীরাই ক্রমে এদেশের নানা রীতিনীতিতে রপ্ত হয়ে গেল। প্রথম যুগে তাদের সঙ্গে যেসব মহিলা আসতেন তাঁরা তো এদেশের লোকের মত মসজিদে শিরনি মানতেন, আর মন্দিরে দিতেন ভোগ। অনেকে এদেশের আচার-বিচারকে মোটামুটি মেনেই চলতেন। অশনে বসনে পুরুষেরাও দেশী ধনী-মানীদের অনুসরণ করত।

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সেকালে ফলিত-জ্যোতিষে বিশ্বাস করত না, এমন লোক দেশে ছিল বিরল ; কি হিন্দু, কি মুসলমান। তাই জ্যোতিষীদের ছিল পরম সম্মান। হাঁচি, টিকটিকি, ডান ও বাম নাকে নিঃশ্বাসের সুফল ও কুফল মানতো না কে ? তারপর সুচিকিৎসকের অভাবে ও অজ্ঞানতার প্রভাবে মাদুলি, তাবিজ, কবচ, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতির প্রতি ছিল সবারই অগাধ বিশ্বাস। জাদুকরের ইন্দ্রজালের কাহিনী ঘুরত সবারই মুখে মুখে—রাজদরবারে, হাটে-বাজারে। আইনত মানুষ বিক্রির বাধা ছিল না ; দেনার দায়ে কৃষিজীবী অনায়াসে পুত্রকন্যা বিক্রি করে দিত। ফলে অর্থবানের গৃহে ক্রীতদাস ও দাসীর অন্ত ছিল না। ক্রীতদাসের রীতির ফলে ব্যাপক হল প্রভু ও দাসের, উভয়েরই, নৈতিক চরিত্রের অবনতি, আর দাসীর সঙ্গে এল যৌন অসংযমের প্লাবন। হিন্দুস্থানের বাইরে থেকেও বহু ক্রীতদাস-দাসীর আমদানি হত, বিশেষ করে রাজা-বাদশাদের জন্য।

পানাসক্তি ছিল সেকালের ধনী-সমাজে বহু ব্যাপক। উত্তরাপথে জাহাঙ্গীর ও সাজাহান বাদশাদের আমলে সর্বত্র, বিশেষ করে দিল্লী-আগ্রায়, সুরার স্রোত বইত অবাধে। সে স্রোত রোধ করার চেষ্টা করেন আওরংজেব। কিন্তু প্রদীপের নীচেই ঘন অন্ধকার! তাঁর প্রধান উজিরের এ দোষ তাঁর অজানা ছিল না। একদিন এ কথা নিয়ে উজিরের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হল। উজির তাঁর পানাসক্তির কথা অস্বীকার করলেন না, তবে বললেন, খোদাবন্দ! এখন বৃদ্ধ হয়েছি, পেটে একটু 'ইয়ে' না পড়লে এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার শক্তি পাব কোথায় ? সে যে কী শক্তি, দেখতে চান তো কাল দেখাব।

পরদিন উজির সাহেব আওরংজেবকে ডেকে আনলেন এক পান ও ভোজ সভায়। সে সভায় সভ্য চার জন। প্রথম জনের দুটি চক্ষু নেই, দ্বিতীয় জনের দুটি হাত, তৃতীয় জনের দুটি পা। চতুর্থ জন অবশ্য সর্ব-অবয়বী, কিন্তু দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। পেটে পেয়ালা দুই শরাব পড়তেই অন্ধ চিৎকার করে বলল, আঃ শরাবের রঙের কি বাহার, দিল খোশ হয়ে যায়। হস্তহীন বাধা দিয়ে বল, অ্যাই হারামজাদা, বেশি চেঁচাবি না, নইলে ঘুষি মেরে তোর নাক ফাটিয়ে দেব।

খঞ্জই-বা কম যায় কিসে? সেও তেড়ে উঠে বলল, যদি না থামিস তো লাথি মেরে তোর হাড় গুঁড়িয়ে দেব। চতুর্থটি সকলকে ধমকে বলল, তোরা সবাই বড় বে-আদব, আমি স্বয়ং বাদশা এখানে বসে থাকতে তোরা এত জোরে চেঁচাস!

উজির বললেন, হুজুর দেখলেন তো, মাত্র দু-পেয়ালারই শক্তি কত! অন্ধ ফিরে পেল তার দৃষ্টি, পাণিহীন ও খঞ্জ ফিরে পেল তাদের অবয়ব, আর ভিক্ষুকের ঝুলি ভরে গেল অফুরন্ত ঐশ্বর্যে।

সেকালের লোকের আসব-প্রিয়তার যুক্তি ছিল এরূপই। শুধু ধনীরাই নয়, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত কেরানীকুল অর্থাৎ 'কায়েত' সম্প্রদায় ও রাজপুত সৈন্যেরাও ছিল এ ব্যাপারে অগ্রণী।

দেশী লোকের মদ্যপান নিষিদ্ধ করে আওরংজেব বিদেশীদের মদ চোলাই করার অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রায় সবাই এ ব্যাপারে নিতান্ত পরার্থপর হয়ে সমাজে সুরার স্রোত শুধু যে অব্যাহতই রাখল তা নয়, বৃদ্ধিও করল। ফলে এই সাদা ব্যাপারীরা, আমরা এখন যাকে 'কালোবাজার' বলি তারই সৃষ্টি করল আসব-পায়ীদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পকেটও ভারী হতে লাগল।

সেকালে সতীদাহ প্রায় বিরল হয়ে আসছিল। বিদেশীরা সাধারণত একে ধর্মান্ধতার চরম পরিণতি বলেই মনে করত। এতে তবুবা কিছু ধর্মের প্রলেপ ছিল, কিন্তু যে কুসংস্কারের ফলে সমগ্র ইউরোপে ডাকিনী-দাহ এত ব্যাপক হয়েছিল, সেই কুসংস্কারগ্রস্ত মনই তো ছিল তাদের। এক জার্মেনীতেই মাত্র এক শ বছরে এক লক্ষ ডাইনি পুড়িয়ে মারা হয়, অর্থাৎ গড়পড়তা মাসে প্রায় এক শ।

বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে তাই এদেশের সামাজিক রীতিনীতির কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

এবার ধর্ম-ব্যাপারের কথা বলি।

সেকালে ধর্মের নামে ছিল কুসংস্কারের অবাধ প্লাবন, যেমন উত্তরাপথে, তেমনি দক্ষিণাপথে। হিন্দুর ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী ছিল গুরুমহারাজ ও মহন্তমহারাজ, আর মুসলমানের পীর ও ফকির। ঈশ্বর ছেড়ে তাঁর প্রতীক ও অভিজ্ঞান পূজা নিয়ে সারা দেশটা ছিল

মত্ত। এমন কি আওরংজেবের মত গোঁড়া, মূর্তিপূজা-বিরোধী মুসলমানও পয়গম্বরের পদচিহ্ন ও কেশের পূজা করতেন।

মোগল-সাম্রাজ্যে সর্বত্র নানা মতের ফকির ছিল অসংখ্য। এঁদের দাপটও ছিল অভাবিত। নবাব, আমির, এমন কি দিল্লির বাদশা পর্যন্ত এঁদের সমীহ করে চলতেন। পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, রাজ-দ্বারে সর্বত্র এঁদের অবাধ গতিবিধি ছিল এবং পেশা ভিক্ষাবৃত্তি হলেও এঁরা মেজাজে ছিলেন ভিখারী-রাজ।

আওরংজেব সর্বদা ধর্মনিষ্ঠার ভান করতেন, কিন্তু প্রবাদ এই যে এই ভানকারী ভেখধারীর দলই তাঁর সৌভাগ্যের প্রথম সোপান নির্মাণ করেছিল।

আওরংজেব তখন দক্ষিণাপথে। তাঁর খেয়াল হল নানা মতের ফকিরদের নিমন্ত্রণ করে, তাঁদের দেবেন এক বিরাট ভোজ এবং দক্ষিণা হিসাবে প্রত্যেককে এক-একটি করে নূতন ফকিরি-পোশাক। ঢেঁটরা পিটিয়ে নিমন্ত্রণ করা হল। নির্দিষ্ট ক্ষণে ভোজের মাঠ 'ফকিরে ফকিরারণ্য' হয়ে গেল। ভোজ শেষ হল ; এখন পোশাক বিতরণের পালা। প্রত্যেককে পুরনো বেশটি ছেড়ে নূতন পোশাক পরতে বলা হল। কিন্তু কেউ তাতে রাজী নন ; সবাই যে যাঁর পুরনো বেশটি পরিধান করেই নূতন সজ্জা নিয়ে যেতে চান।

খেয়ালী আওরংজেব আবদার মানলেন না। জোর করে সবাইকে পুরনো সাজ ছাড়িয়ে নূতন পোশাক পরিয়ে দিলেন। কি সৌভাগ্য ! পরে এই পুরনো সাজগুলি খুঁজে বের হল এঁদের বহুদিনের সঞ্চয় —প্রায় দশ লাখ টাকা ! সেটা আওরংজেব আল্লার দান বলেই গ্রহণ করলেন !

টাকাটা দিয়ে তিনি একটি মূল্যবান হীরক ক্রয়ের কল্পনা করলেন। কিন্তু বাধা দিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু শেখ মীর। তিনি বললেন, তুমি যদি এ হীরকের চেয়েও বেশী মূল্যবান বস্তু পেতে চাও, তবে এ টাকা দিয়ে তোমার নিজস্ব একদল সৈন্য গঠন কর। আওরংজেব সে কথার অর্থ বুঝলেন।

মানুচি বলেছেন যে, আটচল্লিশ বছরের মধ্যে তিনি একজন মুসলমানকেও খ্রীষ্টান হতে দেখেন নি, যদিও অনেক সাদা খ্রীষ্টানকে

মুসলমান হতে দেখেছেন। সত্যি মোগল-সাম্রাজ্যে কোন দুঃখে মুসলমানেরা খ্রীষ্টান হতে যাবে? তারাই বরং এ দেশে তখন নানা সুখ-সুবিধার জন্য রাজধর্ম গ্রহণ করত। অনেক ক্ষেত্রে নরহত্যা পর্যন্ত করেও ধর্মান্তরের ফলে খুনী বেকসুর খালাস পেয়ে যেত। তারপর মুসলমানীর রূপ-সাগরেও কোনো কোনো খ্রীষ্টান ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে।

উত্তরাপথে একমাত্র বাংলায়ই কিছু সংখ্যক হিন্দু ধর্মান্তরিত হল খ্রীষ্টধর্মে। সবাই অবশ্য নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু। ফ্রান্সিসক্যান ও যীশু-সঙ্ঘের বহু ছোটখাট গীর্জা স্থাপিত হল পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের স্থানে স্থানে; হুগলিতেও এদের আস্তানা হল বড় রকমের। কিন্তু পোর্তুগীজদের ধর্মপ্রচারে সাধারণ নিয়ম ছিল জোর-জবরদস্তি। লোভে পড়ে কেউবা খ্রীষ্টানদের দলে নাম লেখাল। কিন্তু খ্রীষ্টান হওয়া তো এমন একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার নয়; হিন্দুর সর্বপ্রকার আচার-ব্যবহার বজায় রেখে, শুধু খ্রীষ্ট ভজতে গীর্জাতে গেলেই খ্রীষ্টান হওয়া যেত। ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথাই-বা কার ছিল; আচার-বিচারই ছিল সেকালে ধর্মের সংজ্ঞা। সে আচার বজায় থাকলে আর ধর্ম লোপ হয় কি করে?

পাদ্রীরা কে কয়টি আত্মা মুক্ত করতে পারলেন, অর্থাৎ কয়টি লোকের মাথায় জল ছিটিয়ে তাদের পবিত্র করে স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত করতে পারলেন, তারই হিসাব কষতেন। এ কাজের সুবিধার জন্য অনেকেই হাতুড়ে বনে যেতেন। মুমূর্ষু দরিদ্র রোগীদের নিয়েই চলত এঁদের কারবার; রোগীদের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশী। যাদের প্রাণের আর আশা নেই, তাদের আত্মীয়েরা শেষ চিকিৎসা হিসাবে মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, জলপড়া কিছুতেই আর মানা করত না; তাই ফাঁকতালে পাদ্রীরা 'Service for God' বা ঈশ্বর-নিয়োজিত কার্য করার সুযোগ পেতেন। হাতুড়ে মানুচি নিজেও এমন অনেক কাজ করেছেন।

কিন্তু দক্ষিণাপথে পাদ্রীদের ধর্মপ্রচার কার্যটা ছিল একটু ঘোরালো। পোর্তুগীজের আগমনের পূর্বেই কালিকটের আশপাশে একদল খ্রীষ্টানের বাস ছিল। এরা এসেছিল সিরিয়া থেকে। এদের

কয়েকটি গীর্জাও ছিল সাগরের উপকূলে তিতুকোরিণ ও কোচিনের মধ্যে। ক্রমে পোর্তুগীজেরা এগুলি দখল করে বসে। কোনোটা গেল ফ্রান্সিসক্যানদের হাতে, কোনোটা যীশুসঙ্ঘের। এদের পাল্লায় পড়ে উপকূলের বহু সংখ্যক নিতান্ত দরিদ্র ও অশিক্ষিত মৎস্যজীবী খ্রীষ্টানদের দলে নাম লেখাল—লোভে বা ভয়ে।

কিন্তু দক্ষিণাপথে খ্রীষ্টধর্মের সবচেয়ে বেশী প্রসার হল যিশুসংঘের পাদরী নোবিলির চেষ্টায়। নোবিলি ইটালির ফ্লোরেন্সের মানুষ; ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে ধর্মপ্রচার করতে এসে এদেশেই থেকে যান। কিন্তু ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যিশুসংঘ পরিত্যাগ করে তার আট বছর পরে মাদ্রাজের ময়লাপুরে প্রায় আশি বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ইনি নিজেকে 'রোমান ব্রাহ্মণ' আখ্যা দিয়েছিলেন। আবার শঙ্করাচার্যের দশনামী (পুরী, গিরি, তীর্থ প্রভৃতি) সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সার্থক অনুকরণে নিজেকে বলতেন 'রোম-পুরী'। ইনি ব্রাহ্মণের সাথেই মেলামেশা করতেন। নিরামিষ আহার করে, ব্রাহ্মণের বেশ পরিধান করে, সন্ন্যাস-জীবন যাপন করে সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতেন।

এ সবই ছিল কিন্তু সেকালের রোমান ক্যাথলিক পাদরীদের ভেখ। দক্ষিণাপথে চিরদিনই ব্রাহ্মণদের প্রবল প্রতিপত্তি। এঁদের সম্মান সেখানে অপরিসীম। এঁরা তো অশুচি, বিধর্মী পাদরীদের কাছে ঘেঁষতেই দিতেন না! ব্রাহ্মণের ভেখ যে এদেশে অমূল্য সম্পদ একথা বুঝতে পাদরীদের দেরী হল না। তাই, রোমান ক্যাথলিক পাদরীদের বিশেষ করে যিশুসঙ্ঘের, সেখানে শিখতে হত মালাবারের ভাষা ও সংস্কৃত, থাকতে হত হিন্দুর আচরণ মেনে, এবং পরতে হত ব্রাহ্মণের বেশ। এঁরা সবাই নিজেদের বলতেন 'রোমান ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ তাঁরা এদেশের ব্রাহ্মণদের স্বগোত্রীয়ই বটেন, যদিও রোমান রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা নূতন অবতার খ্রীষ্টের পূজা প্রচলনের জন্য এদেশে এসেছেন। দেশের লোক তাঁদের কণ্ঠে দেবভাষার গুঞ্জন শুনে ভক্তিরসাপ্লুত হত।

পাদরী নোবিলি তাঞ্জোরের রাজার কাছে দরবার করে তাঁর

রাজ্যে গির্জা স্থাপনের আরজি মঞ্জুর করিয়ে দিলেন। এদিকে ওদিকে প্রায় শ খানেক গির্জা স্থাপিত হল। কিছুদিন পরে মাতুরা হল তাঞ্জোর-রাজের শাসনাধীন। তাই তাঞ্জোর আর মাতুরাতে হুহু করে হিন্দু-আচারব্রতী খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে গেল। বছর পঞ্চাশেকের মধ্যে হাজার ত্রিশেক মানুষ রোমান ব্রাহ্মণের শিষ্য হল।

রামনাদের এলাকায়ও পাদরী ব্রিট্টো দরিদ্র অন্ত্যজদের মধ্যে অনুরূপ সাফল্য লাভ করলেন। এমনি চলল বহুকাল।

কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হল কিছুদিন পরে—১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে। পণ্ডিচেরিতে তখন ফরাসী কায়েম হয়েছে; সেখানে রোমান ক্যাথলিক পাদরী ফরাসী। সে পাদরীর দলে তখন আর কেউ ব্রাহ্মণত্বের দাবী করে না; বরং ব্রাহ্মণদের অপমান করে তারা দেশী দেবদেবীকে নিয়ে হাসি মস্করা করতে ওস্তাদ। পণ্ডিচেরি ফরাসীর এখতিয়ারে। এখানে ফরাসী পাদরীরা অন্ত্যজ খ্রীষ্টানকে দেশী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সর্বব্যাপারে একই পর্যায়ভুক্ত করে ফেললেন। পণ্ডিচেরির ব্রাহ্মণেরা এসব অপমান নিঃশব্দে সহ্য করতে লাগলেন বটে, কিন্তু তাঞ্জোরে তাদের গোষ্ঠীগোত্রকে ক্রমশ তাতিয়ে তুলতে শুরু করলেন।

পরিশেষে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হল একদিন। পণ্ডিচেরিতে পাদরী ডলফাস একটি স্বরচিত প্রহসনের অভিনয় করলেন; এতে নটনটী হল মালাবারের দেশী খ্রীষ্টানের দল। প্রহসনটিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, কার্তিকেয়, পার্বতী প্রভৃতি হিন্দুর পরমপূজ্য দেবদেবীকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করে যিশুর মাহাত্ম্য প্রচার করা হল। তারপর সে অভিনয় দেখতে আমন্ত্রণ করে আনা হল পণ্ডিচেরির হিন্দু জনসাধারণকে।

সে উত্তেজনার ছোঁয়াচে তাঞ্জোরের সমগ্র হিন্দু-সমাজ ক্ষেপে উঠল; সেখানকার হিন্দু রাজাও জ্বলে উঠলেন। ফলে রাজরোষে তাঞ্জোর এলাকার বহু গির্জা ধ্বংস হল, 'রোম-পুরী'র দল বন্দী হয়ে কারাগারে পচল আর যিশুভক্ত হিন্দুরা স্বধর্মে ফিরে এসে রাজদ্বারে লাঞ্ছনা ও প্রতিবেশীর গঞ্জনা থেকে বাঁচল। রোমান ব্রাহ্মণদের

আশাতরীর ভরাডুবিও হত সে এলাকায়, কিন্তু তাঁদের রক্ষা করলেন দাউদ খাঁ। তিনি ছিলেন আওরংজেবের দক্ষিণাপথের প্রতিনিধি। তাঞ্জোর সেকালে ছিল মোগলের করদ রাজ্য। দাউদ খাঁর এই খ্রীষ্টান-প্রীতির কারণ হয়ত বহু। কিন্তু সে যা-ই হোক, তিনি তাঞ্জোর-রাজকে একখানা মিঠেকড়া চিঠি লিখলেন। ফলে 'রোম-পুরী'র দল স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। যিশুভক্ত হিন্দুরা আবার যথারীতি তাদের হিন্দুত্বের চিহ্ন ভস্মের পুণ্ড্র, ও চন্দনের তিলক কেটে, মেরীমাতার মূর্তি মাথায় নিয়ে পথে পথে শোভাযাত্রা শুরু করল।

খ্রীষ্টধর্ম সেকালের হিন্দুস্থানের সনাতন ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করতে পারল না। যে অন্ত্যজের দল তা গ্রহণ করল, তাদেরও তা হয়ে রইল বহির্বাস—উত্তরীয় মাত্র ; মূল পোশাক রইল তাদের হিন্দুর-ই।

এবার এল আর্থিক সংগতির কথা।

পাশ্চাত্য বণিকদের আগমনে দেশের বহির্বাণিজ্য বেড়ে গেল। তাতে সাধারণভাবে সর্বত্র দেশে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কিছু আর্থিক স্বাচ্ছল্য বাড়ল বটে। কি উত্তরাপথে, কি দক্ষিণাপথে বেশিরভাগ লোকই কৃষিজীবী। তারা খাদ্যশস্য, মসলা ও নীলের দাম বেশি পেল ; উৎপাদনও বেড়ে গেল। তাঁতিদের উপার্জনও বাড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল রাজার কর। মোগল-সাম্রাজ্যে তবু এ কর-বৃদ্ধির হার কিছু কম হল, কিন্তু অন্যান্য রাজা-রাজড়ার দেশে তা হয়ে উঠল এ মূল্যবৃদ্ধির প্রায় অর্ধেক। কাজেই দেশের বহির্বাণিজ্যে যারা মাল যোগান দিল, তারা রইল যে তিমিরে সে তিমিরেই। বাড়ল শুধু রাজার আয় আর মধ্যস্থ গোলাদার ও দালালের লাভ। সে আয় ও লাভের টাকা ব্যয় হল বিলাস-ব্যসনে। তারপর সপ্তদশ শতকের তৃতীয়পাদ পর্যন্ত বহির্বাণিজ্য আর বাড়লই বা কত? এর পরে ধাপে ধাপে বাড়তে লাগল বটে, কিন্তু তা কেবল বাংলাদেশে, কারণ শায়েস্তা খাঁর কাল থেকে বাংলায় এল শান্তি, নিরুপদ্রবতা। অন্যত্র তখনো চলল নানা প্রকার হাঙ্গামা। তারপর, বাংলাই ছিল সেকালে হিন্দুস্থানের সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালিনী দেশ।

রাজদ্বারে বিদেশী বণিকদেরও উচ্চহারে কর ও প্রভূত উৎকোচ দিতে হত। কাজেই তারা যে সেটা নানাভাবে পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করবে তাতে আর সন্দেহ কি? এর ফলে তারা নানা ফন্দি-ফিকির করে মালের দাম ন্যায্য মূল্যের চেয়েও কম দিতে চেষ্টা করত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই বাংলা হয়ে উঠল পাশ্চাত্য বাণিজ্যের মূলকেন্দ্র। এদিকে বাংলার নবাব বা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা বিদেশীবণিকের সঙ্গে জুটে বখরায় কারবার করতেন। আবার বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর কর্মচারীরাও কোম্পানিরই মূলধনে নিজস্ব ব্যবসা করে ব্যক্তিগত তহবিল ভর্তিতে মন দিল। ফলে, দেশী বণিকদের পক্ষে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেওয়া ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। তারপর, ফারুকসায়ারের দেওয়া 'ম্যাগ্নাকার্টা'র বলে বলীয়ান হয়ে ইংরেজ দেশী, বিদেশী সকল বণিককেই প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করে চলে গেল। জনসাধারণের, বিশেষ করে বাংলা ও গুজরাটের লোকের, আর্থিক অবস্থা ক্রমাগত জীর্ণ হতে লাগল; কলকাতা ও সুরাটের তোরণ দিয়ে হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য নিত্য চলল শ্বেতদ্বীপে।

এমনি চলল পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত। তারপর দেশের লোকের জীর্ণতা বাড়ল অতি দ্রুতবেগে এবং তার বিকট মূর্তি দেখা গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে।

এবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলা যাক।

এ আড়াই শ বছরের মধ্যে হিন্দুস্থান পাশ্চাত্যের ভাণ্ডারে কি নূতন কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানধারার, সন্ধান পেয়েছে? বিশেষ কিছু পায় নি, পাবার কথাও নয়। কারণ, সেকালে যারা এদেশে এসেছে তাদের প্রায় সবাই এসেছে অর্থলোভে, রোজগারের চেষ্টায়। শিক্ষা, দীক্ষা নিয়ে বড় কেউ আসে নি। তবে, একেবারে যে কেউ আসে নি, তা নয়।

বিদেশীদের সম্পর্কে কিন্তু সেকালে এ দেশের লোকের ছিল পরম অশ্রদ্ধা, এমন কি অবজ্ঞা। বিলাসিতার জন্য তাদের মনোহারী মাল ধনীরা আদরের সঙ্গেই কিনতেন বটে, তবে তাদের ভাষা কেউ শিক্ষা করার চেষ্টাও করতেন না। রাজা-রাজড়ারা বিদেশীর কাছে তাদের কলাশিল্পরীতি ও যুদ্ধকৌশলের খবর নিতেন মাত্র, কিন্তু তা শিখে নেবার ব্যবস্থা করেন নি। এদিকে বিদেশীরা কিন্তু দেশী

লোকের সঙ্গে মেশবার ও তাদের ভাষা শেখবার যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। পাদরী ষ্টীফেনস প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে লিসবন হয়ে গোয়ায় আসেন ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। তিনিই হিন্দুস্থানে প্রথম ইংরেজ অতিথি। তিনি এসে শিক্ষা করলেন সংস্কৃত, মারাঠী ও কানাড়ী ভাষা। তারপর প্রণয়ন করলেন পোর্তুগীজ ভাষায় কানাড়ী ব্যাকরণ। সেখানাই ইউরোপীয়-রচিত ভারতীয় ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। কোনো কোনো সংস্কৃত পুরাণও তিনি অনূদিত করলেন পোর্তুগীজে।

১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন পোর্তুগীজ সাহিত্যিক বারবোসা। তাঁর লেখা হিন্দুস্থানের বিবরণই পোর্তুগীজ ভাষায় হিন্দুস্থান সম্পর্কে প্রথম পুস্তক। এতে রয়েছে এদেশের সেকালের তুটি রীতির জ্বলন্ত চিত্র; এক, ব্রাহ্মণদের সতীদাহের; তুই, লিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায়ের সতী-সমাধির বা জ্যান্ত কবরের।

তাঁর এ চিত্রের প্রথমটি হয়ত বা সত্য ঘটনা মূলক, কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পর্কে গভীর সন্দেহ রয়েছে। কারণ লিঙ্গায়তের ইতিহাস অন্যরূপ। মধ্যযুগে দক্ষিণাপথে এই বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল; সম্ভবত চতুর্দশ শতকেরও পরে। শিবলিঙ্গ দেহে ধারণ করা এঁদের অবশ্যপালনীয় ধর্মাচরণ। এঁদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল; সমাজে মহিলাদের স্থানও ছিল উচ্চে। কাজেই, বিধবার জ্যান্ত কবরের কথাটা বোধহয় নিতান্তই কাল্পনিক।

ভেষজজীবী ডাঃ অর্টা ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থানের উদ্ভিদ সম্পর্কে নানা তথ্যবহুল একখানা পুস্তক প্রকাশিত করেন। পোর্তুগালের মহাকবি ক্যামোস গোয়ায় এসেছিলেন ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর লেখা মহাকাব্য 'লুসিয়াডাস' গামা-প্রশস্তি মাত্র। তিনি এদেশের রীতিনীতি, ধর্ম, সাধারণ মানুষ ও রাজ-রাজড়ার আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে নানা কথার অবতারণা করেছেন তাঁর মহাকাব্যে, কিন্তু তাঁর একান্ত কামনাটাও সেখানে স্পষ্ট করে বলেছেন। সে কামনা, হিন্দুস্থানকে খ্রীষ্ট ভজাতে হবে। তাঁর কাব্যতরী বানচাল হয়েছে ধর্মের তরঙ্গে।

ঠিক অনুরূপ কারণেই জেস্যুয়িটের দলও তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এদেশের লোকের কোনো কাজে লাগাতে পারেন নি। এঁরা

শুধু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য শিকারের সন্ধানে ফিরতেন ; পাদরী এনড্রেড তো ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে একদল যাত্রীর সঙ্গে হিমালয়ের বদ্রিনাথ তীর্থেই গেলেন !

পর্যটকদের মধ্যে ফরাসী বার্নিয়ার বিদ্বান লোক, কিন্তু তাঁর ভাষা কেউ জানতো না, কেউ শিখেও নি।

সর্বশেষ, এদেশে পাশ্চাত্যের প্রধান দান তো নববিজ্ঞান। তার জন্ম হয়েছে মাত্র চারশ বছর আগে—জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের কালে। কোপারনিকাসের মৃত্যু হল ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু তাঁর আবিষ্কারের কাহিনী প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করলেন গ্যালিলিও, সত্তর-আশী বছর পরে। নিউটন অবশ্য অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগেই পদার্থ-বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করলেন, কিন্তু এসব তথ্য কি ক্লাইভ, ডুপ্লে, গোয়েন, ড্রেকের জানা ছিল, না জানবার কথা ? কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের পাঠ নিয়ে কে আর সেকালে হিন্দুস্থানের বাজার-সরকারি করতে আসবে ?

গত দুশ বছরের হিন্দুস্থানের ইতিহাসের সঙ্গে তার পূর্বের এই আড়াই শ বছরের কাহিনীর পটভূমিকা সংযোজন না করলে সে ইতিহাস স্পষ্ট করে বুঝা যায় না। মূলত এই পরবর্তী কাহিনী পূর্ববর্তী ইতিহাসেরই ক্রমবিকাশ।

এই দুশ বছরের তমিস্র বিদূরিত করে হিন্দুস্থানে নবসূর্যের অভ্যুদয় হয়েছে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। মানুষের ভাগ্যের মত জাতির অদৃষ্টেও আলোছায়ার খেলা এক অদৃশ্য বিধির অমোঘ বিধান। এটা অবশ্য সত্য যে কোনো জাতিই আলোর শিখাকে চিরস্থায়ী করতে পারে না, কিন্তু ইতিহাসের অনুশাসন অবহেলা না করলে তার দীপ্তি ও আয়ু বাড়ানো নিশ্চিতই সম্ভবপর। আমরা যেন একথা না ভুলি।

॥ পরিশিষ্ট ॥

[সেকালের যানবাহন ইত্যাদি ও বিদেশী অর্থ-বিনিময়ের হার]

হিন্দুস্থানে পদার্পণ করেই বিদেশীদের 'দোগানায়' বা শুল্কবিভাগে কর দিতে হত। কর অবশ্য উচ্চহারে ধরা হত না, কিন্তু লুকানো পণ্যের জন্য অনুসন্ধান করা হত অতি নিপুণভাবে, কারণ সেকালেও চোরাই কারবার হত প্রচুর। সাধারণত সোনা ও রূপার উপর শুল্ক ছিল শতকরা আড়াই টাকা; অন্যান্য জিনিসের জন্য দিতে হত শতকরা সাড়ে তিন টাকা।

ইউরোপের মত এদেশে পাকা পান্থনিবাস ছিল না, তবে সকল বড় বড় শহরেই, এমনকি কোনো কোনো গ্রামেও, চলনসই রকমের সরাইখানা ছিল। সেখানে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থাও ছিল, আহার্যও পাওয়া যেত। উত্তর ও পশ্চিম হিন্দুস্থানের বহু স্থলে খুব বড় বড় পান্থশালাও ছিল, যাতে আট শ কি হাজার যাত্রীরও জায়গা হত। তাদের যানবাহন রক্ষার স্থানও হত সেখানে। শয্যা, খাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থাও ছিল। পর্যটক মানুচি এ সকল ব্যবস্থার তারিফ করেছেন।

যানবাহনের মধ্যে ছিল ঘোড়া, পালকি, উট ও গরুর গাড়ী। সপ্তদশ শতকে হিন্দুস্থানের প্রায় সর্বত্রই গরুর গাড়ী ছিল রাজরথের তুল্য। সে গরু ছিল সুদৃশ্য, সবল ও কল্পনাতীত দ্রুতগামী। অন্তত ছয় শ টাকার কমে গাড়ীর জন্য একজোড়া ভাল গরু পাওয়া যেত না। জলপথে যাতায়াতের জন্য পাওয়া যেত ছোট বড় নানাপ্রকার নৌকা।

পর্যটক বার্নিয়ার বলেছেন, হিন্দুস্থানে বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার ঘোড়া আমদানি হত। এর সবই আসত উজবেগ, পারশ্য, ইথিয়োপিয়া ও আরব থেকে।

পথিকেরা সাধারণত অস্ত্রধারী প্রহরী নিয়ে যাতায়াত করত। এদের জন্য খরচ বেশি হত না, কিন্তু এসব দেহরক্ষীরা ছিল অতিশয় বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত। পঞ্চদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত হিন্দুস্থানের কোথাও দস্যু তস্কর বা রাহাজানদের ভয় বিশেষ ছিল না।

পথ ছিল নিরুপদ্রব, দেশবাসী ছিল শান্ত, সংযত, সভ্য ও বিদেশীর প্রতি দরদী। এ প্রশংসাপত্র দিয়েছেন অনেকে, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ওর্টেন। তিনি বলেছেন, এই পরম সভ্যজনোচিত ব্যবহারের জন্যই পর্যটক নিকোলো কন্টি পঞ্চদশ শতকে 'পথি নারী বিবর্জিতা' অনুশাসনটিকে অগ্রাহ্য করেও নিরুপদ্রবে এ দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন। আবার সপ্তদশ শতকে করেছেন ইটালিয়ান পর্যটক পিয়েট্রো ডেলা ভেল, অবশ্য সপরিবারেই। ওর্টেনের মতে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে যদি হিন্দুস্থানের কেউ সপরিবারে সেকালে ইউরোপ ভ্রমণে যেতেন, তবে তাঁরা সেখানে অনুরূপ ব্যবহার পেতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ হিন্দুস্থানের লোক তখন ইউরোপের অধিবাসীদের চেয়ে বেশি সভ্য ও শিষ্ট ছিল। এরও অনেক পরে, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ক্লাইভের বন্ধু স্ক্রেফটনও দেশের এই নিরাপত্তার কথা বলেছেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে সেকালে এদেশে বিদেশ থেকে অনেক জহুরী বাণিজ্য করতে এসেছেন। তাঁরা সবাই কিন্তু সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে সর্বত্র ভ্রমণ করেন নি। অথচ তাঁদের উপর কোনোদিন কোনো রাহাজানি হয়েছে বলে শোনা যায় নি। এটা সুশাসনেরই ফল। রাজশক্তি সাধারণত পথের নিরাপত্তার জন্য দেশপ্রধানদের দায়ী করতেন; অর্থাৎ যদি তাঁদের কারো এলাকায় রাজবর্ত্মে কোনো রাহাজানি, দস্যুতা প্রভৃতি অঘটন ঘটত, তবে সেজন্য দায়ী হতেন তাঁরা। হয়, তাঁদের সেই হৃত সম্পত্তি উদ্ধার করে দিতে হত; নয়, তার পরিবর্তে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ করতে হত। এ নিয়ম ছিল খুবই ফলদায়ক।

বিদেশীরা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসত অল্পই, রূপাই নিয়ে আসত বেশি। সে মুদ্রা বিনিময় করতে হত হিন্দুস্থানের মুদ্রার সঙ্গে। বলা বাহুল্য, বিদেশী মুদ্রায় সোনারূপার ওজন ও তার বিশুদ্ধতার তারতম্য অনুসারে তার বিনিময়ের হার স্থির হত। পর্যটক টেভার্নিয়ার এই বিনিময়ের হার বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কাল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। আমরা মোটামুটি তাঁর তালিকা উদ্ধৃত করছি।

এ দেশে এসব বিদেশী মুদ্রা গালিয়ে দেশী মুদ্রা তৈরী করা হত। বাদশাহ আকবরের কাল থেকেই মোগল সাম্রাজ্যের বহু কেন্দ্রে টাকশালের সৃষ্টি হয়েছিল।

হিন্দুস্থানী মুদ্রা :

৫০ থেকে ৮০ কড়ি (স্থানভেদে) = এক পয়সা (তামা)
৪৬ থেকে ৫৬ পয়সা („) = এক টাকা (রূপা)
১৪ থেকে ১৪½ টাকা = এক মোহর (সোনা)

হিন্দুস্থানী ওজন :

এক খান্দি = ৫০০ পাউণ্ড
এক মন = ৪০/৪২ সের
এক সের = ৮০ তোলা
এক তোলা = ৯৬ রতি অর্থাৎ একটি রূপার টাকার সমান ওজন

পারস্যের মুদ্রা :

এক মোহাম্মদী = দুই শাহী
দুই „ = এক আবাসী
পঞ্চাশ আবাসী = এক টোমান
২০০ শাহী = ২৯½ টাকা (হিন্দুস্থানী)

পোর্তুগীজ মুদ্রা :

এক ক্রুসাডো = দু-শিলিং দশ-পেন্স (ইংরেজী)

ইটালিয়ান মুদ্রা :

এক ক্রয়সার্ট = ছ-শিলিং ছ-পেন্স („)
এক সিকুইন = ন-শিলিং ছ-পেন্স („)

ডাচ মুদ্রা :

এক গুল্ডেন বা ফ্লোরিন = এক শিলিং ন-পেন্স („)

স্পেনের মুদ্রা :

এক পেইস্ত্রি বা এইকো = চার শিলিং ছ-পেন্স („)

ফরাসী মুদ্রা :

২০ সল = এক লিভার = এক শিলিং ছ-পেন্স (ইংরেজী)
৬০ সল = এক একো = চার শিলিং ছ-পেন্স („)

ইংরেজী মুদ্রা :

এক পাউণ্ড = ন-টাকা (টেভার্নিয়ারের কালে) (হিন্দুস্থানী)
১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আট টাকা।

॥ ব্যক্তি ও বিষয়-পরিচয় ॥

অগাষ্টিন (সেণ্ট) : (৩৫৪-৪৩০) রোমান ক্যাথলিক সাধু। এঁর প্রসিদ্ধি ও সম্মান সেণ্ট পল-এর পরেই। সেণ্ট পল যীশুখ্রীষ্টের সাক্ষাৎ শিষ্য।

অধিবিদ্যা : Metaphysics. দর্শনশাস্ত্রের এক অংশ।

অশোক : (খ্রীঃ পূঃ ২৬৯-২৩২) মৌর্যবংশের প্রখ্যাত নৃপতি। প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট। ইনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে দেশে বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক পাঠান।

আর্মেনিয়ান : সেকালের 'আর্মেনিয়ার' অধিবাসী। সে ভূমি এখন খণ্ড খণ্ড হয়ে তুর্কী, রাশিয়া ও ইরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এম্পেডোকলস : (খ্রীঃ পূঃ ৫০০-৪৩০) গ্রীক বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও কবি। এঁর মতে, সকল পদার্থই মাটি, বাতাস, আগুন ও জলের সংমিশ্রণে জাত।

এনাক্সাগোরাস : (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৮-৪২৮) গ্রীক বিজ্ঞানী। কথিত আছে, ইনি বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী সক্রেটিসের গুরু।

কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ : প্রসিদ্ধ চাণক্য-নীতি। এক শত্রু দিয়ে অন্য শত্রু দমন করার ব্যবস্থা; এক কাঁটা দিয়ে অন্য কাঁটা তোলা। "পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্"। পায়ে যে কাঁটা ফুটেছে, হাতের কাঁটা দিয়ে তা তুলে ফেলতে হবে।

ক্যান্যুট : (৯৯৫-১০৩৫) দিনেমারদের রাজা। ইনি ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে জয় করেন।

কোপরনিকাস : (১৪৭৩-১৫৪৩) ইনি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। ইনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘোরে; পূর্বের ধারণা ছিল ঠিক এর বিপরীত।

কোলবার্ট : (১৬১৯-১৬৮৩) ফরাসী রাজনীতিবিদ্। ইনি দেশের শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য উন্নয়নে ব্রতী ছিলেন। এঁরই হস্তক্ষেপের ফলে ফরাসীর নৌ-বল সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

ক্রমওয়েল : (১৫৯৯-১৬৫৮) বিখ্যাত ইংরেজ যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্। এঁকে বলা হয় : 'Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland.'

খোকা ঘুমাল : বাংলায় বর্গির হাঙ্গামা উপলক্ষে রচিত পুরনো ছড়া।

"খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গি এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেল।
খাজনা দেব কিসে॥"

গ্যালিলিও : (১৫৬৪-১৬৪২) এই ইটালিয়ান বিজ্ঞানীই কোপারনিকাসের আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত করেন। এ আবিষ্কারের তথ্য ছিল সেকালের ধর্মশাস্ত্রের কাহিনীর বিরুদ্ধ, তাই এঁকে পোপের বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) : (৩৮০-৪১৩) গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীশ্বর ; সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। বিশ্ববিখ্যাত কবি কালিদাস এঁরই 'নবরত্ন' সভার অন্যতম সদস্য। ইনিই হিন্দুস্থানের বহু আখ্যায়িকার প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য।

চেট্টি : দাক্ষিণাত্যের বৈশ্য বণিকজাতি। সংস্কৃত 'শ্রেষ্ঠীর' অপভ্রংশ (?)।

টেভেনো : ফরাসী পর্যটক। বত্রিশ বছর বয়সে ইনি প্যারিস থেকে বাসোরা হয়ে সুরাট পৌঁছেন ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। দেশে ফেরার পথে পারস্যে এঁর দেহান্ত হয় ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি তুর্কী, আরবী ও পারশী ভাষা জানতেন। ইনি পশ্চিম ও দক্ষিণ হিন্দুস্থান পরিভ্রমণ করেন।

টেভার্নিয়ার : ফরাসী জহুরী। ইনি ১৬৪০ থেকে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দুস্থানে হীরা-জহরতের ব্যবসা করতে এসেছেন বার ছয়। হিন্দুস্থানের সর্বত্র সফর করেছেন। সেকালের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে এর অনুসন্ধানের ফল ও মন্তব্য অতিশয় মূল্যবান।

ডেকার্ত : (১৫৯৬-১৬৫০) বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ও লেখক।

ডেমোক্রিটাস : (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৫৭) ইনিই প্রথম গ্রীক পরমাণুবাদের সৃষ্টি করেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য ইনি নিজের চক্ষু দুটিকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

ড্রেক : (১৫৪০-১৫৯৬) প্রসিদ্ধ ইংরেজ অভিযাত্রী। ইংরেজ ও স্পেনের মধ্যে জলযুদ্ধের একজন বিশিষ্ট নায়ক।

থেলস : (খ্রীঃ পূঃ ৬২৪-৫৬৫) বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক-বিজ্ঞানী। কথিত আছে, ইনি পিথাগোরাসের গুরু। এঁর মতে জলই বিশ্বের মূলবস্তু।

নিউটন : (১৬৪২-১৭২৭) ইংরেজ বিজ্ঞানী। বিশ্বের প্রধানতম বিজ্ঞানীদের অন্যতম।

নবরত্ন সভা : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের নয় জন সুবিখ্যাত মনীষী সভাপণ্ডিতের সভা। এঁরা যথাক্রমে কালিদাস, বররুচি, বরাহমিহির, অমরসিং, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট ও ঘটকর্পর।

নায়ার ঃ দাক্ষিণাপথের ক্ষত্রিয়বর্ণ হিন্দু।

নেপোলিয়ান (বোনাপার্ট) ঃ (১৭৬৯-১৮২১) প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, পরে ফরাসী সম্রাট। ইনি কিছুকাল সমগ্র ইউরোপের একাধিপতিও ছিলেন। ওয়াটারলুতে ইনি পরাজিত হয়ে শেষ কালে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী ছিলেন।

দীন-ই-ইলাহি ঃ সম্রাট আকবর-সৃষ্ট নবধর্ম। কেউ কেউ একে ইরাণী ও হিন্দুধর্ম সমন্বয়ে একেশ্বরবাদ বলেছেন; কারো কারো মতে এটি পারস্যের সূফী পন্থারই নামান্তর। এ ধর্ম মানুষকে ধর্মান্তরিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট হয়নি; এ ধর্মমত নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

পিথাগোরাস ঃ (খ্রীঃ পূঃ ৫৮২-৫০৭) গ্রীক মনীষীদের মধ্যে এই দার্শনিক-বিজ্ঞানীর কথাই প্রাচ্যে সর্বাপেক্ষা সুবিদিত। ইনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের এঁর দান রয়েছে।

প্রোটেষ্টাণ্ট ঃ খ্রীষ্টান জগতে পোপের সর্বাত্মক অধ্যক্ষতার বিরোধী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যেও নানা দল রয়েছে; তাঁদের দলগত মতবাদেও রয়েছে বহু বিভেদ। মোটামুটি এঁদের মতে ব্যক্তিগতভাবে সকল মানুষই বিশ্বাস ও প্রার্থনার বলে মুক্তিলাভ করতে পারে; এজন্য তাদের চার্চের বা কোন বিশিষ্ট ধর্মযাজকের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন হয় না। মার্টিন লুথার, কলভিন প্রভৃতি এসব দলের স্রষ্টা; এঁরা সবাই ষোড়শ শতকের মানুষ। অর্থাৎ প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পনের শ বছর পরে।

পোপ ঃ রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মজগতের সর্বাধ্যক্ষ। ইনি আমাদের দেশের কোন কোন ধর্মসম্প্রদায়ের মোহন্তের মত। এঁর কথা ধর্মব্যাপারে শুধু মান্য নয়, অবিসম্বাদী সত্য বলে গৃহীত হয়। রোমে এঁর আবাসকে বলা হয় 'ভ্যাটিকান্'।

প্যাস্কাল ঃ (১৬২৩-১৬৬২) বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ্।

ফ্রান্সিসকান ঃ রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সাধুদের একটি সংঘ। সেণ্ট ফ্রান্সিস (১১৮২-১২২৬) এর স্রষ্টা।

ফ্রেবিসার ঃ (১৫৩৫-১৫৯৪) প্রসিদ্ধ ইংরেজ অভিযাত্রী ও নৌবিদ্যা-বিশারদ্। ইনি ইংরেজ ও স্পেনের বিখ্যাত জলযুদ্ধের অন্যতম নায়ক।

ফাহিয়েন ঃ প্রসিদ্ধ চীনা পর্যটক। ইনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের কালে ভারতবর্ষে সফর করেন (৩৯৯-৪১৪)। এঁর ভ্রমণ কাহিনীতে সেকালের ভারতের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

বর্গি ঃ মারাঠা সৈন্য। ফারসী শব্দ 'বরগির' অপভ্রংশ। ফারসীর 'বরগিরের' অর্থ এমন একটি অশ্বারোহী সৈন্য, যার অশ্বটি নিজের নয়।

বার্নিয়ার ঃ ইনি ফরাসী ভিষক্; ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে আসেন। এখানে ছিলেনও বহুকাল। নানাস্থান পরিভ্রমণ করে নানা বিবরণ লিখেছেন, মন্তব্যও করেছেন। ইনি দর্শনশাস্ত্রের চর্চাও করেছিলেন বলে মনে হয়। এঁর রাজনীতিক মন্তব্য সব সময়ে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না।

বৈকুণ্ঠ ঃ মুর্শীদকুলী খাঁর আমলে সময়মত রাজস্ব না দিতে পারলে হিন্দু জমিদারদের ধরে এনে যে পুতিগন্ধময় স্থানে আটক করে রাখা হত, তার নাম মুর্শীদকুলী খাঁ দিয়েছিলেন 'বৈকুণ্ঠ'। হিন্দুর মতে 'বৈকুণ্ঠ' স্বয়ং বিষ্ণুর আবাস।

ভলটেয়ার ঃ (১৬৯৪-১৭৭৮) প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও লেখক।

মলিয়র ঃ (১৬২২-১৬৭৩) বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার ও প্রহসন রচয়িতা।

মানুচি ঃ ইটালিয়ান মানুচি অতি অল্পবয়সে (১৪-১৫) ঘর থেকে পালিয়ে হিন্দুস্থানে আসেন ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে ছিলেনও সারাজীবন। এঁর দেহান্ত হয় মাদ্রাজে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি প্রথমে মোগল সৈন্যবিভাগে কাজ করেন, পরে ভেষজজীবী হয়ে নানাস্থান পরিভ্রমণ করে পড়ন্ত মোগল সাম্রাজ্যের কাহিনী লিখেছেন। এঁর কাহিনী ও মন্তব্য প্রামাণিক বলে গৃহীত হয়। ইনি স্বয়ংসিদ্ধ চিকিৎসক। সেকালে কলেরা রোগে রোগীর গোড়ালির মধ্যস্থল তপ্ত লোহা দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হত। দাগানো চলত ততক্ষণই যতক্ষণ না সে তাপের জ্বালায় রোগীর ভেদবমি দূর হয়। মানুচি এ চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আনারসের রস নিয়ে তিনি কিছু গবেষণা করেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর মতে, পরিশ্রুত আনারসের রসে মানুষের বৃক্ক (kidney) ও বস্তিতে (bladder) যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর জন্মে বিষম ব্যথার সৃষ্টি করে তা গলে যায়।

ম্যাগ্না কার্টা ঃ ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রাজন্যবর্গের মধ্যে একটি বিখ্যাত চুক্তি; এতে এঁদের মধ্যে ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থিরীকৃত করা হয়েছে। এটি প্রথম রচিত হয় ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

ম্যানরিক ঃ পোর্তুগীজ পাদরী। ইনি সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার নানা গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন।

মার্কো পোলো ঃ (১২৫৬-১৩২৩) ইটালিয়ান (ভেনিস) পর্যটক। ইনিই প্রথম চীন, হিন্দুস্থান প্রভৃতি পর্যটন করে সে সকল দেশের কথা লিপিবদ্ধ ও ইউরোপে প্রচার করেন। সেকালে সেসব কাহিনী প্রথম কেউ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি।

'যদা যদাহি ধর্মস্য' ঃ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের বিখ্যাত শ্লোক—

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

অর্থাৎ যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্লাবন হয়, তখন ভগবান সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদের দলনের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন।

যুক্তিবিদ্যা : Logic, তর্কবিদ্যা।

রোমান ক্যাথলিক : এই খ্রীষ্টান সংঘ রোমের পোপকে খ্রীষ্টান ধর্মজগতের সর্বাধ্যক্ষ বলে মানেন। এঁদের মতে পোপ সেণ্ট পিটারের উত্তরাধিকারী। সেণ্ট পিটারকে যীশুখ্রীষ্ট সমগ্র চার্চের সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। রোমান ক্যাথলিকদের মতে, মুক্তির উপায় সমবেত প্রার্থনা বা mass আর Baptism বা জল সিঞ্চন শুদ্ধি, ধর্ম দীক্ষা প্রভৃতি সাত প্রকার সংস্কার ও তপস্যা। এ ব্যাপারে সাফল্যের জন্য ধর্মযাজকদের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মিটায় রোমান ক্যাথলিক চার্চ।

র্যালে : (১৫৫২-১৬১৮) প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক, অভিযাত্রী ও যোদ্ধা। ইনি আমেরিকার 'ভার্জিনিয়া' প্রদেশে ইংরেজ অধিনিবাস স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত রাজরোষে এঁর প্রাণদণ্ড হয়।

রেনেসাঁস : পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের নানা দেশে নব ভাবের প্লাবনের ফলে জীবনের প্রতি মানুষের নুতন দৃষ্টিভঙ্গী ঘটেছিল। একে বলা হয় রেনেসাঁস বা নবজীবন। রেনেসাঁসের ফলে ইটালিতে উদ্ভূত হল নূতন আর্ট বা কলাশিল্প, উত্তর ইউরোপে ধর্মের নবরূপ আর ইংলণ্ডে যুগান্তকারী কাব্য ও সাহিত্য।

শশাঙ্ক (রাজা) : গৌড়ের সেকালের প্রসিদ্ধতম রাজা (৬০৬-৬১৯)। সম্রাট হর্ষবর্ধন এঁর রাজ্য দখল করেন ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি।

শাহু (রাজা) : সাতারার বিখ্যাত মহারাষ্ট্র ছত্রপতি শিবাজীর নাতি। এঁর কাল ১৭০৮-১৭৪৯।

সুয়েজ খাল : লোহিত সাগরের উত্তর কূলের বন্দর 'সুয়েজ' থেকে ভূমধ্য-সাগরের দক্ষিণ উপকূলের বন্দর 'পোর্ট সৈয়দ' পর্যন্ত একশ মাইল লম্বা খাল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর এই আন্তর্জাতিক প্রণালীর উদ্বোধন করা হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি মিশরের জাতীয় সম্পত্তি বলে গণ্য হয়।

হজ : মুসলমানের মক্কায় তীর্থযাত্রা। এটি তাদের ধর্মের পাঁচটি অত্যাজ্য অঙ্গের অন্যতম ; অন্য চারটি যথাক্রমে, কলমা-পাঠ, নামাজ, রোজা ও জাকাত বা দান।

হিউয়েন সাং : প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক। ইনি ভারতবর্ষের বিখ্যাত সম্রাট হর্ষবর্ধনের কালে, সপ্তম শতকে, দেশের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করে

বহুকাল বাস করেন (৬৩০-৬৪৩)। ভারতবর্ষের সেকালের ইতিহাস অঙ্কনে এঁর দান অবিস্মরণীয়।

হিরোডোটাস : (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৫-৪২৫) এই গ্রীক ঐতিহাসিক ইতিহাসের জনক বলে বিখ্যাত। কারো কারো মতে ইনি মানবজাতি-শাস্ত্রেরও (anthropology) জনক।

হোমার : (খ্রীঃ পূঃ ৭০০) ইনি গ্রীক ভাষার বিখ্যাত মহাকাব্য ইলিয়াড ও অডিসির লেখক বলে পরিচিত। এই গ্রীক কবি হয় চিয়সে নয় স্মার্ণায় বাস করতেন।

সংক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী ॥

প্রথম অধ্যায় :

Phoenecia and Phoenicians　Damitri Baramki
The Phoenicians　Donald Harden
Arabia Before Mahammed　O'Leary
History Books I-IV　Herodotus
Itinerario　J. H. Van Linschoten
Encyclopaedia Britannica
Ancient Times　Breasted
The Mediterranean Lands　Newbegin
Early History of India : V. A. Smith

দ্বিতীয় অধ্যায় :

The Portuguese Pioneers : E. Prestage
Indes Advanture : E. Sanceau
History of Portuguese in India : Danvers
Portuguese in India : Herny Heras
Portuguese in India : O. K. Nambier
History of Bengal : Dacca University
Portugal Relations (General) with India : K. M. Panikkar
History of Portuguese in Bengal : Campos
The Golden Century of Spain : R. T. Davies
A Short History of Italy : Trevelyan
Portuguese Pirates and Indian Seamen : Nambier

তৃতীয় অধ্যায় :

The Netherlands in the Seventeenth Century : Pieter Geyl
A Primer of Dutch Seventeenth Century Overseas Trade : D. W. Davies

Dutch East India Company : Ashburton
Malabar and the Dutch : K. M. Panikkar
Dutch in India : K. Datta
Dutch activitis in the East : Danvers

চতুর্থ অধ্যায় :

The Age of Louis XIV : L. B. Packard
A History of the Kingdom of Denmark : Palle Lauring
Denmark : Palmer
History of the French in India : Malleson
Three Frenchmen in Bengal : S. C. Hill
The French in India : S. P. Sen
Final French Struggle in India : Malleson
An Introduction to Seventeenth Century France : J. Lough

পঞ্চম অধ্যায় :

Travels in Moghul Empire : F. Bernier
Travels in India : Tavernier
Indian Travels of Thavenot and Careri : S. N. Sen
Storia Do Mogor (vols. I,II&III) : Manucci
Travels (Experiences in Bengal) : Manrique
Foreign Travellers in India : E. F. Oaten
Historical Introduction to Bengal Report : W. K. Firminger
Reflections on the Government of Indostan : Luke Scrafton
History of Bengal : Stewart
Historical Fragments of the Moghul Empire : Robert Orme
The Munsud of Murshidabad : P. C. Mazumdar
Economic History of India : R. C. Dutta

ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় :

English Social History	:	G. M. Trevelyan
The British Overseas	:	Carrington
England's attainment of Commercial Supremacy	:	Tipper
Bengal District Gazetteers (Murshidabad)	:	O'Malley
The Early annals of the English in Bengal	:	C. R. Wilson
Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report	:	W. K. Firminger
The East India Co and the Economy of Bengal	:	S. Bhattacharjee
Voyages—East Indes	:	J. S. Stavorinus
Trade in the Eastern Seas	:	C. N. Parkinson
Annada Mangal (Bengali)	:	Bharatchandra
The Maharastra Purana	:	Dimock & P. C. Gupta

অষ্টম অধ্যায় :

The above books and A Short History of Aurangzib	:	Sir J. N. Sarkar
India in Portuguese Literature	:	Pope
From Akbar to Aurangzeb	:	Moreland

শব্দ ও বিষয়-সূচী

৬৭ পৃষ্ঠায় ২১ লাইনে 'আক্রমণ' স্থলে আমন্ত্রণ হইবে
১১১ ,, ১ ,, 'শেঠকে' ,, 'শেষ শেঠকে' ,,